GIFT

# ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯০৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারি, ২০১২

Dhaka University Library
465882
465382

গাজী মোঃ মিজানুর রহমান
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

# ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯০৫)

গাজী মোঃ মিজানুর রহমান
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ফেব্রুয়ারি, ২০১২

465382

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, গাজী মোঃ মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে **'ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯০৫)'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির খসড়া আমি পাঠ করেছি এবং এম ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদানের সুপারিশ করছি।

465382

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন)
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি যে, এম ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে দাখিলকৃত **'ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯০৫)'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভের কোন অংশ কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আমি উপস্থাপন করিনি।

গাজী মোঃ মিজানুর রহমান

*Dhaka University Institutional Repository*

# নিবেদন

ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর থেকে স্নাতক পর্ব পর্যন্ত ইতিহাস বলতে বুঝতাম বিজয়ীগোষ্ঠী, শাসক শ্রেণি ও ডমিন্যান্ট শ্রেণির অতীত কর্মকাণ্ডের বিবরণ। এর বাইরে অন্য কিছু ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু এম. এ শ্রেণিতে থাকাকালীন রণজিৎ গুহ'র *'নিম্নবর্গের ইতিহাস'* প্রবন্ধটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়, যা চৈতন্যকে স্পর্শ করে এবং সীমিত জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে। এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রবল আগ্রহ জন্মায়। এমতাবস্থায়, ২০০৮ সালে ঢাকা শহরের ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঢাকার সাধারণ মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এ. এইচ আহমেদ কামাল-এর একটি মন্তব্যের মধ্যে আমার এম. ফিল অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু খুঁজে পাই। এম. ফিলে *'ঢাকা মহানগরীর নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯৭১)'* শিরোনামে গবেষণার রূপরেখা জমা দেওয়ার পর, স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন- কে তত্ত্বাবধায়ক করে ইতিহাস বিভাগ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করে।

অতঃপর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর গবেষণার রূপরেখাটির জন্য প্রশংসা করে আমাকে উৎসাহিত করেন। অভিসন্দর্ভের সময়কাল ও শিরোনাম পরিবর্তন করে *'ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯০৫)'* করার পরামর্শ দেন যা আমারও খুব পছন্দ হয়। তাই বিষয় নির্বাচনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গবেষণা সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয় থেকে জটিল বিষয় পর্যন্ত শত ব্যস্ততার মাঝেও যে কোন সময়ে আমার তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। আমার গবেষণা চলাকালে তিনি তাঁর গবেষণার কাজে বহুবার দেশের বাইরে অবস্থান করেছেন তাসত্ত্বেও আমার গবেষণার অগ্রগতির খোঁজখবর নিতে ভুলতেন না। পারিবারিক নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে আমার দেয়া লেখাগুলি যত্নসহকারে পাঠ করে ফেরৎ দিতেন। তাই তাঁর সদয় সহযোগিতা ও সর্বদা অনুপ্রেরণা ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা যেত কিনা সন্দেহ। তাঁর এই আন্তরিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

গবেষণার শুরু থেকে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত আমি অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। ইতিহাস বিভাগে আমার শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন সময় যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ ও গবেষণার খোঁজ খবর নিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে এ. এইচ আহমেদ কামাল, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক নুরুল হুদা আবু মনসর, অধ্যাপক আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী ও সহকারী অধ্যাপক এম. এ কাউসার। তবে আমি বিশেষ ঋণ স্বীকার করছি ড. এ. এইচ আহমেদ কামালের নিকট। অনেক ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে নিম্নবর্গ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত বিশাল গ্রন্থাগার অবাধে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। জমাদানের শেষ মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এম. এ কাউসার অভিসন্দর্ভটির বানান রীতি ও ভাষা সম্পর্কিত শুদ্ধতার পরামর্শ দানের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। বর্তমান কর্মস্থল বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে যে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের নিকট ঋণী। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ আমার ভাবনার জগৎকে প্রসারিত করেছে। আমার সহপাঠী বন্ধু আজিজুল রাসেল বিভিন্ন গ্রন্থ দিয়ে গবেষণার কাজে সহায়তা করেছেন। এম. ফিলে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা, কর্মচারীর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিশেষ করে রতন কুমার দে, জনাব মোঃ নুরুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণার প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ আর্কাইভস। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সহযোগিতার জন্য। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আবুল কাসেম বকাউল, মোঃ আলমাছ মিয়া, মোঃ আনোয়ার হোসেন, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও রীণা রানী সরকারকে।

আমার বন্ধুরা সবসময় গবেষণার অগ্রগতির খোঁজখবর নিয়ে উৎসাহিত করেছেন আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আমার সাবেক কর্মস্থল ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সহকর্মীবৃন্দ ও ব্র্যাক ডেভলোপমেন্ট ইন্সটিউটের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব এম. সাখাওয়াত আলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। চাকুরীরত অবস্থায় নির্বিঘ্নে গবেষণার কাজ পরিচালনার জন্য তাঁরা অনেক সহায়তা করেছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

বর্তমান কর্মস্থলের সহকর্মীদের অনুপ্রেরণার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাছাড়া গবেষণাকালে অনেকে আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আমার সেইসব সুহৃদ শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে আমি অত্যন্ত ঋণী।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোন গবেষণা পরিচালনায় পরিবারের উৎসাহ ও সহযোগিতা অপরিহার্য। আমার মা, বাবা, বোন গবেষণার কাজে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ করে এই গবেষণা কর্মের প্রতিটি পাতায় আমার মায়ের স্নেহ ও ভালবাসার ছোঁয়া রয়েছে।

গাজী মোঃ মিজানুর রহমান

*Dhaka University Institutional Repository*

সূচিপত্র (i-v) পৃষ্ঠা নং

**ভূমিকা**.....১-১৯

ক. ঢাকার নামকরণ.....১

খ. ঢাকা 'শহর' থেকে 'পৌরসভা'য় উন্নীত.....৩

গ. ঢাকা শহরের ভৌগোলিক অবস্থান.....৫

ঘ. ঢাকা শহরের সীমানা ও আয়তন.....৬

ঙ. জনসংখ্যা.....৮

চ. অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....১০

ছ. অভিসন্দর্ভের সময়কাল.....১২

জ. অধ্যায়সমূহ.....১২

ঝ. ব্যবহৃত আকার.....১৮

**প্রথম অধ্যায়ঃ নিম্নবর্গের সংজ্ঞা এবং ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচয়**.....২০-৫৭

ক. নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষাপট.....২১

খ. নিম্নবর্গের সংজ্ঞা.....২৩

গ. *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা নিয়ে বিতর্ক.....২৬

ঘ. ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচয়.....২৯

**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ঢাকার পুনরুত্থান এবং নিম্নবর্গের সমাবেশ**.....৫৮-১০০

ক. ঢাকা শহরের ভৌগোলিক অবস্থান.....৫৮

খ. 'শহর' হিসেবে ঢাকা'র পত্তন.....৫৯

*Dhaka University Institutional Repository*

গ. ঢাকা শহরের প্রসার বা পারিসরিক বৃদ্ধি.....৬১

i. প্রাক-মুগল বা সুলতানি আমল.....৬১

ii. মুগল আমল.....৬৩

iii. কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমল.....৬৫

ঘ. পতনমুখী ঢাকা শহর.....৬৭

ঙ. ঢাকা শহরের 'পতন' বলা যায়?.....৬৯

চ. পুনরুত্থান প্রক্রিয়া.....৭৫

ছ. ঢাকা পৌরসভা.....৭৭

জ. নিম্নবর্গের সমাবেশ.....৮০

i. বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি.....৮১

ii. পূর্ববঙ্গ ও ঢাকা জেলা.....৮২

iii. অভিবাসন.....৮৫

**তৃতীয় অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক অবস্থা.....১০১-১৩৩**

ক. বসত-বাড়ি.....১০২

খ. নিম্নবর্গের আয়.....১০৮

গ. খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যয়.....১১৬

ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং নিম্নবর্গের দুদর্শা.....১১৮

ঙ. বর্ণ বৈষম্য.....১২৮

চ. স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধি.....১৩০

*Dhaka University Institutional Repository*

**চতুর্থ অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক চৈতন্য.....১৩৪-১৫৭**

ক. নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ও নিম্নবর্গ.....১৩৫

খ. সভা-সমিতি.....১৪০

গ. ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নিম্নবর্গ.....১৪১

ঘ. কর বৃদ্ধি ও অসন্তোষ.....১৪৬

ঙ. বঙ্গভঙ্গ ও নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া.....১৪৯

চ. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা.....১৫১

**উপসংহার.....১৫৮-১৬২**

**পরিশিষ্ট-১.....১৬৩**

**পরিশিষ্ট-২.....১৬৪**

**পরিশিষ্ট-৩.....১৬৫**

**পরিশিষ্ট-৪.....১৬৬-১৬৭**

**মানচিত্র**

১. প্রাক-মুগল আমল.....৬৩

২. মুগল আমল.....৬৪

৩. ঢাকা (১৮৫৯).....৬৬

৪. ঢাকা (১৯০৫-১১).....৬৭

৫. বাংলাদেশের নদ-নদী.....৮৫

**সারণি**

সারণি-১.....৯

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি-২.....৪২

সারণি-৩.....৪৯-৫৫

সারণি-৪.....৭৪

সারণি-৫.....৭৯-৮০

সারণি-৬.....৮৮

সারণি-৭.....৮৯

সারণি-৮.....৯০

সারণি-৯.....৯১

সারণি-১০.....৯১-৯৫

সারণি-১১.....৯৫

সারণি-১২.....৯৬

সারণি-১৩.....৯৭

সারণি-১৪.....৯৭-৯৮

সারণি-১৫.....৯৮-৯৯

সারণি-১৬.....১০২

সারণি-১৭.....১০৪

সারণি-১৮.....১০৫

সারণি-১৯.....১০৬

সারণি-২০.....১১১

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি-২১.....১১২

সারণি-২২.....১১৩-১১৪

সারণি-২৩.....১১৫

সারণি-২৪.....১১৬

সারণি-২৫.....১১৯

সারণি-২৬.....১৩৭-১৩৮

সারণি-২৭.....১৩৮-১৩৯

সারণি-২৮.....১৩৯-১৪০

**গ্রন্থপঞ্জি**.....১৬৮-১৭৭

*Dhaka University Institutional Repository*

# ভূমিকা

২০০৮ সালে রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধনের দিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। তখন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. এ. এইচ. আহমেদ কামাল-এর *'কালের কল্লোল'* গ্রন্থের কয়েকটি লাইন আমার চৈতন্যকে স্পর্শ করে, যা আমাকে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর ভাষায়- "যে ঢাকা আমরা দেখছি, যে ঢাকায় আমরা বাস করছি, সে কার ঢাকা? ঢাকায় যদিও লক্ষ লক্ষ বাড়ী, অফিস, দোকান ও হাজার রাস্তাঘাটের সমাহার তবু ঢাকা কিন্তু আমাদেরই মানস সন্তান। যে ভৌগোলিক পরিসরে ঢাকার অবস্থান ঢাকার উৎপত্তির পেছনে শুধু সেই Element টি কাজ করছে না, ঢাকা হচ্ছে মূলত ঢাকাবাসীদের চৈতন্যের বস্তুগত প্রতিচ্ছবি। Reflection of a consciousness materially translated by its inhabitants."[১]

## ক. ঢাকার নামকরণ

আজকের দিনে 'ঢাকা' বলতে বাংলাদেশের একটি বিভাগ, একটি জেলা ও রাজধানী শহরকে বোঝায়। জেলা হিসাবে ঢাকার সৃষ্টি ব্রিটিশ আমলে হলেও ঢাকা শহরের ইতিহাস মুগল আমলের সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকা'র নামকরণ এবং বর্তমান ঢাকা'য় রূপান্তরিত হওয়ার পিছনে রয়েছে নানা কিংবদন্তি, অভিমত এবং এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ঢাকা নামটি অতি সুপ্রাচীন। তাই 'ঢাকা' নামকরণের প্রকৃত ইতিহাস বলা জটিল। তাছাড়া তথ্য ও উপাত্তের অপর্যাপ্ততা তো রয়েছেই। ঢাকা নামের উদ্ভব সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। যেমন কেউ বলেন, 'ঢাক' নামক এক প্রকার বৃক্ষ (Butea Frondosa) এ অঞ্চলে প্রচুর জন্মাত বলে এ স্থান 'ঢাকা' নামে পরিচিত হয়।[২] ঢাক শব্দটি ক্রমশ বিবর্তনের মাধ্যমে ঢাকায় পরিণত হয়। অন্য দলের অভিমত হল, ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম হতে ঢাকা নামের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে তাঁরা আদিশূর ও বল্লালসেনের নাম যুক্ত করে ঢাকা নামের

---

১. আহমেদ কামাল, ২০০১, *কালের কল্লোল (১৯৪৭-২০০০)*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫২

২. James Taylor, 1840, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Military Orphan Press, Calcutta, p. 91-2; Bradley Birt, 1906, *The Romance of an Eastern Capital*, Smith Elder & Co., London, p. 95; Abdul Karim, 1964, *DACCA the Mughal Capital*, Asiatic Press, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, p. 2; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), ২০০৩, *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫৭২

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাচীনতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[৩] কেদারনাথ মজুমদার বলেন, ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী হতে ঢাকা নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন; কিন্তু ঢাকেশ্বরী হতে ঢাকা না ঢাকা হতে ঢাকেশ্বরীর নাম হয়েছে, এ অনুমানটি করা কঠিন। কিংবদন্তি আছে যে, সতী দেহ বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁর কিরীটের 'ডাক' এস্থানে পতিত হয়। 'ডাক' স্থানীয় শব্দ; কারুকার্য প্রতিযোগিতা করার জন্য জড়োয়া গহনার নিচে 'ডাক' বসান হয়ে থাকে। 'ডাক' পতিত হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলে গণ্য হয় এবং ঢাকা নাম প্রাপ্ত হয় এবং দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিতি হয়। অন্য মতে, ঢাকেশ্বরী দেবী 'ঢাকা' বা গুপ্ত ছিলেন; মহারাজ বল্লালসেন তাঁকে আবিষ্কার করে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূর্বে 'ঢাকা' ছিলেন বলে তাঁর নাম ঢাকেশ্বরী হয়।[৪] অন্য কিংবদন্তি অনুযায়ী ইসলাম খাঁ যখন বুড়িগঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হন তখন একদল বাদ্যকর ঢাক বাজিয়ে পূজা করতে ছিল। ইসলাম খাঁ তাদেরকে ডেকে এনে ঢাক বাজানোর আদেশ দিলেন এবং ঢাক এর শব্দ শ্রবণের শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজধানীর সীমা নির্দিষ্ট করে নামকরণ করেন 'ঢাকা'।[৫] জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির সাথে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্যতা নিরূপণ করা বিজ্ঞান সম্মত কাজ নয়। অনেক ইতিহাসবিদ ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, 'রাজতরঙ্গিনী'তে ব্যবহৃত 'ঢাক্কা' অর্থাৎ পাহারা চৌকি থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ প্রাচীন কালে পূর্ববাংলার নিম্নাঞ্চলের মধ্যে ঢাকা উচ্চভূমি ছিল এবং তা প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুর এবং সোনারগাঁও এর পাহারা চৌকি হিসাবে ব্যবহৃত হত। এসব লেখক তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আরেকটি অতিরিক্ত যুক্তি খুঁজে পান প্রাকৃত ভাষায় প্রচলিত 'ঢাকা ভাষা' নামের মধ্যে।[৬] কিন্তু আবদুল করিম আধুনিক লেখকদের উক্ত যুক্তি গ্রহণ করেন নি। কারণ প্রাচীন কালে আজকের ঢাকা আদৌ উচ্চভূমি ছিল কিনা, সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে তিনি প্রচলিত, ঢাকা ভাষা'র বিপক্ষে যুক্তি দেখাতে পারেন নি। আধুনিক কোনো কোনো পণ্ডিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভের শিলালিপিতে বর্ণিত 'দাভাকাকে' ঢাকা বলে মনে করেন। আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত জোয়াও ডি ব্যারোস-এর মানচিত্রে ঢাকা'র অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।[৭] যাইহোক এটা অনুমান করা যেতে পারে 'ঢক্কা' শব্দ হতে ঢাকা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে ঢাকার প্রাচীনতম বর্ণনা পাওয়া যায় '*আকবরনামা*'য়। কারণ ১৫৮৩ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুগল সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা ভাটি অঞ্চলের স্বাধীন বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন '*আকবরনামা*'য় তার বিবরণ আছে।[৮] তাছাড়া

---

৩. প্রচলিত প্রবাদটির জন্য দেখুন, James Tylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, p. 91; Bradley Birt, *Romance of an Eastern Capital*, ibid., p. 95; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭২

৪. শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১৮

৫. Syid Aulad Hasan, 1904, *Notes of the Antiquities of Dacca*, pp. 1-2; Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 3; James Taylor, *Topography*, ibid, p. 91; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

৬. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 3; আরও দেখুন, ভি.সি. সরকার, *ভারতীয় বিদ্যা*, একাদশ খন্ড তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা; A. Imam, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* vol. iii, 1958, pp. 199-201

৭. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 27

৮. *ibid*

*Dhaka University Institutional Repository*

রাজা টোডরমল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন *'আইন-ই-আকবরী'* গ্রন্থে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনা অনুসারে ঢাকা শহরটি 'ঢাকা বাজু' নামক একটি পরগনার অধীনে 'সরকার বাজুহার' অন্তর্গত ছিল।[৯] তখনকার দিনে একটি থানা হিসাবে ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ঢাকা একজন থানাদারের প্রশাসনাধীন ছিল বলে জানা যায়। এ সময়ে 'সরকার বাজুহার' অধীনে 'ঢাকা বাজু' নামক একটি পরগনার অন্তর্গত ঢাকা শহর গড়ে উঠার প্রথম পর্যায় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।[১০] শ্রী কেদারনাথ মজুমদার বলেন, ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খাঁ এই ঢাকাবাজুতে এসে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন ও পরগনা বা বাজুর নামানুসারে রাজধানীর নাম প্রদান করেন। তদবধি এই স্থান ঢাকা নামে পরিচিত।[১১] উল্লেখ্য, ইসলাম খাঁ ঢাকায় আগমনের সাল নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কেউ ১৬০৮ সাল আবার কেউ বিশেষত আবদুল করিম ১৬১০ সাল বলে উল্লেখ করেন। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে অধ্যাপক করিমের মতকে গ্রহণ করা হয়েছে। *'আকবরনামা'*য় ঢাকাকে থানা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একটি থানা বলতে বোঝাতো আক্রমণ অথবা প্রতিরক্ষার জন্য কয়েক শত, এমন কি কয়েক হাজার সৈন্যের ছাউনি বা ক্যান্টনমেন্ট। স্বাভাবিকভাবে সেনা ছাউনিতে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনেই ব্যবসায়ী এবং দোকানদার শ্রেণি এখানে এসে ভিড় জমাতো এবং তাদের কর্মতৎপরতার ফলে এই অঞ্চলটি শহরে পরিণত হয়। আধুনিক বিবেচনায় পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত স্থানকে শহর বলা হয়। এভাবেই সেই সময়ে মুগল থানাকে কেন্দ্র করে ঢাকা 'শহর' হিসাবে গড়ে উঠে।[১২]

## খ. ঢাকা 'শহর' থেকে 'পৌরসভা'য় উন্নীত

১৬০৮ এবং ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকা রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে পরিগণিত হয়।[১৩] বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের তারিখের মত কারণ সম্পর্কেও আধুনিক পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। মোটকথা স্থানীয় বিদ্রোহী জমিদার ও সামন্ত প্রধানদের দমন, মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন এবং সর্বোপরি মুগল রাজ্য বিস্তারের নীতি হিসাবে রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।[১৪] ১৬১০ সালে

---

৯. Abul Fazl, *Ain-i-Akbari,* (trans. H.S. Jarrett), 1891, Vol. 2, Calcutta, p. 151; cited by Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 27; আরও দেখুন, কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

১০. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 28

১১. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২

১২. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 27-28

১৩. James Taylor, *Topography*, ibid, p. 94-5

১৪.রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ও আলোচনার জন্য দেখুন, Charles Stewart, 1847, *History of Bengal*, Black Pary & Co., London, pp. 131-37; Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 9-10; James Taylor, *Topography*, ibid, p. 94-5; শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ২০০৬, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, তৃতীয় সংস্করণ, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ১৪; S.N. Bhattacharyya, *Transfer of the Capital of Mughal Bengal*, *Dacca University Studies*,

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকা বাংলার রাজধানীতে[১৫] পরিণত হওয়ার পর মাঝখানে (১৬৩৯-৬০) একুশ বছর ছাড়া ঢাকার মর্যাদা পরবর্তী প্রায় একশত বছর পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে।[১৬] এই সময়ে প্রশাসনিক সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। এখানে বিদ্যমান ছিল সুবাদারের বাসস্থান এবং অন্যান্য রাজকীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যালয়। এই সময়কালের মধ্যে শাহজাদা শাহ সুজা তাঁর সুবাদারিকালে একান্ত ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই ব্যবস্থা ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখলের পর শাহসুজা আরাকানে পালিয়ে গেলে পরবর্তী নতুন সুবাদার মীর জুমলা পুনরায় ঢাকায় রাজধানী পুনঃস্থাপন করেন।[১৭] ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের শাসনভার একজন নায়েব বা নাজিমের সহকারীর উপর অর্পণ করা হয়; এবং এই সময় হতে ঢাকা নগরী রাজধানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়।[১৮] কারণ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার সুবাদার শাহজাদা আজিম-উশ-শান ও নবনিযুক্ত দেওয়ান মুর্শিদকুলী খানের মধ্যে দ্বন্দ্বের[১৯] কারণে মুর্শিদকুলী খান ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দিউয়ানি মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।[২০] অতঃপর নবাব মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।[২১] যদিও বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করা হয়েছে এবং তা সরিয়ে নেয়াও হয়েছে। তাই প্রশাসনিক কারণে অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার হলে শহর উজ্জিবীত হয়েছে। সুতরাং প্রশাসনিক স্থানান্তরের ফলে শহরের ম্রিয়মাণ হয়েছে বটে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।[২২] ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ইংরেজরা ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং জন মার্চ ও জন স্মীথকে ঢাকার বাণিজ্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়।[২৩] ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলায় ইংরেজগণ জব চার্নকের নেতৃত্বে মুগল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখনই ঢাকার কুঠি বন্ধ হয়ে যায়।[২৪] ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের আমলে সেই কুঠি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২৫] তখন থেকে বাংলায়

---

vol. 1, No. 1, Nov., 1935, pp. 36-63; Mirza Nathan, *Baharistan-I- Ghaybi*, (trans. Dr. M. Islam Borah), 1936, vol. 1, Government of Assam, Assam, p. 9 and 45

১৫. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 14; ঢাকা'তে রাজধানী স্থানান্তরের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত ও বিতর্কের জন্য দেখুন Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 9-14। অধিকাংশের মতে, ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ১৬০৮ সালে। আহমেদ হাসান দানী (Dani, DACCA, 1956, p. 7) বলেন, ১৬০৮ সালে ঢাকায় মুগল রাজধানী স্থাপিত হয়। অধ্যাপক করিম যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন, ইসলাম খাঁ ঢাকায় ১৬১০ সালে প্রবেশ করেন এবং রাজধানী স্থাপন করেন। একই সময়ে এ নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করা হয়। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে অধ্যাপক করিমের মতই গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩ (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, পৃ. XV

১৭. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 14-15; B.C. Allen, 1912, *Eastern Bengal District Gazetteers Dacca*, The Pioneer Press, Allahabad, p. 172

১৮. F.D. Ascoli, 1917, *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report 1812*, Clarendon Press, Oxford, pp. 15-6; James Taylor, *Topography*, ibid, p. 80-1;

১৯. মুর্শিদকুলী খান ও আজিম-উশ-শান এর মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 15-17; James Taylor, *Topography*, ibid, p. 79-81

২০. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 17

২১. Kamal Siddique & et al, 1990, *Social Formation in Dhaka City*, University Press Limited, Dhaka, p. 7

২২. মুনতাসীর মামুন, ২০০১, *উনিশ শতকের ঢাকা (অবয়বগত বিকাশের একটি বিবরণ)*, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ৮-৯

২৩. Dacca Dairies I, *Selection From Dacca Review*, Vol. 7, 1917-18, p. 100; Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 74; কিন্তু অতুল কৃষ্ণ রায় বলেন, ১৬৬৮ তে ইংরেজগণ বাংলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় একটি কুঠি স্থাপন করেন। (অতুল কৃষ্ণ রায়, ১৯৮২, *কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (ভাষান্তর অন্দোদন সেন), ঋদ্ধি-ইন্ডিয়া, কলিকাতা, পৃ. ৩৪)

২৪. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 75

*Dhaka University Institutional Repository*

ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ কুঠি ঢাকার সঙ্গে বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর সমগ্র বাংলা সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চলে যায়। ফলে ব্রিটিশরা এদেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাষ্ট্র কাঠামো, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল গঠন ও নির্বাচন প্রথা প্রভৃতি প্রবর্তন করেন। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের মত ১৮৬৪ সালে Municipal Act এর অধীনে ঢাকা-কে পৌরসভার মর্যাদা দান করে।

## গ. ঢাকা শহরের ভৌগোলিক অবস্থান

ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে স্যার চালর্স ডয়েলী বলেন, ঢাকা বাংলার পূর্বাংশে অবস্থিত, গঙ্গার মুখ থেকে প্রায় ১০০ মাইল উপরে এবং কলকাতা থেকে সড়ক পথে প্রায় ১৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। কারতে জেনারেল (Carte Generale) এর মতে ঢাকার অবস্থান ২৩°৫৭′ উত্তর অক্ষাংশ ৯০°৩৭′ পূর্ব দ্রাঘিমাতে। রেনেলের মতে ঢাকা ২৩°৪০′ অক্ষাংশ এবং ৯০°২৯′ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[২৬] বি সি অ্যালান বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ে উত্তরে ২৩.৪৩ অক্ষাংশ ও পূর্বে ৯০.২৪ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে ঢাকা শহরের অবস্থান। ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ৮ মাইল উপরে এবং কলকাতা থেকে ২৫৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।[২৭] কিন্তু উইলিয়াম হান্টার ও যতীন্দ্রমোহনের মতে, ভৌগোলিক সীমারেখার দিক দিয়ে ঢাকা শহর উত্তর নিরক্ষ ২৩°-৪৩′-২০" এবং পূর্ব দ্রাঘিমা ৯০°-২৬′-১০" এর মধ্যে, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান হতে ৮ মাইল বা উত্তরে এবং কলকাতা হতে ১৮৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।[২৮] ঢাকা শহরের ভৌগোলিক অবস্থানের নানা তথ্য প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন সময়ে ঢাকা শহরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। যাই হোক ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ অঞ্চলটি সাধারণত পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাংলা নামেই পরিচিত ছিল এবং ঢাকা ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান শহর। অবয়বগত দিক দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত[২৯] মহানগরী ঢাকা বর্তমান বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। D' Anvile ঢাকা নগরীকে গঙ্গার উত্তরতটে, জলঙ্গি নদীর মোহানা হতে ৬৪ মাইল দূরে অবস্থিত বলে নির্দেশ করেছেন। যতীন্দ্রমোহন রায় অনুমান করেন D' Anvile বুড়িগঙ্গাকেই গঙ্গানদী বলে অভিহিত করেছেন।[৩০] ঢাকা যে কেবল বুড়িগঙ্গার তীরেই অবস্থিত তাই নয় আলোচ্য সময়ে এই শহরের বুক চিরেও বয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু

---

[২৫]. *Bengal Public Consultation*, 19 January & 25 March, 1723 cited by Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 75

[২৬]. Sir Charles D'Oyly, *Antiquities of Dacca*, John Landseer, Foly Street, London, p. 1

[২৭]. B.C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers Dacca*, p. 171

[২৮]. W.W. Hunter, 1877, *A Statistical Account of Dacca*, vol. v, Trubner & Co., London, p. 65; যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[২৯]. James Taylor, *Topography*, ibid, p. 86

[৩০]. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাথম খণ্ড, পৃ. XXIII

*Dhaka University Institutional Repository*

নদী আর খাল। এদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছে দুলাই নদী বা দুলাই খাল যা ধোলাই খাল। যদিও উনিশ শতকে দুলাই নদী বা ধোলাই খাল পলিতে প্রায় ভরে উঠত তথাপি এই নদীটি বিশেষত বর্ষাকালে শহরের অভ্যন্তরে জলপথে যাতায়াতের এক সুন্দর ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যা কৌশলগত এবং বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৩১] মির্জা নাথান *'বাহারিস্থান-ই-গায়াবী'*তে লিখেছেন যে, ঢাকা শহর দোলাই নদীর তীরে অবস্থিত, যা ঢাকা পৌঁছার পূর্বে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা খিজিরপুরের নিকটে লক্ষ্যা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং অন্য শাখা চার মাইল উজানে ডেমরার নিকটে একই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।[৩২]

## ঘ. ঢাকা শহরের সীমানা ও আয়তন

আমার আলোচ্য সময়ে ঢাকা শহরের সীমানা ও লোকসংখ্যা স্থির ছিল না। কারণ তখন ঢাকা শহর বিকাশমান ছিল। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন ঢাকায় পৌঁছায় তখন বাদ্যকর দ্বারা ঢাক বাজিয়ে ঢাকের শব্দ পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে যতদূর ধ্বনিত হয় ততদূর পর্যন্ত তাঁর স্থাপিত রাজধানীর সীমা নির্দিষ্ট করেন।[৩৩] ইসলাম খাঁর সমসাময়িক মির্জা নাথানের *'বাহারিস্থান-ই-গায়বী'* পর্যালোচনা করে ড. আবদুল করিম ইসলাম খাঁর রাজধানীর সীমানা নির্ধারণ করেন বর্তমান বাবু বাজার এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের মাঝামাঝি এলাকা এবং সম্ভবত পুরাতন ঢাকার পূর্ব সীমানা হল পাটুয়াটুলী অথবা বড় জোর আধুনিক সদরঘাটের কাছাকাছি কোথাও। সম্ভবত মির্জা নাথানের বাসভবন এই এলাকার কোথাও ছিল।[৩৪] ইসলাম খাঁর সময় ঢাকা শহর পশ্চিমে চকবাজার থেকে পূর্বে সদরঘাট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং পরবর্তীকালে মুগল শাসকদের আগমনের ফলে শহরের পশ্চিমার্ধে বসতি স্থাপিত হয়।[৩৫] সতের শতকের অর্থাৎ ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকজন বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ হতেও সমসাময়িক ঢাকা শহরের সীমানা ও আয়তন সম্পর্কে জানা যায়। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ঢাকায় আগমন করেন। তিনি বলেন যে, ঢাকা শহর একদিকে মনেশ্বর থেকে অন্যদিকে নারিন্দা ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত দেড় লীগেরও অধিক বিস্তৃত ছিল যা শহরের সম্প্রসারণ সুসম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছিল।[৩৬] শরীফ উদ্দিন আহমেদ দেড় লীগকে হিসেব কষে প্রায় সোয়া পাঁচ মাইলের কথা বলেন। ম্যানরিকের

---

৩১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, প্রাগুক্ত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪

৩২. Mirza Nathan, *Baharistan-I- Ghaybi*, (trans. Dr. M. Islam Borah), vol. 1, p. 76; Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 31

৩৩. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭২

৩৪. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 32

৩৫. ibid

৩৬. Sebastian Manrique, 1927, *Travels of Fray Sebastian Manrique 1629-1643:* A Translation of *The Itinerario De Las Missiones Orientales*, Vol. I, (trans by Eckford Luard), KRAUS REPRINT LIMITED, Nendeln/Liechtenstein, (rep 1967), pp. 43-5 & 56-7; আরও দেখুন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬; Bengal Past and Present, Vol. 51, 1936, p. 52 cited by Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 32-3

*Dhaka University Institutional Repository*

বর্ণনা পর্যালোচনা করে, আবদুল করিম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলাম খাঁর পরে প্রায় সিকি শতকের মধ্যে ঢাকা শহর অতিদ্রুত প্রসার লাভ করে। মির্জা নাথানের বর্ণিত নতুন এবং পুরাতন শহর পশ্চিম দিকে প্রায় দ্বিগুণ প্রসার লাভ করে এবং মনেশ্বর ও হাজারীবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্বদিকে শহরের বিস্তৃতি তত বেশি ছিল না। এ বিস্তৃতি ছিল মূলত পুরাতন ঢাকার সমান কিংবা তার চেয়েও কম। কিন্তু ম্যানরিকের বিবরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত শহরের দ্রুত প্রসার ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এই অংশটি ছিল মুগল আমলে সরকারি সংস্থাপনার সদর দপ্তর। সুতরাং এই সময়ে প্রধানত সরকারি প্রয়োজনে এবং উদ্যোগে শহর পশ্চিম দিকে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল।[৩৭]

মুগল শাসকরা ঢাকায় লোকজনদের বসতি স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য দান করেছিলেন লাখেরাজ সম্পত্তি।[৩৮] মুগল সরকারের উক্ত সিদ্ধান্ত ঢাকা শহরে বিস্তৃতি ও এর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। মুগল আমলে ঢাকা শহর বিস্তৃত ছিল প্রায় সদরঘাট থেকে মিরপুর পর্যন্ত।[৩৯] তাই শায়েস্তা খানের শাসনামলকে (১৬৬৩-১৬৭৯) ঢাকা শহরের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্বের একটি বৃহৎ শহরের গৌরব অর্জন করে।[৪০] শহরতলীসহ ঢাকা নগরী চৌদ্দ মাইল দূরত্বে অবস্থিত টঙ্গি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৪১] সতের শতকের মাঝামাঝি হতে শেষ দশক পর্যন্ত কয়েকজন বিদেশি পরিব্রাজক ঢাকায় পদার্পণ করেন। সেসব প্রত্যক্ষদর্শী ভ্রমণকারীদের বিবরণ হতেও সমসাময়িক ঢাকা'র আয়তন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে মানুচি ঢাকায় আসেন। তাঁর বিবরণীতে লিখেন, অনেক মানুষের বসতি থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহর তেমন বড় নয় এবং এখানে অধিকাংশ ঘরবাড়ি খড়ের তৈরি।[৪২] ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন পরিব্রাজক টেভার্নিয়ার। তাঁর বর্ণনায় বলা হয়- ঢাকা শহর একটি বড় শহর, কিন্তু কেবল দৈর্ঘ্যে এর বিস্তার ঘটেছে, কারণ এখানে বহিরাগত সকলেই নদীর তীরে বাড়ি নির্মাণ করতে চেয়েছে। শহরের দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক দুই লীগ।[৪৩] ১৬৬৯-৭৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে থমাস বৌরী লিখেছেন যে, শহরটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু তার অবস্থান নীচু জলাভূমির মধ্যে শহরটির পরিধি ইংরেজি (৪০) চল্লিশ মাইলের কম ছিল না।[৪৪] মুগল আমলে ঢাকা যখন তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির তুঙ্গে ছিল তখন ঢাকার সীমানা দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী থেকে উত্তরে টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল এবং পশ্চিমে জাফরাবাদ থেকে পূর্বে

---

[৩৭]. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 34-5

[৩৮]. F.D.Ascoli, *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the Dacca District*, Calcutta, 1917; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১২

[৩৯]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৯

[৪০]. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid, p. 6

[৪১]. James Taylor, *Topography*, ibid, p. 78

[৪২]. Niccolao Manucci, 1907, *Mogul India 1653-1708 or Storia do Mogor, (*tr & ed William Irvine), Vol. II, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, (rep 1989) p. 80, 91; Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 36

[৪৩]. J.B Tavernier, 1889, *Travels in India*, (Trans. by Dr. Valentine Ball, ed. By William Crooke) Vol. I, 2nd edition, Atlantic Publishers, (reprinted 1989) New Delhi, p. 101, 102; Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 37

[৪৪]. Thomas Bowrey, 1905, *A Geographical Account of the Countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679*, Printed for the Hakluyt Society, pp. 149-51 cited by Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 37

*Dhaka University Institutional Repository*

পোস্তগোলা পর্যন্ত প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত ছিল।[৪৫] অতএব, মুগল ঢাকার দূরতম সীমানা হিসাবে ধার্য করা যেতে পারে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী, পশ্চিমে জাফরাবাদ-মিরপুর এবং পূর্বে পোস্তগোলা।[৪৬]

ঢাকা শহরের প্রসারতা সম্পর্কে আরো জানা যায় ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি প্রাপ্তির পর তাদের দলিলপত্রে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট শহরের সীমানা হিসাবে গ্রহণ করেন দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী-জামালপুর, পূর্বে পোস্তগোলা এবং পশ্চিমে মিরপুর।[৪৭] ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ঢাকা শহরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইল এবং প্রশস্ত প্রায় আড়াই মাইল ছিল।[৪৮] ১৮০০ সালে কোম্পানির ঢাকাস্থ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জন টেলর ঢাকার সীমানা নির্ধারণ করেন দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী, পশ্চিমে জাফরাবাদ এবং পূর্বে পোস্তগোলা।[৪৯] কোম্পানি আমলে ঢাকা শহরের সীমানা হ্রাস পায়। ১৮০১ সালে ঢাকা শহরের সীমানা সংকোচিত হয়ে পশ্চিমে এনায়েতগঞ্জ থেকে পূর্বে ফরিদাবাদ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন মাইল এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে দেওয়ানবাজার পর্যন্ত প্রায় দেড় মাইলে দাঁড়ায়।[৫০] ১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ সরকার শহরের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন। ফলে ঢাকা নগরীর আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ সালে ঢাকা পৌরসভার আয়তন ছিল ৬ বর্গমাইল।[৫১] ১৮৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮ বর্গমাইলে।[৫২] ১৯০১ সালে ২ বর্গমাইল বেড়ে দাঁড়ায় ১০ বর্গমাইলে যা ১৯১১ সাল পর্যন্ত স্থিতি ছিল।[৫৩]

### ঙ. জনসংখ্যা

উপরে বর্ণিত ঢাকা শহরের সীমানা ও আয়তনের মত শহরের জনসংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। মুগল আমলে লোকসংখ্যার কোনো সরকারি দলিল পাওয়া যায় নি। তবে ইসলাম খাঁর সমসাময়িক লেখক মির্জা নাথান এর '*বাহারিস্থান-ই-গায়বী*' এর বর্ণনা পর্যালোচনাপূর্বক আবদুল করিম শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষ নির্ধারণ করেন।[৫৪]

---

৪৫. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid., p. 6
৪৬. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 37-40
৪৭. *India Office Records*, Proceedings of the Board of Revenue, No. 13, 8 Jun, 1787 cited by Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 37
৪৮. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid., p. 7
৪৯. *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, Vol. 7, No. 2, p. 341 cited by Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 37
৫০. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid, p. 7
৫১. *Ibid*
৫২. *Ibid*, p. 8
৫৩. *Ibid*
৫৪. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 90-1

*Dhaka University Institutional Repository*

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ঢাকা নগরী ও তার উপকণ্ঠের লোকসংখ্যা দুই লক্ষ নির্ধারণ করেন।[৫৫] ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের সময় ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪৫০,০০০ জন।[৫৬] ১৮০১ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বছরের ঢাকা শহরের জনসংখ্যার নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে শরীফ উদ্দিন আহমেদ তাঁর 'ঢাকা' নামক গ্রন্থে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন। নিম্নলিখিত তথ্য ও উপাত্ত তাঁর গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

সারণি-১

| সাল | জনসংখ্যা |
|---|---|
| ১৮০১ | ২,০০,০০০ |
| ১৮৩০ | ৭৫,০০০ |
| ১৮৩৮ | ৬৮,৬১০ |
| ১৮৫৯ | ৫১,৬৩৬ |
| ১৮৬৮ | ৬০,০০০ |
| ১৮৭২ | ৬৯,২১২ |
| ১৮৭৮ | ৭৫,০০০ |
| ১৮৮১ | ৭৯,০৭৬ |
| ১৮৮৩ | ৭৭,৬৬১* |
| ১৮৯১ | ৮৩,৬৩৩ |
| ১৯০১ | ৯০,০০০ |

(উৎসঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ২০০১, ঢাকাঃ ইতিহাস ও নগর জীবন, (তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬), একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৪৩-৪)

* ১৮৮২ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা শহরের একেবারে উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গল ঘেরা এবং বৃহৎ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত আটটি মহল্লা বাদ দিয়ে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেন। তাই ১৮৮৩ সালে জনসংখ্যা কম।

১৮৫৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ বৃদ্ধি পায়। কারণ পাট শিল্পের বিকাশের জন্য কিন্তু শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই বৃদ্ধি মূলত ঘটেছিল প্রাকৃতিক কারণে এবং খুব সামান্য মাইগ্রেশনের ফলে।[৫৭] ১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল

---

[৫৫]. *Travels of Fray Sebastion Manrique*, Vol.-1, pp. 44-5; **আরও দেখুন,** Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, p. 91

[৫৬]. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid., p. 7

[৫৭]. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৪

*Dhaka University Institutional Repository*

২১%।[৫৮] বলার অপেক্ষা রাখে না, ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল নিম্নবর্গের। কিন্তু এ বিরাট জনগোষ্ঠীর সঠিক তথ্য ও ইতিহাস আজও অজানা। কেননা ঔপনিবেশিক সরকার ধর্ম এবং বর্ণের দিক থেকে সমাজকে বিচার করেছিল নিজ স্বার্থে।[৫৯] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঢাকায় অনেক বহিরাগত শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নীতিও সহায়ক ছিল, যেমন- ১৮৭০ সালের ৭ নং অধ্যাদেশ জারির পর থেকে পাবলিক ল্যাট্রিন্স তৈরি করা হয় এবং সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এসব ল্যাট্রিন্স পরিষ্কার করার জন্য ৫০ জন সুইপারকে কানপুর থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।[৬০] ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের মধ্যে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত হিন্দুস্তানিদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। এ সকল উত্তর-ভারতীয় লোকদের শ্রমিক ও পাহারাদের হিসাবে নিয়োগ করা হত।[৬১]

## ৮. অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের শিরোনামের মধ্যেই এর বিষয়বস্তু, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর গবেষণাকর্মটির প্রয়োজনীয়তা কত প্রকট তা উপলব্ধি করা যাবে ঢাকা বিষয়ক কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের মন্তব্য হৃদয়ঙ্গম করলে। সেই নবাব নসরত জং-এর *'তাওয়ারিখে ঢাকা'* থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিরলসভাবে রচিত হয়ে চলেছে ঢাকা বিষয়ক বিভিন্ন রচনাবলী। সূচনাকাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিষয়ক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি রিপোর্ট, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, গ্রন্থ, বিভিন্ন গবেষণাকর্ম এবং সাধারণ সাময়িকীতে প্রকাশিত বিবিধ রচনাবলীর সম্বলিত তালিকা নিয়ে প্রকাশিত হয় *'ঢাকা রচনাপঞ্জী সংকলন'*। এ গ্রন্থে ঢাকা বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ, সরকারি বেসরকারি রিপোর্ট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত সর্বমোট ২৩৩২টি রচনা'র শিরোনাম রয়েছে।[৬২] এ সব রচনাবলীতে প্রতিফলিত হয়েছে ঢাকার উচ্চবর্গের ইতিহাস। ঢাকা শহরের নিম্নবর্গ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যদিও ঢাকা বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিম্নবর্গ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আমার জানা মতে কলকাতা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাসের উপর কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু ঢাকা শহরের উপর এ ধরনের কোন কাজ দেখা যায় না। তবে মুগল রাজধানী ঢাকার বড় সৌভাগ্য যে, এটি বহু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নবাব নসরত জং, চার্লস ডয়লী, সৈয়দ আওলাদ হাসান, রহমান আলী তায়েশ, হাকীম হাবিবুর রহমান, এস.এম

---

[৫৮]. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid., p. 8

[৫৯]. জেমস ওয়াইজ, ১৯৯৮, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (অনু. ফওজুল করিম)*, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), ১ম ভাগ, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৬

[৬০]. *Letter, From the Officiating Commissioner of the Dacca Division to the Secretary to the Government of Bengal*, letter no. 452, dated on 8th August 1878, Printed Proceedings, Vol. 106, List no 5.2, p. 4

[৬১]. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৫

[৬২]. আবদুল মালেক (সংকলক ও সম্পাদক), ২০০৭, *ঢাকা: রচনাপঞ্জী সংকলন*, ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ১৭৪

*Dhaka University Institutional Repository*

তাইফুর এবং এ. এইচ. দানী'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁরা সকলেই ঢাকার ইতিহাস ও স্থাপত্যসমূহের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৬৩] ড. আবদুল করিম *'মোগল রাজধানী ঢাকা'* গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, মুগল প্রশাসনিক ইতিহাসে ঢাকার ভূমিকা, মুগল রাজধানী ঢাকার উত্থান ও পতনের জন্য যেসকল অর্থনৈতিক কারণ দায়ী তা আলোচনা করা।[৬৪] *'ঢাকাঃ ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)'* গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, "ঢাকার উপর উনিশ ও বিশ শতকে বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। তবে এদের বেশির ভাগের বিষয়বস্তু ছিল নগরটির প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন এবং মুগল আমলের ইতিহাস।"[৬৫] শরীফ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক রচিত *'ঢাকাঃ ইতিহাস ও নগর জীবন'* গ্রন্থটি সম্পর্কে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন মন্তব্য করেন, 'সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত এ গ্রন্থ... এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ঢাকা সম্পর্কিত বইয়ের মধ্যে ব্যতিক্রম এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, অধ্যাপক করিমের গ্রন্থের পর, এ পর্যন্ত ঢাকার উপর রচিত এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য'।[৬৬] কিন্তু অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও পরিধি নিয়ে মুখবন্ধে উল্লেখ করেন,

'আমার ইংরেজি বইটির প্রথম সংস্করণের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মুগল শাসনের অবসানের পর ঢাকার ভাগ্যে যে বিপর্যয় নেমে আসে এবং যা বয়ে আনে নাগরিকদের জীবনে এক অভাবনীয় দুঃখ-দুদর্শা আর নগরের জন্য ধ্বংসলীলা তা থেকে নগরটি কি করে ত্রাণ পেল সে বিষয়ে আলোকপাত করা। .... মোট কথা ঢাকার পুনরুত্থানের ইতিহাস বর্ণনা করা। একই সাথে ঔপনিবেশিক শাসকদের সংস্পর্শে এসে ঢাকার পৌর ও নগর জীবনে যে আধুনিকতা আসে তাও বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করা'।[৬৭]

উপরোক্ত মন্তব্য প্রতিবেদন হতে এ কথা সহজেই অনুমানযোগ্য যে, ঐসব গ্রন্থে ঢাকার বাণিজ্য, শিল্প, ভূ-প্রকৃতি, খাদ্য-দ্রব্য, ঢাকা নগরের অভ্যুদয় ও পুনরুত্থান এবং বিভিন্ন ইমারত-স্থাপনার ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা শহরের উদ্ভবের সময় থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশাজীবী মানুষদের বসবাস এবং ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পর নগরকে স্বাস্থ্যসম্মত ও বাসযোগ্য করার জন্য পরিচ্ছন্নকর্মীদের সমাবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের রাজনৈতিক চৈতন্য নিয়ে গবেষণালব্ধ কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এ অভাব লাঘবের জন্য *'ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস (১৮৬৪-১৯০৫)'* শিরোনামে অভিসন্দর্ভটির গুরুত্ব অনেক।

---

৬৩. Abdul Karim, *DACCA the Mughal Capital*, (preface, vii)
৬৪. *ibid*
৬৫. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫
৬৬. মুনতাসীর মামুন, ১৯৯১, *ঢাকার হারিয়ে যাওয়া কামান*, ঢাকা গ্রন্থমালা-৯, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, পৃ. ২২-৩
৬৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. XII

*Dhaka University Institutional Repository*

## ছ. অভিসন্দর্ভের সময়কাল

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটির সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, এ সময়টিকে কেন বেছে নেয়া হয়েছে? ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। অতঃপর প্রশাসনিক রদবদল ঘটে। অর্থাৎ সরাসরি ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। ভারতীয় প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ পরবর্তী ব্রিটিশ সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতিমালার অংশ হিসাবে ১৮৫০ সালের 'Bengal Municipal Act' এর অধীনে ১৮৬৪ সালে 'ঢাকা পৌরসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তু ঢাকা শহরের নিম্নবর্গ তাই 'ঢাকা পৌরসভা' প্রতিষ্ঠার সালকে অভিসন্দর্ভের সময়কালের শুরু নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে ঢাকা শহরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরেক মাইল ফলক হল ১৯০৫ সাল। এ সময় ঔপনিবেশিক সরকার নিজ স্বার্থে বাংলাকে বিভক্ত করে, যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। এ সময় পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা শহরকে। বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠে। এ সময় ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের মানুষদের স্বার্থ ও তাদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এ সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে, আমার মনে হয়েছে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

## জ. অধ্যায়সমূহ

**ক.**

অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতিরেকে চারটি অধ্যায় দ্বারা সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়-***'নিম্নবর্গের সংজ্ঞা এবং ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচয়'***। ইতালীর মার্ক্সবাদী অ্যান্তোনিও গ্রামসি (১৮১৮-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোট বই'তে সর্বপ্রথম 'সাবলটার্ন' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংরেজি শব্দ "Subaltern" এর আভিধানিক অর্থ হলো অধস্তন ব্যক্তি। কিন্তু ইতিহাসবিদদের নিকট শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং আলাদা। সাম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'সাবলটার্ন' ধারণাটিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেন 'নিম্নবর্গ'। *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* নামক প্রবন্ধসংকলনগুলিতে এবং জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে এ ধারণাটি ব্যাপক ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামসির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। কিন্তু তার প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে।[৬৮] ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস চর্চায়

---

[৬৮]. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকাঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, (গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ. ৫

*Dhaka University Institutional Repository*

নিম্নবর্গের অবস্থানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্থপতি রণজিৎ গুহ। সাবলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডের শুরুতে রণজিৎ গুহ রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাকে পরবর্তীকালে অনেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার 'ম্যানিফেস্টো' বলে অভিহিত করেন। এই প্রবন্ধের প্রথম লাইনে বলা হয় "ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। উভয়ই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভাবাদর্শ থেকে প্রসূত।"[৬৯] নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য হল উক্ত দু'ধরনের উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরোধিতা করা। এক দিকে কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিক দেখাবার চেষ্টা করেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতা দখলের কৌশল মাত্র। চিরাচরিত জাতি, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বন্ধনকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এর তুমুল প্রতিবাদ করে বলেন, জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা। রণজিৎ গুহ বলেন, এই দুটি ইতিহাস মূলত উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হল উচ্চবর্গের ক্রিয়ালাপের ফসল। এ দুটি ইতিহাসের কোনটাতেই জনগণের নিজস্ব রাজনীতির কোন স্থান নেই। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী আর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতার পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রথম কর্মসূচী নির্দিষ্ট হয়।[৭০] সাবলটার্ন (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি গ্রামসি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়াট' এর প্রতিশব্দ। এ বিন্যাসে শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে থাকে 'হেজেমনিক' শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিমালিক, 'বুর্জোয়াসি'। অন্যদিকে গ্রামসি যে কোন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের তলার বা নিচু শ্রেণিকে 'সাবলটার্ন' শ্রেণি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি', অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন শ্রেণি'। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক।[৭১] সমাজবিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। আবার উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন-রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না।[৭২] যাইহোক অধস্তন শ্রেণি বা নিম্নবর্গ সম্পর্কে রণজিৎ গুহের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।[৭৩] তাঁর মতে, "অধস্তন শ্রেণি বলতে আমরা সেই শ্রেণিকে বোঝাবো যারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত নন, ক্ষমতার বিন্যাস: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক/প্রশাসনিক মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে যারা যুক্ত নন কিন্তু প্রবল শ্রেণির

---

৬৯. Ranjit Guha, *On Some Aspects of the Historiography of Colonial India*, *Suleatern Studies*, (Ranjit Guha ed.), Vol. 1, Oxford University Press, 1982, Delhi, P.1

৭০. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', *নিম্নবর্গের ইতিহাস* (গৌতমভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পা.), পৃ.১০

৭১. ঐ, পৃ. ৩

৭২. ঐ, পৃ. ৭

৭৩. Ranajit Guha, *On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, Subaltern Studies 1*, Ranjit Guha (ed.), ibid., pp. 1-8; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১০৮

*Dhaka University Institutional Repository*

রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্থনৈতক স্বার্থ ও মতাদর্শগত প্রভাবের মধ্যে যারা অন্তরিত।" রণজিৎ গুহ কৃষি সমাজব্যবস্থায় সর্বনিম্নে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে 'নিম্নবর্গ' বলে অভিহিত করেন। অন্যভাবে, নিম্নবর্গ বলতে সমাজের অধস্তন গোষ্ঠীকে বোঝায়। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা হতে পারে কৃষক বা কৃষি শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কাঠমিস্ত্রি, কামার, রাজমিস্ত্রি, মৃৎশিল্পী বা কুমার এবং মাঝি প্রমুখ। ধর্ম ও বর্ণের দিক দিয়ে হরিজন, নমঃশূদ্র নিম্নবর্গের আওতাধীন। এমনকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদেরকে নিম্নবর্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠী দিন আনে দিন খায়। নিম্নবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো - তারা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, আর্থিক ভাবে দৈন এবং সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ।[৭৪] সুতরাং আলোচ্য অভিসন্দর্ভের নিম্নবর্গ হলো- ঢাকা শহরের চাষী, হস্ত ও কারুশিল্প শ্রমিক, নানা পেশাভিত্তিক শ্রমিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী, গণিকা, জেলের কয়েদি, অভিবাসন শ্রমিক ও ঢাকা পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মী প্রমুখ।

খ.

দ্বিতীয় অধ্যায়ে - *'ঢাকার পুনরুত্থান এবং নিম্নবর্গের সমাবেশ'* বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঢাকা শহরে ব্রিটিশ বণিকদের আগমনের পর হস্তশিল্প ও কারুশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা এবং এর আয়তন হ্রাস পায়। ঢাকা শহর পরিণত হয় এক মৃত নগরীতে। ১৮৪০ সালে জেমস টেলর ঢাকা শহরকে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর স্থান বলে উল্লেখ করেন।[৭৫] ১৮২০ সালের দিকে, ঢাকা ছিল অস্বাস্থ্যকর নোংরা পুতিময় জঞ্জাল জঙ্গলে ভরা এক শহর।[৭৬] ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার বলেন, শহরের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল ধ্বংস ও জঙ্গলে পরিণত হয়।[৭৭] মুগল আমলে যে শহর গড়ে উঠেছিল আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে সে শহরের জৌলুস হারিয়ে যায়। ঢাকা পরিণত হয়েছিল দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত একটি শহরে।[৭৮] "উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ঢাকা সম্পর্কে কলকাতার লর্ড বিশপ রেজিনাল্ড হেবার বলেন, ঢাকা এখন প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ। এর বাণিজ্য যা ছিল, তা' থেকে ষাট ভাগ কমে গেছে, আর চমৎকার সব অট্টালিকা, এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ জাহাঙ্গীরের দুর্গ, তাঁর তৈরি মসজিদ, এর প্রাচীন নবাবদের রাজ প্রাসাদসমূহ ডাচ, ফরাসি এবং পর্তুগিজদের ফ্যাক্টরি ও চার্চ এখন ধ্বংস প্রাপ্ত, জঙ্গলে গেছে

---

[৭৪]. Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman (ed.), 2009, *Material Conditions of the Subalterns*, International Centre for Bengal Studies, Dhaka, p. 7

[৭৫]. James Taylor, *Topography*, ibid, p. 86; Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, ibid., p. 7

[৭৬]. Walter Hamilton, 1828, *The East India Gazetteer*, Vol. II, Second edition, B.R. Publishing Corporation, Delhi (reprint 1984) p. 477; আরও দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৭৭]. Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman, *ibid*, p. 8

[৭৮]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১২

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢেকে।"[৭৯] অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, "উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শহরের মোটামুটি ক্ষয় শুরু হয় এবং শহরের পরিধিও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ঢাকা খুব দ্রুত নোংরা, জঙ্গলময়, অস্বাস্থ্যকর একটি শহরে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও তার আকর্ষণ কমে যায়। লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। এক সময় যে ঢাকা ছিল রপ্তানি কেন্দ্র এবং যা ছিল তার সমৃদ্ধির মূল, ইংরেজি আমলে তা ধ্বংস হয়ে যায়।"[৮০] ১৮৪০ এর পরই কোম্পানি সরকার ঢাকা শহরের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রতি নজর দেন। ১৮৬০ এর দশকের মধ্যেই ঢাকা তার ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কে পেছনে ফেলে আবারও নতুনভাবে আর্বিভূত হয় এবং এই সময়ের মধ্যেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করে।[৮১] ১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পৌরসভাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে শহরের স্বাস্থ্য রক্ষায়। হৃদয়নাথের বর্ণনা অনুযায়ী - নতুন কিছু রাস্তাঘাট তৈরি হয়, শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, ব্যবস্থা করা হয় বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের। অর্থাৎ শহর পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে তবে শহরের অবয়বগত তেমন পরিবর্তন হয় নি। শহর বিন্যাসের পরিবর্তন হয় ১৯০৫ সালের পর।[৮২]

ঢাকা শহরে নিম্নবর্গের সমাবেশ হয়েছে নানাভাবে। মুগল আমলে ঢাকা পরিণত হয় ছোটখাটো একটি কসমোপলিটান শহরে। মুগল আমল থেকে ঢাকা সবসময়ই থেকেছে পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রে এবং পরিগণিত হয়েছে এ অঞ্চলের প্রধান শহর হিসাবে। মুগল প্রশাসনের জন্য শহর পশ্চিমে বাংলাবাজারের পর চকবাজার, বেগমবাজার, রহমতগঞ্জ, নিমতলি, আজিমপুর, হাজারিবাগ, পিলখানা, মিরপুর প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্বে পটুয়াটুলী, তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার, কুমারটুলি, লক্ষীবাজার প্রভৃতি অঞ্চল পেশাজীবিদের কারণে বিস্তৃত হতে থাকে।[৮৩] ঢাকার কয়েদিদের কোম্পানি আমলে ঢাকা শহরের উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। নির্ম্মলগুপ্ত তাঁর *'ঢাকার কথা'*য় লিখেছেন, নিজামত আদালতে দণ্ডিত কয়েদিরা রাস্তা, দালান-নির্মাণ করত। সেন্ট থমাস চার্চ তারাই নির্মাণ করেন। এমনকি ঢাকা কলেজও তারা নির্মাণ করে।[৮৪] ব্রিটিশ আমলেও আবার এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৮৬৯ সালে ঢাকার সহকারী সার্জন কাটক্লিফ পৌরসভার চেয়ারম্যানকে লিখেছিলেন দরকার হলে সরকারের অনুমতি নিয়ে ঢাকা জেলের কয়েদিদের বিনা পারিশ্রমিকে ঢাকা শহরের উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করা উচিত।[৮৫] ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকে এখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, পেশা ও শ্রেণির মানুষের বসবাস। ১৮৩৮

---

[৭৯]. Reginald Hever, 1826, *A Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India*, From Calcutta to Bombay, 1824-1825, London; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৩

[৮০]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৩

[৮১]. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ২০০১, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪

[৮২]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৬-৭

[৮৩]. *ঐ*, পৃ. ৮

[৮৪]. নির্ম্মল গুপ্ত, শ্রাবণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, *ঢাকার কথা*, কলকাতা, পৃ. ৫৪; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১১৩

[৮৫]. *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal*, Judicial Department, September, 1869; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১১৩

*Dhaka University Institutional Repository*

সালের দিকে ঢাকায় জমিদার, তালুকদার, ব্যবসায়ী, দোকানী, মহাজন, কারিগর, ডাক্তার, আইনজীবী, দিনমজুর, ভিক্ষুকসহ ১৫০ ধরনের পেশাজীবী ছিল।[৮৬] প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অভিবাসনের ফলে অনেক মানুষ আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ঢাকায় আসে। ইংরেজ শাসনামলের শুরুতে ১৭৬৯-৭০ এর দুর্ভিক্ষের সময় পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন জেলা থেকে কুট্টিরা শ্রমিক হিসাবে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করে।[৮৭] ঢাকা শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়, বিশেষ করে ঢাকার বর্ধিত আমদানি ও রপ্তানিকৃত বাণিজ্যসামগ্রী রেলগাড়ি, স্টিমার ও নৌকা থেকে ওঠা-নামা করার জন্য। একই সাথে ঢাকায় বেশ কয়েকটি পাটের গাইট বাঁধাই কল স্থাপিত হওয়ার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও বেড়ে যায়। আর এসব শ্রমিকের অধিকাংশই আসত ঢাকার সনাতনী কারিগর পরিবার থেকে কেননা তাদের তৈরি হস্তশিল্প বিলেত থেকে আমদানি করা মেশিনে তৈরি সস্তা সামগ্রীর বন্যায় বাজার হারাচ্ছিল।[৮৮] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঢাকায় অনেক বহিরাগত শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটে। এ ক্রমবর্ধমান শ্রমিকদের মধ্যে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে আগত হিন্দুস্তানিদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। শারীরিক শক্তি, সাহস ও বীরত্বের জন্য উত্তর ভারতীয় ঐ সবলোকদের শ্রমিক ও পাহারাদার নিয়োগ করা হত।[৮৯] ১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলার অন্যান্য জেলার এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মোট ২৫,৬৩৯ জন লোক তখন ঢাকায় বাস করত। এর মধ্যে ১০,৪৪৮ জন আসে আশেপাশের জেলাগুলি থেকে; ১,৬৯০ জন বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে; ৭,০১০ জন বিহার, ১০৭ জন উড়িষ্যা, ২৫ জন ছোট নাগপুর এবং অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ থেকে ৬,৩৫৯ জন।[৯০] ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে তামিলদেরকে শ্রীলংকাতে চা শ্রমিক হিসাবে নিয়ে যায়। তদ্রূপ ব্রিটিশরা অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর-প্রদেশ, পাটনা, কানপুর থেকে লোক নিয়ে এসে ঢাকা শহরের সৌন্দর্যবর্ধন, পারিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত করত। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশরা ঢাকা পৌরসভার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উচ্চবর্গ বা অভিজাতদের সেবাদান, নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও বাসযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিম্নবর্গের নানা শ্রেণির লোক (যেমন- মেথর, পরিচ্ছন্নকর্মী, ঝাড়ুদার, ডোম প্রভৃতি) নিয়ে আসে। ১৮৪৬ সালে 'ঢাকা কমিটি'র অধীনে ছিল ১৮৯ জন ঝাড়ুদার। প্রতিমাসে তাদের বেতন ছিল তিন রূপি।[৯১]

---

৮৬. আবদাল আহমেদ, *ইতিহাসের ঢাকা*, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২০

৮৭. *ঐ*, পৃ. ২০

৮৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৪

৮৯. *Dacca District Census Report, 1871*, 3; উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৫

৯০. *Census of 1891, Provincial Tables*; উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৫

৯১. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৮, ১৮

*Dhaka University Institutional Repository*

গ.

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তাদের *'আর্থ-সামাজিক অবস্থা'*। আলোচিত জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে ছিল। জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা পৌর কমিটি যখন শহর উন্নয়নের কথা ভেবেছে তখন প্রায় ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী শ্রেণির কথা ভেবেছে। অধস্তন শ্রেণির কথা নয়। ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ বুড়িগঙ্গার তীর দখল করেছিল শহরের অভিজাতরা। আর ঘিঞ্জি, স্যাঁতস্যাঁতে ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলের অধিবাসী ছিল নিম্নবর্গ শ্রেণি। উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় কিছু আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠে। যেমনঃ গেণ্ডারিয়া, উয়ারি, স্বামীবাগ প্রভৃতি। নতুন মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা সেখানে নির্মাণ করেছিল তাদের বাসগৃহ আর নদীর তীর দখল করে "অভিজাত" ধনীরা। ঢাকার সাধারণ অধিবাসীদের বা নিম্নশ্রেণির মানুষদের দৈনিক আয় এবং পরিবার ভরণপোষণের জন্য ব্যয়িত অর্থের সাথে কোন সঙ্গতি ছিল না। এর সাথে যুক্ত হয় প্রাকৃতিক দৈবপণা ও ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের মাত্রারিক্ত কর আরোপ। তৃতীয় অধ্যায়ে এসব বিষয়গুলি কিভাবে তাদের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করেছে সে সর্ম্পকে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

ঘ.

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের *রাজনৈতিক চৈতন্য*। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। এসব লেখার প্রায় সবটুকুই 'এলিট' কিংবা 'মধ্যবিত্তে'র আন্দোলন হিসাবে যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।[৯২] উদাহরণস্বরূপ, রণজিৎ গুহ ১৮৬০ সালে বাংলায় নীলকর, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে প্রজাদের আক্রমণকে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে প্রজা-বিদ্রোহের একটি বাস্তব ঘটনা বলে অভিহিত করেন।[৯৩] আবার উনিশ শতকে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। যেমন- ১৮৬০ এর বসাক-শাঁখারি দাঙ্গা, ১৮৬৯ এ শিয়া-সুন্নী দাঙ্গা ছাড়া ইংরেজ পূর্ব আমলে ঢাকায় তেমন দাঙ্গা হয়নি। নিম্নবর্গের নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'ভারত সভা'। পরে এর অনুকরণে বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের সভার উৎপত্তি হয়। পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও বরিশালে এ ধরনের সভার নাম দেয়া হয় "জনসাধারণ সভা"।[৯৪] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলন, ইলবার্ট বিল (১৮৮৩), সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯০)

---

[৯২]. Tarasankar Banerjee, *Early Nationalism in Bengal: Its Concept and Content the Quarterly Review of Historical Studies*, XXI:4, 1981-82, p. 13; উদ্ধৃত, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ১৯৯৩, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, তৃতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৭১২

[৯৩]. Ranajit Guha, *Neel-Darpan: The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror*, The Journal of the Peasant Studies, 2:1, 1974, p. 41; উদ্ধৃত, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), ১৯৯৩, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১২

[৯৪]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১২০

*Dhaka University Institutional Repository*

ও বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সরকার ১৮৮৪ সালের দিকে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করে। কিন্তু এ নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা কতটুকু ছিল? এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের ফলে ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজাধানীর মর্যাদা অর্জন করলে ঢাকা পুনরায় আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উভয় বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধি মত গ্রহণ করে। এ সময় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রমুখের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন ও অন্যান্য সংগঠন ভীতি সৃষ্টি, ডাকাতি এবং ইংরেজ হত্যার মাধ্যমে ঢাকা গোয়ালন্দ কাঁপিয়ে তোলে।[১৫] তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গেণ্ডারিয়া, ফরাশগঞ্জের ২০০০ হিন্দু-মুসলমান প্রজা চান্দিনা প্রজাস্বত্ব আন্দোলনের সূচনা করে। উপরোক্ত ঘটনা ও নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া আলোচ্য অধ্যায়ের বিবরবস্তু।

## ঝ.১. ব্যবহৃত আকার

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আকর বা গবেষণা পদ্ধতি প্রচলিত ইতিহাস চর্চা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পিরামিড আকৃতির সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্গের অবস্থান থাকে পিরামিডের তলায়। তাই নিম্নবর্গের ইতিহাসকে 'তলা থেকে দেখা ইতিহাস' (History from below) বলেও অভিহিত করা হয়। সমাজে আমরা যাদের জনগণ, ছোট লোক বা নিম্নবর্গ বলি তাদের কিন্তু কর্মকাণ্ডের দলিল রেখে যায় না, তাদের কীর্তির বেশির ভাগ ধরা থাকে স্মৃতিতে। সুতরাং জন-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'সাক্ষাৎকার' বা 'ওরাল হিস্ট্রি' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু অভিসন্দর্ভের সময়কালের সমসাময়িক জীবিত লোক পাওয়া অবান্তর। রণজিৎ গুহ তাঁর A Prose of Counter Insurgency লেখায় দেখিয়েছেন উচ্চবর্গের দলিলের ভিতরেই কীভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাসের মসলা লুকিয়ে থাকে। অথার্ৎ উচ্চবর্গের সদস্যরা ক্ষমতার বিস্তার আর রক্ষার স্বার্থেই নিম্নবর্গকে তাদের দলিলে জায়গা করে দেয়।[১৬] নির্দিষ্টভাবে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের সঠিক পরিসংখ্যান, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার উপাত্তের অপ্রতুলতা রয়েছে। তাই ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার জন্য ঔপনিবেশিক আমলে রচিত বাংলা, পূর্ববাংলা, ঢাকা জেলা এবং ঢাকা বিভাগের উপাত্তের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। তাছাড়া ঔপনিবেশিক আমলে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় প্রধানত ত্রিবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, ঔপনিবেশিক সরকারের আমলারা ব্রিটিশ প্রশাসনের স্বার্থে রিপোর্ট ও গ্রন্থ রচনা করতেন। এ সব রচনায় নিম্নবর্গের তথ্য, উপাত্ত খুবই সীমিত। সরকারি রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ ১. নিম্নশ্রেণির মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ- পেশা, বর্ণ, বেতনভাতাদি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ, অলংকার, গৃহসরঞ্জাম প্রভৃতি

---

[১৫]. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২১

[১৬]. আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল (১৯৪৭-২০০০)*, পৃ. ৯৭

*Dhaka University Institutional Repository*

বিষয়। ২. রিপোর্ট বা প্রতিবেদনে ঔপনিবেশিক কর্মকর্তারা নিম্নশ্রেণির মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান ক্রমশ উন্নতির কথা তুলে ধরেন। যদি কখনো কোনো ঔপনিবেশিক নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা এর বৈপীরত্য তথ্য উপস্থাপন করেন তাহলে তা সরকারের নিকট জমা দেয়ার পূর্বে পরিবর্তন করে সরকারি মনগড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করতেন। এই 'উন্নতির তত্ত্ব' সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগ লুকানোর সরকারি একটি নীতি। ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনকে বৈধতাদানেরও একটি উপায়। ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর রংপুর জেলার কালেক্টর E.G. Glazier এর রিপোর্ট থেকে সরকারের তথ্য লুকানোর কিছুটা সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "During the late season and scarcity metal utensils and silver ornaments were brought in large numbers for sale in markets as the last resource of the people before parting with their wives or their cattle"[৯৭]। দ্বিতীয়ত- উনিশ শতকের নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হল উৎস বা উপাত্তের স্বল্পতা বা অপর্যপ্ততা। যেসব তথ্য বা উপাত্ত পাওয়া যায় তার মানও মাঝে মাঝে খুবই নিম্ন পর্যায়ের।[৯৮] ফলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় না। তৃতীয়ত- ভারতীয় ও বিদেশি জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের লেখনীতে উচ্চবর্গের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়। এসব লেখায় উচ্চবর্গের প্রয়োজনের স্বার্থে নিম্নবর্গের কথা এসেছে কদাচিৎ। সুতরাং এক বিশাল প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে গবেষণার কাজটি পরিচালিত করা হয়। অভিসন্দর্ভটির গবেষণার কাজে দু'ধরনের আকর ব্যবহার করা হয়েছে- প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস। এছাড়া সমসাময়িক কালে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ। প্রাথমিক আকর- এর মধ্যে রয়েছে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সরকারি বিভিন্ন নথিপত্র, রিপোর্ট ও সংবাদপত্র। দ্বৈতয়িক উৎস হিসাবে সমসাময়িক গ্রন্থ ও বর্তমান সময়ে প্রকাশিত আলোচিত গ্রন্থসমূহ। জেমস্ ওয়াইজ, জেমস্ টেলর, আবদুল করিম, শরীফ উদ্দিন আহমেদ ও মুনতাসীর মামুন-এর রচিত গ্রন্থসমূহ অভিসন্দর্ভে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[৯৭]. E.G. Glazier, Further notes on the Rungpore Records, Calcutta, Bengal Sectetariat Press, 1876, p. 48 cit., by Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman, *ibid*, p. 17, 43

[৯৮]. Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman, *ibid*, p. 8

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

## নিম্নবর্গের সংজ্ঞা এবং ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচয়

ইতিহাস হলো মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড। প্রশ্ন হলো- মানুষের সকল অতীত কর্মকাণ্ড কি ইতিহাসে স্থান পায়? কোনো ঘটনা ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। অথার্ৎ একজন ঐতিহাসিক নির্ধারণ করে দেন কোনটি কোনটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উনিশ শতকের জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬) বলেন, history is defined the moment it is written. ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই.এইচ. কার বলেন, ইতিহাস হলো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বিরামহীন সংলাপ। ঐতিহাসিকদের এ ধরনের সংলাপও নির্দিষ্ট করে দেয় ইতিহাসের সীমানা। সুতরাং অতীত কর্মকাণ্ডের অনেক বিষয় ইতিহাসের আলোচনার বাইরে থেকে যায়। তাই প্রচলিত ও একমুখী ইতিহাস-চর্চার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুর বাইরে এসে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ শতকের ষাট/সত্তর দশকে ইউরোপে এক শ্রেণির ইতিহাসবিদ সমাজের মূলস্রোত থেকে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এবং একই শতকের আশির দশকে ভারতবর্ষে রণজিৎ গুহ প্রমুখ ইতিহাসবিদ ইতিহাস-চর্চার নতুন যে ধারা বা দিগন্ত উন্মোচন করেন তা-ই হলো- নিম্নবর্গের ইতিহাস। পূর্বে পণ্ডিতদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল- সমাজ, রাষ্ট্রযন্ত্র ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের সংঘটিত কর্মকাণ্ডই হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কিন্তু এসকল উচ্চবর্গের পাশাপাশি স্বতন্ত্র্য চৈতন্যের অধিকারী নিম্নবর্গও যে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হতে পারে এ ধারণাটি তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি। বিষয়টি যুদ্ধ, বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে বিজয়ীগোষ্ঠীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি বিজিতগোষ্ঠীর অবদান উল্লেখ করার মত। ই.এইচ. কার বলেন, "ঐতিহাসিক অবশ্যই বিরোধীপক্ষকে খাটো করে দেখবেন না। যে জয় অর্জিত হয়েছে অতি অল্পের জন্যে, তাকে তিনি নিশ্চিয়ই অনায়াস সাফল্য বলবেন না। যাঁরা বিজিত নন, চূড়ান্ত ফলের ক্ষেত্রে কখনও তাঁদের থাকে বিজয়ীদের মতোই বড় অবদান। মোটের ওপর, ঐতিহাসিকরা তাঁদের নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন যাঁরা, বিজয়ী বা বিজিত যাই হোন না কেন, কিছু একটা অর্জন করেছেন।"[১] নিম্নবর্গের ইতিহাস নির্মাণ প্রক্রিয়া এবং তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা বা বির্তক অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু নয়। নিম্নবর্গের সাধারণ বা সার্বজনীন সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা ঢাকা

---

১. "The historian must not underestimate the opposition; he must not represent the victory as a walk-over if it was touch-and-go. Sometimes those who were defeated have made as great a contribution to the ultimate result as the victors. The historian is concerned with those who, whether victorious or defeated, achieved something." Edward Hallett Carr, 1961, *What is History?*, Vintage Books, New York, p. 168

*Dhaka University Institutional Repository*

শহরের নিম্নবর্গের পরিচয় প্রদান আলোচ্য অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাসত্ত্বেও, আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক-বিতর্ক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

## নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইতিহাস চর্চা এক নতুন বাঁক নেয়। অথার্ৎ ইতিহাস 'Politics and production of identity'-তে জড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে উঠতি দেশিয় ক্ষমতাধরদের নির্ভরযোগ্য মিত্র হয় ইতিহাস। যুদ্ধোত্তর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে সৃষ্টি হয় জাতিরাষ্ট্রের। বিশ শতকের ষাটের দশকে এসে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই জাতীয় ইতিহাস যেসব গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে লেখা হচ্ছিল সেইসব অবহেলিত গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়। এ তালিকায় প্রাক্তন ক্রীতদাস, শ্রমিক শ্রেণি, দাগী আসামী, নারী, শিশু, বৃদ্ধ প্রমুখ স্থান পেতে থাকে। সত্তর ও আশির দশকে উল্লেখিত তালিকাটি আরো একটু বড় হয়। অথার্ৎ এবার ছোটখাটো জাতিসত্তা, নারী এবং পুরুষ সমকামীরাও ইতিহাসে স্থান পেতে শুরু করে। এদের ইতিহাস 'Minority History' নামে পরিচিত হয়। অথার্ৎ গণতন্ত্রমনা ঐতিহাসিকরা জাতির ইতিহাসের মূলধারা থেকে বাদ যাওয়া এইসব জনগোষ্ঠীকে ইতিহাসের ধারায় ফিরিয়ে আনতে শুরু করেন। যে Minority-র কথা উল্লেখ করা হল, তালিকাটা লক্ষ করলে বোঝা যাবে তারা শুধু সংখ্যায় নয় গুরুত্বেও Minority।[২]

বিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস কিংবা History from below (তল থেকে দেখা ইতিহাস) লেখার প্রচলন হয়। ক্রিস্টোফার হিল, এডোয়ার্ড টমসন, এরিক হব্‌সবম প্রমুখ ইংরেজ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধারা অনুসরণ করে অনেকেই তখন ইউরোপের পুঁজিবাদ আর যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতির মুখে চাপা পড়ে যাওয়া বিস্মৃত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও তাদের ভিন্নতর জীবন যাত্রার কথা লিপিবদ্ধ করেন। এই 'তল থেকে দেখা ইতিহাস' প্রধানত ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা, মতাদর্শ স্মৃতি খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে যেসব ঘটনা বা আন্দোলন ছিল নিতান্তই আঞ্চলিক এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এসব ঘটনার পৃথক পৃথক কাহিনী বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলধারার বর্ণনাটিকে অনেক বেশি জটিল ও বর্ণাঢ্য করে তোলে এই নতুন র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস।[৩]

---

[২]. আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল (১৯৪৭-২০০৯)*, পৃ. ৯৫

[৩]. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতমভদ্র (সম্পাদিত), ১৯৯৮, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স পাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৫

*Dhaka University Institutional Repository*

'*সাবলটার্ন স্টাডিজ*' এর লেখকরা ইউরোপের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাসের নিকট ঋণী। কেননা, তাঁরা র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাসবিদদের থেকে অনেক কিছু ধার নিয়েছেন। ১৯৭০-এর দশকে ভারতের মার্কসবাদী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ ঘটে, '*সাবলটার্ন স্টাডিজ*' এর শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কে। তখন দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বির্তক জমে ওঠে। একটিতে অংশ নেন প্রধানত অর্থনীতিবিদরা, যাঁদের আলোচ্য ছিল ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনরীতির উদ্ভব। অর্থনীতিবিদদের দুটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষের বক্তব্য হলো- ঔপনিবেশিক আমলের শেষপর্ব থেকেই ভারতের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। অন্যপক্ষের কর্তাব্যক্তিরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, কোনো কোনো এলাকায় সীমিত কিছু পরিবর্তন সাধিত হলেও ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধা-সামান্ততান্ত্রিক কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা তখনো অটুট রয়েছে।[৪]

অন্য বিতর্কটি হয় প্রধানত ঐতিহাসিকদের মধ্যে। তাঁদের আলোচ্য ছিল উনিশ শতকের বাংলায় 'তথাকথিত' নবজাগরণ। সত্তর দশকে অশোক সেন, রণজিৎ গুহ, সুমিত সরকারি প্রমুখ ঐতিহাসিক প্রশ্ন তোলেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগর এর মত মনীষীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রগতিশীল কোন অর্থে? তাঁদের সংস্কার চিন্তা তো ঔপনিবেশিক অর্থনীতি-রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করেনি। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীলতার ওপর আস্থা রেখেই তাঁদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার শুরু। আর সেই শাসন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার সীমা।[৫]

ইউরোপে র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষে অর্থনীতিবিদ এবং ইতিহাসবিদদের মধ্যে উক্ত অসম্পূর্ণ বিতর্কের রেষ ধরেই ১৯৮২ সালে রণজিৎ গুহ '*সাবলটার্ন স্টাডিজ*'এর প্রথম খণ্ড নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার 'ম্যানিফেস্টো প্রকাশ' করেন।

'*সাবলটার্ন স্টাডিজ*' নামক প্রবন্ধসংকলনগুলিতে এবং জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের লেখায় নিম্নবর্গের ধারণাটি আলোচিত হয়েছে। গ্রামসি তাঁর 'কারাগারের নোটবই'তে মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে যে ইঙ্গিতগুলি ব্যবহার করেন, তা অনুসরণ করেই 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। ভরতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গের অবস্থানকে সুদৃঢ়ভাবে

---

৪. ঐ, পৃ. ১০
৫. ঐ, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত করার স্থপতি রণজিৎ গুহ। সাবলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডের শুরুতে রণজিৎ গুহ রচিত একটি প্রবন্ধের প্রথম লাইনে বলা হয়- ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। উভয়ই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে উদ্ভব। উপনিবেশবাদী এবং নয়া-উপনিবেশবাদী ইতিহাসতত্ত্ব হলো- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক, প্রশাসক, নীতি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি। ভারতীয় উচ্চবর্গীয় ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড, আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান।[৬] নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য হলো- এই দুই ধরনের উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরোধিতা করা। এ সময় এক দিকে কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতা দখলের কৌশলমাত্র। চিরাচরিত জাতি, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বন্ধনকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এর তুমুল প্রতিবাদ করে বলেন, জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা, জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা। রণজিৎ গুহ বলেন, এই দুটি ইতিহাস মূলত উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হল উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল। এ দুটি ইতিহাসের কোনটাতেই জনগণের নিজস্ব রাজনীতির কোন স্থান নেই। আর সাম্রাজ্যবাদী এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতার পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রথম কর্মসূচি নির্দিষ্ট হয়।[৭]

## নিম্নবর্গের সংজ্ঞা

ল্যাটিন শব্দ Subalternus থেকে Subaltern শব্দটির উৎপত্তি। ল্যাটিন শব্দ 'sub' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'next below' এবং 'alternus' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'every other'। *Concise Oxford English Dictionary*-তে Subaltern শব্দটির অর্থ 'Of lower status'।[৮] অর্থাৎ, অধস্তন শ্রেণিকে বোঝায়। *Chamber's Twentieth Century*-তে বলা হয়- 'a specific class as included under a general one'।[৯] অর্থাৎ, প্রচলিত বা বিদ্যমান গোষ্ঠীর অধীনে একটি বিশেষ শ্রেণি। এখানে প্রচলিত বা বিদ্যমান গোষ্ঠী বলতে উচ্চবর্গকে ধরা যেতে পারে। যার অধীনে রয়েছে তারা একটি বিশেষ শ্রেণি বা

---

৬. Ranajit Guha, *On some Aspects of the Historiography of Colonial India*, Ranjit Guha (ed.), 1982, *Subaltern Studies*, Vol. 1, Oxford University Press, Delhi, p. 1

৭. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ১০

৮. *Concise Oxford English Dictionary*, P. 1434

৯. Rev. Thomas Davidson, 1901, *Chamber's Twentieth Century Dictonary*, p. 962

**Dhaka University Institutional Repository**

নিম্নবর্গ। *Webster's Dictionary*-তে বলা হয়- 'Holding of one who is himself a vassal'।[১০] অর্থাৎ, যিনি উপরওয়ালার প্রতি বশ্যতা স্বীকারকারী, অনুগত এবং অধীন প্রজা বা দাস।

ইতালীর মার্ক্সবাদী অ্যান্তোনিও গ্রামসি (১৮১৮-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোটবই'তে সর্বপ্রথম 'Subaltern' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইংরেজি শব্দ Subaltern এর আভিধানিক অর্থ হলো- অধস্তন ব্যক্তি। কিন্তু ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং আলাদা। সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে Subaltern ধারণাটিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়। রণজিৎ গুহ[১১] শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করেন নিম্নবর্গ[১২]। নিম্নবর্গ বা নিম্নবর্ণ একই অর্থ বহন করে না। কিন্তু অনেক পণ্ডিত নিম্নবর্গ বলতে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণ প্রথাকে বুঝিয়ে থাকেন। সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে 'বর্ণ' ও 'বর্গ' শব্দ দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাই নিম্নবর্গকে সরাসরি নিম্নবর্ণ বলে সংজ্ঞায়িত করা হলে তা যথার্থ হবে না।[১৩] যদিও হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় বিশুদ্ধতা ও পেশার ভিত্তিতে উচ্চবর্ণের বাইরে যেসকল নিম্নবর্ণের অবস্থান তারা সকলই নিম্নবর্গের আওতাধীন। যেসকল বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চা ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণে নিয়োজিত, তাঁরা হলেন- রণজিৎ গুহ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক ও সুমিত সরকারি প্রমুখ।

রণজিৎ গুহ ভারতীয় লোকজনদেরকে 'Elite', 'People', 'subaltern' প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভাজন করেছেন।[১৪] 'Elite' বলতে তিনি দেশিয় ও বিদেশি আধিপত্যগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা ব্রিটিশ উপনিবেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পুঁজিপতি, বণিক, অর্থ লগ্নীকারী, নীলকর, ভূ-স্বামী ও মিশনারী। এরা আধিপত্যকারী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।[১৫] ঔপনিবেশিক ভারতে যারা উক্ত আধিপত্য শ্রেণি/উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে ('People', 'Subaltern') তারাই নিম্নবর্গ। এদের মধ্যে রয়েছে শহরের শ্রমিক, গরিব, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি, মাঝারি-কৃষক ও ধনী কৃষক। আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে অনেক সময় এসকল ধনী ও মাঝারি কৃষক 'Elite' বা উচ্চবর্গের

---

[১০]. *Webster's New International Dictionary*, 1950, Second edition, G.&C. Meraiam Co., p. 2507

[১১]. রণজিৎ গুহ-এর জীবনী সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, Partha Chatterjee (ed), 2009, *The Small Voice of History; Ranajit Guha*, Editor's Introduction, Permanent Black, New Delhi, PP. 1-17

[১২]. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ৫

[১৩]. বাংলা বৈয়াকরণবিদরা 'গণ', 'বর্গ' শব্দদুটি শুধুমাত্র ভদ্রশ্রেণির মানুষদের বহুবচন বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেন। ইতরবাচক প্রাণির বহুবচন করার ক্ষেত্রে উক্ত শব্দদুটি প্রচলিত নয়। কিন্তু রণজিৎ গুহ 'সাবলটার্ন' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণির সামগ্রিকতা বোঝাতে সর্বপ্রথম 'নিম্নবর্গ' (নিম্ন+বর্গ) শব্দটি ব্যবহার করেন।

[১৪]. Ranajit Guha, *On some Aspects of the Historiography of Colonial India*, p. 8

[১৫]. Ranajit Guha, *On some Aspects of the Historiography of Colonial India*, p. 8

*Dhaka University Institutional Repository*

ভূমিকায় অবতীর্ন হন।[১৬] অধস্তন শ্রেণি/নিম্নবর্গ বলতে সেই শ্রেণিকে বোঝাবো যারা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত নন, ক্ষমতার বিন্যাসঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক/ প্রশাসনিক মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে যারা যুক্ত নন কিন্তু প্রবল শ্রেণির রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত প্রভাবের মধ্যে যারা অন্তরিত।

সাধারণভাবে বলা যায়, শারীরিক বা কায়িক শ্রমে নিযুক্ত, আর্থ-সামাজিক মর্যাদায় অনগ্রসর, ক্ষমতাহীন, অবহেলিত, বঞ্চিত, শোষিত এবং আর্থিক বিচারে নিম্নস্তরের কৃষক, শ্রমিক ও অন্ত্যজ প্রান্তিকই নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গের আওতাধীন ব্যক্তিরা দরিদ্র, অসহায়, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং রাজনৈতিকভাবে অসচেতন থাকে। তাছাড়া উচ্চবর্গের কাছে যারা অপ্রধান জনগোষ্ঠী, যাদের জীবনের বাস্তবতা, আদিম জৈব প্রবৃত্তি, নর-নারী সম্পর্কে প্রচলিত নীতিশাসন-বহির্ভূত আচরণ, যারা উচ্চবর্গ কর্তৃক শোষণ-শাসন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদী প্রতিরোধী এবং জীবনাচার, সংস্কার ও জীবনযাপনের রীতি প্রদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে যারা আলাদা স্বতন্ত্র্যের অধিকারী তারাই নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সাবলটার্ন (ইতালীয়তে সুবলতের্নো) শব্দটি গ্রামসি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়াট' এর প্রতিশব্দ। এ বিন্যাসে শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে থাকে 'হেজেমনিক' শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিমালিক, 'বুর্জোয়াসি'। অন্যদিকে গ্রামসি যেকোন শ্রেণিবিভক্ত সমাজের তলার বা নিচু শ্রেণিকে 'সাবলটার্ন' শ্রেণি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসকে গ্রামসি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি', অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন শ্রেণি'। অথার্ৎ উভয়ের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক।[১৭] মানুষের এ সম্পর্ক নির্ধারিত হয় ক্ষমতার সম্পর্ক দ্বারা। Herodotus থেকে শুরু করে *The End of History and the Last Man*-এর লেখক ফুকুয়ামার সময় পর্যন্ত মানব সমাজ প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদিও এর চেহারা ও বৈশিষ্ট্য নানা রকম। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ইতিহাস জাতি রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী রচিত হতে শুরু করে। তাই ইতিহাস-চর্চা অনেকখানি আটকা পড়েছে ঐসব জাতি রাষ্ট্রের স্রষ্টা শ্রেণিটির জীবনী রচনার মধ্যে। এই শ্রেণিটি উপনিবেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্তাও বটে।[১৮] সমাজ বিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটি

---

[১৬]. *Ibid* p. 8; নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে দেখুন, রণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', গৌতমভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, পৃ. ২২-৪৬

[১৭]. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ৩

[১৮]. আহমেদ কামাল, *কালের কল্লোল*, পৃ. ৯৪

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। সুতরাং উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন-রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।[১৯]

উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে নিম্নবর্গ হতে পারে কৃষক বা কৃষি শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কাঠমিস্ত্রি, চামার, রাজমিস্ত্রি, তাঁতি, মৃৎশিল্পী বা কুমার এবং মাঝি প্রমুখ। ধর্ম ও বর্ণের দিকে দিয়ে হরিজন, নমঃশূদ্র নিম্নবর্গের আন্ততাধীন। এমন কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদেরকে নিম্নবর্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠী দিন আনে দিন খায়। নিম্নবর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- তারা রাজনৈতিকভাবে অসচেতন, আর্থিকভাবে দীন এবং সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ।[২০]

১৯৮২ সালে *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ-ইতিহাস চর্চার গণ্ডি ছাড়িয়ে *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* নিয়ে আলোচনা এখন বিশ্বের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া যায়। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নিজস্ব 'সাবলটার্ন গ্রুপ' উদ্ভাসিত করেছেন। বর্তমানে *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে খুবই আলোচিত এবং সমালোচিত বিষয়।

## *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা নিয়ে বিতর্ক

রণজিৎ গুহ *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'*এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থটিতে প্রবন্ধসংকলনগুলির লিখন পদ্ধতি গ্রামসির ছয় দফা বৈশিষ্ট্যের সাথে কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।[২১] গ্রামসি তাঁর *'Notes on Italian History'* প্রবন্ধে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'-এর জন্য ছয়টি 'লিখনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যে'র কথা উল্লেখ করেন। যদিও তা অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য কিন্তু চেষ্টা করা যেতে পারে।[২২]

---

[১৯]. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ৭

[২০]. Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahamand (eds.), 2009, *Material Conditions of the Subalterns Nineteenth Century East Bengal*, International Centre for Bengal Studies, Dhaka, P.7

[২১]. Ranajit Guha (ed.), 1982, *Subaltern Studies*, Vol. 1, Oxford University Press, Delhi, Preface.

[২২]. Gramsci's Six-point 'Methodological Criteria' for the 'history of the subaltern classes; as a model unattainable but worth striving for :

1. the objective fromation of the subaltern social groups, by the developments and transformations occuring in the sphere of ecomomic production....

2. their active or passive affiliation to the dominant political formations, their attempts to influence the programmes of these formations in order to press claims of their own...

*Dhaka University Institutional Repository*

রণজিৎ গুহ'র *'Elementary aspects of Peasant Insurgency in Colonial India'* (1983) গ্রন্থে প্রধানত দুটি বিষয়- (১) ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং (২) কৃষক চৈতন্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশদ এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়। প্রথম পর্যায়ের *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিরূপ সমালোচনাই বেশি শোনা গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার প্রধান কেন্দ্রগুলির কর্তাব্যক্তিরা, ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকেরা, অনেকেই *'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* এর বিরোধিতায় মুখর ছিল।

*'সাবলটার্ন স্টাডিজ'* নিয়ে গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দু'ধরনের আপত্তি উঠেছিল। প্রথম আপত্তির বিষয় ছিল উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পৃথকীকরণ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্যের ওপর জোর দিতে নারাজ। তাছাড়া তিনি মনে করেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণতান্ত্রিক প্রভাবে দুটি ক্ষেত্র একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যায়। দ্বিতীয় আপত্তি হল নিম্নবর্গীয় চেতনা নিয়ে। প্রগতিশীল ইতিহাস চিন্তার প্রথম উপপাদ্য হল মানব চেতনার বিকাশ। অর্থাৎ মানব চেতনা সাধারণত অনুন্নত বা আদিম অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নত চেতনার দিকে অগ্রসর হয়। এ প্রগতির তত্ত্ব যেমন একটা গোটা সমাজ বা সভ্যতার বেলায় খাটে, তেমনি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাজনের ক্ষেত্রেও খাটে। অর্থাৎ শ্রেণি বিভক্ত সমাজে আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ক্ষমতা ভোগী শ্রেণির চেতনার স্তরও অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়। সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সেই শ্রেণি বা তার কোনো অংশ যদি অগ্রগামী ভূমিকা নেয়, তাহলে তার চেষ্টায় অন্যান্য শ্রেণির চেতনার মানও ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠতে পারে। তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্রের কথা তুলে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা কি চৈতন্যের স্তরভেদ, তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নত চেতনার অধিকারী অগ্রগামী শ্রেণির ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন?

---

3. the birth of new parties of the dominant groups, intended to conserve the assent of the subaltern groups and to maintain control over them;
4. the formations which the subaltern groups themselves produce, in order to press claims of a limited and partial character;
5. those new formations whcih assert the autonomy of the subaltern groups, but within the old framework;
6. those formations which assert the integral autonomy... etc. (Sumit Sarkar, 1997, *Writing Social History*, Oxford University press, New Delhi, p.89)

*Dhaka University Institutional Repository*

'*সাবলটার্ন স্টাডিজ*'-এর ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, শুধুমাত্র দেশিয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে নিম্নবর্গের দল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়ে। তাঁদের এ অভিযোগ যেমন সত্য নয়, তেমনি জাতীয়তাবাদী নেতাদের আদর্শ আর অনুপ্রেরণার স্পর্শ পেয়ে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা জেগে ওঠে, এ দাবিও সত্য নয়। উচ্চবর্গ পরিচালিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মঞ্চে নিম্নবর্গ প্রবেশ করে। আবার সরেও আসে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ছিল উচ্চবর্গের তুলনায় পৃথক। নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয় নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে ওঠে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। অর্থাৎ দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এ চেতনা গড়ে ওঠে।

আবার অনেকে জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার প্রস্তাবকে ঐক্যবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্রের জীবনবৃত্তান্তের পরিপন্থী বলে মনে করেন। আর প্রগতিবাদী বামপন্থী অবস্থান থেকেও নিম্নবর্গের চৈতন্যের নিজস্ব গড়ন আর তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্যমের ওপর জোর দেওয়া মানে অগ্রগামী বুর্জোয়া- বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এবং বৈপ্লবিক পার্টি সংগঠনের প্রগতিশীল ভূমিকা একরকম অস্বীকার করা।

নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র চৈতন্যের বিরোধিতার মতো নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। যেমন- নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের কাজ হল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-রচনার সমালোচনা বা বিরোধিতা করা। এক্ষেত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই বিরোধী ইতিহাস কখনোই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিকতা অর্জন করতে পারে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই অনিবার্যভাবে আংশিক, অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ। বলা বহুল্য, এরকম খণ্ডিত, অসংলগ্ন, ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করে যাওয়া সহজও নয়। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা যদি প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করে, তবে বিকল্প কোনো মতবাদকে উপস্থিত করতে না পারলেও, তেমন এক সামগ্রিক দিক নির্মাণ করার প্রচেষ্টাটুকু অন্তত তারা সমর্থন করবে, এমন আশা করা নিশ্চয় অস্বভাবিক নয়। কিন্তু প্রথম দিকে '*সাবলটার্ন স্টাডিজ*' এ প্রত্যাশা পূরণে ছিল অপারগ।[২৩]

ইউরোপীয় *র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস* এবং ভারতীয় *সাবলটার্ন স্টাডিজ* এর ঐতিহাসিকদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। লিবারেল জাতীয়তাবাদ এবং মার্কসবাদ- দু'ধরনের ইতিহাস রচনায়

---

২৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ১৪

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রতিষ্ঠিত ছক সম্বন্ধেই '*সাবলটার্ন স্টাডিজ*'-এর লেখকদের মনে সংশয় ছিল। কিন্তু র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস চর্চায় নেমে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁদের বর্ণনাকে কোনও নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে রাখতে চাননি। তাই 'তল থেকে দেখা ইতিহাস' হিসাবেও '*সাবলটার্ন স্টাডিজ*'-এর লেখা বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাড়াঁয় ইতিহাস চর্চার মহলে।[২৪]

'*সাবলটার্ন স্টাডিজ*'-এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক-এর দুটি প্রবন্ধে। ১৯৮৫ ও ১৯৮৮ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে তিনি প্রস্তাব করেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য' এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসাবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা।[২৫] স্মার্তব্য, তথ্য বা উপাত্ত ছাড়া ইতিহাস হয় না। আবার নিছক তথ্য আভিধানিক শব্দের মত। সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাস নিছক তথ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গলিত হয় না। এসব তথ্য থেকে ইতিহাস রচনার জন্য একজন ঐতিহাসিককে নিরপেক্ষ, নৈতিকবোধ সম্পন্ন, 'সবার ওপর নিম্নবর্গ সত্য' বিবর্জিত এবং মনো-বিশ্লেষক বা মনোবীক্ষণিক হতে হয়। কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিককে উক্ত জনগোষ্ঠীর পরিবেশ ও মনোজগতে প্রবেশ করতে হয়। সে জন্য নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে মনঃসমীক্ষণমূলক বা মনোবীক্ষণিক হতে হয়।[২৬] তাই ই. এইচ. কার বলেন, "...the historian's need of imaginative understanding for the minds of the people with whom he is dealing, for the thought behind their acts: I say "imagivative understanding," not "sympathy"..."[২৭]

## ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে করা যায় না। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কের দিক বিচার করে ঢাকা শহরের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পরিচিতি নিরূপণ করা দুরূহ। কেননা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় পুঁজিবাদের অসম্পূর্ণ বিকাশ

---

[২৪]. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ১১-১৪

[২৫]. Gayatri Chakravorty Spivak, *Subaltern Studies: Deconstructing Historography'* in Ranajit Guha (ed.), 1985, Subaltern Studies, Vol. IV, Oxford University Press, Delhi, pp. 330-63; '*Can the Subaltern speak*?' in Cary Nelson and Lawrence Grossberg (eds.), 1988, *Marxism and the Interpretation of Culture,* University of Ilinois Press, Urbana; উদ্ধৃত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, পৃ. ১৬-৭

[২৬]. Sigmund Freud (1856-1939) Psycho-history – এর প্রবর্তক। ১৯১০ সালে লিওনার্দো-দ্যা-ভিঞ্চির উপর রচিত গ্রন্থে ফ্রয়েড Psycho-history ব্যবহার করেন। Sigmund Freud এর বিখ্যাত গ্রন্থ "*Civilization and its Discontents (1929)*" Psycho-analysis তত্ত্বের উপর রচিত।

[২৭]. E. H. Carr, *What is History?*, *Ibid.* pp. 26-7

*Dhaka University Institutional Repository*

এবং সামান্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বিরাজ করছিল। অথার্ৎ প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আধা-সামান্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থাকে 'ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি/ব্যবস্থা' বলে অভিহিত করেছেন।[২৮] এ ব্যবস্থায় শ্রমিক বা কৃষক শ্রেণিকে সুস্পষ্টভাবে বিভাজন করা যায় না। আবার বর্ণ, সম্প্রদায় বা জাতি অনুযায়ী পেশাকে আলাদা করা যায় না। অনুরূপভাবে পেশা অনুযায়ীও বর্ণ, সম্প্রদায় বা জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পৃথক করা যায় না। কেননা, এক এক বর্ণের মানুষ নির্দিষ্ট কোন একক পেশার পরিবর্তে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। সম্ভবত তাই Henry Walters ১৮৩০ সালে তাঁর '*Census of the City of Dacca*' প্রবন্ধে 'পেশা ও বর্ণ' কে আলাদা ভাবে আলোচনা করেন নি। তিনি হিন্দুদের ১২২টি ও মুসলমানদের ৬১টি পেশা ও বর্ণের নাম উল্লেখ করেন। তিনি ক্ষত্রী, শুদ্র, ও কুণ্ডু বর্ণের মধ্যে একই পেশা হিসাবে 'কুলি'র কথা উল্লেখ করেন।[২৯] সুতরাং এ দুটি প্রতিবন্ধকতাকে সামনে রেখে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচয় দেয়া হবে।

আব্দুল করিম মুগল আমলে ঢাকার অধিবাসীদেরকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যেমনঃ ১. মুগল প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অফিসার ও তাঁদের পরিচালকগণ; ২. ভূ-স্বামী ও তাঁদের পরিচালকগণ অথার্ৎ যারা জমির আয়ের ওপর জীবন নির্বাহ করত; ৩. বণিক ও ব্যবসায়ীগণ এবং তাঁদের পরিচালকবৃন্দ; ৪. কারিগর, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক ও অন্যান্য পেশার লোক এবং ৫. শ্রমিক বা দিন মজুর শ্রেণি।[৩০] সুতরাং মুগল আমলে নিম্নবর্গ হলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কারিগর, শ্রমিক, দিন মজুর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশাজীবীরা।

ঢাকা শহরের ওপর নিম্নবর্গ এবং ক্ষুদ্র পেশাজীবী শ্রেণির একক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তাই ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের পরিচিতি সম্পর্কে জানার জন্য পূর্ববঙ্গ, বাংলা এবং ঢাকা জেলার সরকারি বিভিন্ন প্রতিবেদনের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হল- ঔপনিবেশিক শাসনামলে যেসব রিপোর্ট ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেসব দলিল-দস্তাবেজে অধস্তন শ্রেণিকে বোঝানোর জন্য সরাসরি 'Subaltern' বা 'নিম্নবর্গ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। ঐ সব প্রকাশনায় কখনো 'Lower Orders' কখনো 'Lower Classes' বলে উল্লেখ করা হয়। ক্রাইন Lower Orders বলতে দিনমজুর, শিল্পকারিগর, মিস্ত্রি, ভিক্ষুক প্রভৃতি পেশার লোকদের বুঝিয়েছেন।[৩১] পি নোলান Lower Classes বলতে কৃষক, কৃষি

---

২৮. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ. ৮৬-৮

২৯. Henry Walters, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches*, 1832, vol. 17, Cosmo Publications, New Delhi (rep. 1980) pp. 542-48

৩০. Abdul Karim, 1964, *Dacca The Mughal Capital*, Asiatic Press, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, p. 93

৩১. F.H.B, Skrine, *Memorandum on the Material Condition of the Lower Orders in Bengal during the Ten Years from 1881-82-1891-92*; Bengal Secretariat Press, Calcutta, cited by Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman (eds.), *Material Conditions of the Subalterns Nineteenth Century East Bengal*, P. 13

*Dhaka University Institutional Repository*

শ্রমিক, কারিগর শ্রেণি, কাঠমিস্ত্রি, কামার, স্বর্ণকার, মৃৎশিল্পী, জুতা প্রস্তুতকারী, দর্জি, কুলি, পণ্ডিত, আয়া, ভিক্ষুকসহ নিম্নশ্রেণির নানা পেশাজীবী মানুষদেরকে বুঝিয়েছেন।[৩২]

১৮৭২ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদনে বাংলার সমগ্র জনগোষ্ঠীকে প্রধানত ৭টি ক্যাটাগরিতে বিভাজন করা হয়। যেমনঃ ১. সেবাদানকারী (Service Holders) ২. বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ (Professional Persons) ৩. গৃহস্থলী-কর্মী (Domestic servants) ৪. কৃষিকাজ ও পশুপালনকারী (Persons engaged in agriculture and animals) ৫. ব্যবসায়ী ও বণিক (Persons engaged in commerce and trade) ৬. কারিগর ও বিক্রেতা (Artisans and shopkeepers) ৭. ভিক্ষুক ও শ্রমিক (Beggars and labourers)।[৩৩] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার ১৮৭২ সালের আদমশুমারির তথ্য ব্যবহার করে ঢাকায় পুরুষ ও নারীদেরকে পেশার ভিত্তিতে ৭টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। যেমনঃ প্রথম শ্রেণি- যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারি ও পৌরসভার অধীনে চাকুরি করে। এ শ্রেণিতে সর্বমোট ৩৮৫৯ জন। দ্বিতীয় শ্রেণি- যারা ধর্মীয় যাজক (Professor of religions), শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, আইনজীবী, চারুশিল্পী প্রভৃতি। মোট ১৫৮৮৪ জন। তৃতীয় শ্রেণি- যারা ব্যক্তিগত অফিস, বাসা-বাড়িতে ব্যাক্তিগতভাবে পরিসেবা দান করে। এদের মধ্যে রয়েছে রান্নাকারী, রান্না সহকারী, ঝাড়ুদার, মালি, দাড়োয়ান, ঘটক, পোশাক ধৌতকারী, নাপিত, গৃহস্থলীকর্মী প্রমুখ। মোট ৪১৮৩৯ জন। চতুর্থ শ্রেণি- যারা কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, নায়েব, দেওয়ান, সৌখিন শিকারি প্রমুখ মোট ২৯৬৮১৯ জন। পঞ্চম শ্রেণি- ব্যবসা ও বাণিজ্যের সাথে যারা সম্পৃক্ত। এ শ্রেণির মধ্যে আছে সরদার, আরৎদার, মহাজন, দালাল, বেপারি, পোদ্দার, মুহুরি, গাড়িচালক, মাঝি, পালকি বাহক প্রমুখ মোট ৬১০৬৬ জন। ষষ্ঠ শ্রেণি- যারা শিল্পী, উৎপাদক, প্রোকৌশলী, কারিগর, তাঁতি, স্বর্ণকার, কামার, জুতা তৈরিকারক প্রভৃতি মোট ৯১১৬২ জন। সপ্তম শ্রেণি- শ্রমিক, ভিক্ষুক, বেকার, কয়েদি, মানসিক রোগী প্রমুখ মোট ৯০৫৭৭৫ জন।[৩৪]

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ/অধস্তন শ্রেণির ওপর ১৯৭৮ সালে সফিউদ্দিন জোয়ারদার একটি প্রবন্ধে তিন শ্রেণির মানুষদেরকে 'শ্রমজীবী'র সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমনঃ ১. জমির পরিমাণ

---

[৩২]. P.Nolan, 1888, *Report on the Condition of the Lower Classes of Population in Bengal*, The Bengal secretariat press, Calcutta; cited by Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman (eds.), *Ibid.*, P. 13

[৩৩]. Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman (eds.), *Material Conditions of the Subalterns Nineteenth Century East Bengal*, P. 13-4

[৩৪]. W.W. Hunter, 1877, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, Trubner & Co., London, (reprinted in 1973), pp. 35-8

*Dhaka University Institutional Repository*

অল্প হওয়ায় যে সমস্ত লোক তাদের সংসার চালানোর জন্য কায়িক শ্রমে নিয়োজিত; ২. যাদের কোন জমিজমা নেই এবং দিন মজুরিই যাদের আয়ের একমাত্র উৎস; এবং ৩. কারিগর শ্রেণি।[৩৫]

অন্যদিকে বাংলার জনসাধারণের শ্রেনি-বিন্যাস প্রোথিত রয়েছে অতীতের ধর্মব্যবস্থা ও আর্থ-কাঠামোর ভিত্তিভূমিতে। ধর্মের গতি-প্রকৃতি এদেশের জীবনধারা ও উন্নয়নের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতকে প্রভাবিত করলেও অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক উপাদনগুলির প্রাসঙ্গিকতাও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পেশা বা বৃত্তি বর্ণ প্রথাকে স্থায়িত্ব প্রদান করেছে। বাংলার হিন্দুসমাজ বর্ণভেদ প্রথার (যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ এবং শূদ্র) ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছিল। আবার বিভিন্ন উপবর্ণের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশার মাধ্যমে অব্রাহ্মণ শ্রেণির মত বিভিন্ন মিশ্র শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। অব্রাহ্মণ উপ-শ্রেণিকে সাধারণত পৌরোহিত্যের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ঃ উচ্চ মিশ্র, মধ্যম মিশ্র এবং নিম্ন শ্রেণির মিশ্র। উচ্চ মিশ্র বা প্রথম শ্রেণিতে করণ বা কায়স্থ (লেখক), অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য (ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসক), এছাড়া তাঁতি, যোদ্ধা এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিশটি উপবর্ণ অন্তর্ভুক্ত। মধ্যম মিশ্র বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্বর্ণকার, ধীবর (জেলে) প্রমুখ বারোটি উপবর্ণ অন্তর্ভুক্ত। এবং সর্বশেষ নিম্ন মিশ্র শ্রেণিতে চণ্ডাল, চামার ও অন্যান্যদের মধ্যে নয়টি উপবর্ণ অন্তর্ভুক্ত। এরা ছিল অস্পৃশ্য শ্রেণি।

শ্রী কেদারনাথ মজুমদার বলেন, বাংলার হিন্দুদেরকে বিগত সেন্সাস রিপোর্টে ৭ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যেমনঃ ১. ব্রাহ্মণ; ২. ক্ষত্রিয় রাজপুত, বৈদ্য ও কায়স্থ; ৩. শূদ্র ও নবশাখা; ৪. চাষী, কৈবর্ত্য ও গোয়ালা; ৫. জল অনাচারণীয়; ৬. নীচ জাতি কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ করেনা; ৭. অতি নীচ। বারুই, কামার, কুমার, মালাকার, ময়রা (মোদক), নাপিত, সদ্‌গোপ, তাঁতি ও তিলি (তেলি) এই নয় ঘরই প্রকৃত নবশাখার অন্তর্গত। এ শ্রেণির মধ্যে সদরের তাঁতি সমাজ উন্নত।[৩৬]

ধোপা, ঝাল, মাল, কাপালি, চণ্ডাল, পাটনি, পোদ, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতিকে নিম্নশ্রেণি বা অতি নীচ বলা যেতে পারে। চণ্ডালেরা ১৮৯১ সালে নমশূদ্র আখ্যা লাভ করেছে। ১৯০১ সালে 'নম' পরিত্যাগ করে শূদ্র আখ্যার আবেদন করে কিন্তু তা রক্ষা করা হয়নি। চামার, ডোম, গার, হাড়ি, মালি, মুচি

---

[৩৫]. সফিউদ্দিন জোয়াদার, *'উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজশাহীতে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা'*, সমাজ নিরীক্ষণ, ১ নভেম্বর ১৯৭৮; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১০৭-৮; আরও দেখুন, Muntassir Mamoon & Mahbubar Rahman, *Material Conditions of the Subalterns Nineteenth Century East Bengal*, P. 14

[৩৬]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী, (সম্পাদিত), ২০০৩, *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণসহ ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫৮৬, ৫৮৮

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণিভুক্ত। কিচক জাতি ঢাকা ব্যতীত আর কোথাও নেই। এরা ঢাকার ঝাড়ুদারের কাজ করে থাকে।[৩৭]

১৮৬৮ সালে ঢাকার কালেক্টর ক্লে তাঁর *History and Statistic of the Dacca Division* গ্রন্থে হিন্দু বর্ণপ্রথাকে শুদ্ধতার ভিত্তিতে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভাজন করেন এবং তাঁদের পেশার বিবরণ দেন। যেমনঃ (i) Pure বা বিশুদ্ধ বর্ণ এবং (ii) Impure বা মিশ্র বর্ণ। Pure বর্ণগুলোর মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, কর্মকার, স্বর্ণকার, তাঁতি, কাঁসারি, কুমার, সদ্‌গোপ গোয়ালা, মালকার, নাপিত ও বামনস্।[৩৮] Impure বর্ণগুলি হচ্ছে- গণক, সাহা, কাপালি, পাতিল, পাতনি, কৈবর্ত্য, তামবলি, গন্ধবণিক, ধোপা, সূত্রধর/সূতার, ডোম, চামার, ভূঁইমালী, চণ্ডাল, যুগী, গারুড়ী ও বেদে।[৩৯]

অভিসন্দর্ভে হিন্দু ও মুসলিমদেরকে ধর্ম এবং বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজন করা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এ দু'ধর্মের নিম্নশ্রেণি ও বর্ণের মানুষই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে ওঠে নিম্নবর্গের পরিচয় পর্বে ঐসব শ্রেণি ও বর্ণের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের পেশার বিবরণ দেয়া হবে। জেমস টেলর এর '*Topography of Dacca*' এবং জেমস ওয়াইজ এর '*Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*' গ্রন্থসমূহ থেকে ঢাকা জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নশ্রেণির পেশা ও পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল।[৪০] মনে করা হয়, এসব নিম্নশ্রেণিভুক্ত পেশার মানুষ ঢাকা শহরেও বসবাস করত।

*ব্রাহ্মণ* (Brahmans): পুরোহিত, বেদ-পাঠক, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

*বৈদ্য* (Baidys): ব্রাহ্মণদের পরেই বৈদ্য শ্রেণির স্থান। তারা প্রধানত তালুকদার, দেওয়ান ও চিকিৎসাবিদ, সরকারি চাকুরিজীবী এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

---

৩৭. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী, (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯

৩৮. A.L. Clay, 1868, *Principal Heads of the History and Statistic of the Dacca Division*, Calcutta Central Press Company Limited, Calcutta, PP. 3-5

৩৯. *History and Statistic of the Dacca Division*, Ibid., PP. 5-7

৪০. W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, vol.-v, pp. 47-52; *History and Statistic of the Dacca Division*, pp.-1-10; James Taylor, *Topography of Dacca*, pp. 221-255; James Wise, 1883, '*Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*' vol. i, ii & iii. এই দুলর্ভ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন ফওজুল করিম যার সম্পাদনা করেন ড. মুনতাসীর মামুন। অনূদিত গ্রন্থটি আইসিবিএস থেকে ১৯৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। অভিসন্দর্ভে বাংলা অনূদিত গ্রন্থটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মূল গ্রন্থাকারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

*ক্ষত্রিয়* (Kshattriyas): যোদ্ধা ও বণিক।

*রাজপুত* (Rajput): সামরিক, পুলিশ, সংবাদবাহক ও দাড়োয়ান।

*ঘাটওয়াল* (Ghatwal): ঐ

*কায়স্থ* (Kayasth): অধিকাংশই এটর্নি, উকিল, লেখক, হিসাব রক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ এবং শহরের বিভিন্ন আদালতে জমিদারগণ কর্তৃক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। পল্লী অঞ্চলে ভট্টাচার্য (Bhatatures) বা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণির স্থানীয় লোকেরা স্থানীয় পরিবারগুলিতে পাচক, চাকর ইত্যাদি রূপে কাজকর্মে নিযুক্ত এবং অনেকে শহরে চাল, লবণ ও ঘি প্রভৃতি দ্রব্যের খুচরা বিক্রেতা হিসাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত।

*তাঁতি* (Tantis or weavers): যারা কাপড় বুনে, সূতা থেকে কাপড় তৈরি করে, তাঁত বুনে, তাঁতের কাজ করে এবং বয়ন দ্বারা কোনো কিছু তৈরি করে। এরা (তাঁতি) দু'সমাজে বিভক্ত- ঝাপানিয়া ও ছোটবাগিয়া। উভয় সমাজে খাওয়া, বসা ও সম্বন্ধ চলে না। এদের নাম ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে সবর্ত্র পরিচিত ছিল। ঢাকার তাঁতিগণ বসাক উপাধিতে পরিচিত। এরা নানা ব্যবসায় লিপ্ত এবং অনেকে সরকারি চাকুরি করত।

*শাঁখারি* (Sankharis): শাঁখারি বা শঙ্খের কাজে নিযুক্ত লোকেরা সম্পদ ও সংখ্যার দিকে তাঁতিদের পরেই তাদের স্থান। শঙ্খ বা শাঁখা হচ্ছে এক প্রকার জলজ প্রাণি। এককথায়, শামুকের কয়েকটি জাত হচ্ছে শঙ্খ। শঙ্খ বলতে যে শামুককে বোঝায়, তা পাওয়া যায় শ্রীলংকা ও মাদ্রাজের সমুদ্রতীরে। শঙ্খ দু'রকম- আস্ত শঙ্খ ও কাটা শঙ্খ বা শাঁখা। আস্ত শঙ্খ ব্যবহার করা হয় দুইভাবে- একটি বাদ্য শঙ্খ অন্যটি জলশঙ্খ হিসাবে। কাটা শঙ্খ দিয়ে শাঁখা, আংটি, চুনসহ নানা উপকরণ। ১৮৮৩ সালে শুধু ঢাকায় শাঁখারিদের সংখ্যা ছিল ২৭৩৫ জন।[৪১] এরা সকলে শহর পত্তনের সময় থেকে শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থানের দু'ধারে বসতি স্থাপন করে।

*কামার* (Kamar): কামার বা লোহার কারিগররা শহরের কর্মকারদের মধ্যে একটি সংখ্যাবহুল শ্রেণি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার হিসাবে কার্যরত। ভাল কারিগর হিসাবে ঢাকার

---

৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ জুলাই, ২০১১, ঢাকা।

*Dhaka University Institutional Repository*

তাম্রকারগণের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং ছোট ছোট বাক্স পেঁটরা ও হুক্কাদও তৈরির কাজে তারা বেশ দক্ষতা প্রদর্শন করে।

*কাঁসারি* (Kansari): যারা পিতলের কারিগর, হুক্কা ও বাক্স তৈরি করে।

*কুমার* (Kumar): কুম্ভকারগণ বা মৃৎশিল্পীরা শহরতলীতে তাদের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। স্থানীয় ও রাজমহলী দু'ধরনের কুমার ছিল। তারা হুক্কার কলকে, সুরাহী, মাটির খেলনা, মাটির হুক্কা, মাটির কলসি, থালা, হাড়ি-পাতিল, কড়াই এবং পূজার জন্য মূর্তিও নির্মাণ করত।[৪২]

*কর্মকার* (Karmokar): ঢাকা শহরে তিন ধরনের কর্মকার ছিল। প্রথমতঃ স্থানীয় হিন্দু যারা প্রাচীন ধরনের তালা তৈরি করত। যা আরবি নমুনার হত কিন্তু এখন তৈরি হয় না এবং দা ও কৃষি কার্জের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করত। দ্বিতীয়তঃ মুঙ্গেরী এলাকার হিন্দু, এরা মোটা ধরনের কাজ করত। ঘোড়ার নাল তৈরি করত, ছ্যাকড়া গাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করত। তৃতীয়তঃ মুসলমান কর্মকার, এদের সংখ্যাও খুব একটা কম ছিল না। এরা গাড়িখানায় কাজ করত এবং ঘোড়া-গাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করত।[৪৩]

*সদ্‌গোপ গোয়ালা* (Sadgop Goala): সদ্‌গোপ গোয়ালারা বাঙ্গালি এবং এরা শহরে সংখ্যায় প্রচুর। তারা গ্রামের প্রজাদের কাছ থেকে দুধ ক্রয় করে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে গাইগরু রক্ষণাবেক্ষণ করত। এর থেকে তারা ঘৃত ইত্যাদি বিক্রয় করত। এই গোত্রের কিছু লোক আবার গরুর চিকিৎসক হিসাবে মাঝে মাঝে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ ভ্রমণ করত। রায়তদের গরু মহিষাদির মচকানি, ঘা' ও বাতরোগ ইত্যাদি উপশমের জন্য তাদের চিকিৎসা কার্যের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। এদের অবলম্বিত প্রধান প্রতিকারমূলক পন্থা হচ্ছে আকুপাঙ্কচার (acupuncture) বা ক্ষতস্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে পোড়ানো।

*আহিরা গোয়ালা* (Ahira Goala): এরা বিহারি, দুধ বিক্রি এবং গরু পালন করত। শুধুমাত্র হান্টার এ শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন।

---

৪২. হাকীম হাবীবুর রহমান, ২০০৫, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে* (মূল উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদক ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম), প্যাপিরাস, ঢাকা, পৃ. ৫৩

৪৩. হাকীম হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

*Dhaka University Institutional Repository*

*মালাকার* (Malakar): মালাকার শ্রেণি সাধারণত মালী এবং বিয়ের শোভা যাত্রার জন্য মুকুট, আতশবাজি, মাল্য ও কৃত্রিম পুষ্প-প্রস্তুতকারী।

*নাপিত* (Napit): নাপিত শ্রেণির প্রায় সকলেই ত্রিপুরা জেলা থেকে এসেছে। শল্যচিকিৎসক ও ক্ষৌরকর্মকারী রূপে তাদের ব্যবসা কার্য চালায়। কেউ কেউ পান ও সুপারির চাষাবাদ করত।

*তাম্বলী সম্প্রদায়* (Tambuli): 'তাম্বলী'রা সাধারণত পান-সুপারি বিক্রি করত। শহরে এরা তৈল, খাদ্য শস্য, লবণ ইত্যাদি বহু জিনিসের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। এদেরকে বাড়ুই এবং তামলিও বলা হয়।

*গণক বা আচার্য ব্রাহ্মণ* (Ganak): গণক বা 'আচার্যরা' (assagee) হচ্ছে অধঃপতিত ব্রাহ্মণ। এরা প্রতিমা নির্মাণ এবং এর চিত্রাঙ্কন ও সজ্জিতকরণের কাজে নিয়োজিত থাকত। তারা জ্যোতিষী ও ভাগ্য গণনাকারী হিসাবেও কাজ করে।

*অগ্রদানী ব্রাহ্মণ* (Agradani Brahmans): শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে প্রদত্ত প্রথমদান গ্রহণকারীদেরকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত করা হয়। ব্রাহ্মণ শবদাহকার্যে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান পূর্বক তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। সাধারণত এদেরকে দান-করা জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, কাপড়-চোপড়, ছোট্ট এক টুকরা স্বর্ণ বা রৌপ্য ইত্যাদি।

*তিলি বা তেলি* (Tili or Teli): তৈল ও শস্য বিক্রেতা। তিলিরা মনে করে তেলিদের চাইতে তারা জাতে কুলীন। অর্থ ও ধনসম্পদের মালিক হওয়ার পর তারা আর তেল বানানোর কাজ করত না। প্রকৃত তেলিরা শুধুমাত্র তিলের বীজ থেকেই তেল বানাত। অন্যকিছু থেকে তেল বানালে এদের জাত যেত। বলদে টানা ঘানি তেলিরা ব্যবহার করত না। তেল প্রস্তুতকারকদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন পেশা ছেড়ে দিয়ে মহাজন, বস্ত্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারের পেশায় যোগ দেয়। অনেকে আবার পেশা পরিবর্তন করে আমদাওয়ালা হয়েছেন অথার্ৎ পাইকারী জিনিস কিনে খুচরা দোকানদারদের কাছে বিক্রি করা। অন্য বিশুদ্ধ শূদ্রদের মত এরা চাষাবাদ করেনা বা মদ বিক্রিও করে না। এই জাতের লোকেরা ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছে কৃষ্ণকান্ত নন্দি বা কান্তা বাবুর জন্যে। তিনি ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস এর *বেনিয়া*। তেলি জাতের মধ্যে সবার আগে কান্ত বাবু তেলি মেয়েদের মধ্যে নাকের নথ এর প্রচলন

*Dhaka University Institutional Repository*

করেন। নথ আগে শুধু ব্রাহ্মণ মেয়েরাই পড়তে পারত। দেশের লোকের জন্য তাঁর এ ভূমিকা, বিশেষভাবে নারী সমাজের জন্য তার দান বিশেষভাবে খ্যাত।

*গন্ধবণিক* (Gandhbanik): গন্ধবণিক বা নানাবিধ মশলা দ্রব্য ও ওষুধপত্রের খুচরা বিক্রেতা। এদের বসতি প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে।

*সুতার বা সুতার মিস্ত্রি* (Sutradhar): মিস্ত্রি। এদের সংখ্যাও প্রচুর। এরা প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে কাঠ কাটা, করাত দিয়ে কাঠ চেরাই, নৌকাদি নির্মাণ ও লাঙ্গল তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল।

*সুবর্ণবণিক* (Subarna Banik): সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় শহরের অধিকাংশ পোদ্দার এবং যারা বিলেতি দ্রব্যাদি বিক্রির জন্যে দোকানপাট চালায় তাদের নিয়ে গঠিত। এরা কাপড়, মূল্যবান পাথর ইত্যাদির ব্যবসায়ও করত।

*সাহা* (Sao or Shaha): শস্য, চিনি, বাদাম, লবণ এবং দেশিয় পণ্য বিক্রেতা। এরা অন্যান্যদের থেকে একটু সম্পদশালী। বরেন্দ্র সাউরা খাদ্যশস্য, লবণ, চিনি, সুপারি ইত্যাদির ব্যবসা করে এবং গ্রামাঞ্চলে দোকান চালায়; অন্যদিকে, রাঢ়ী সাউরা হচ্ছে মাদকদ্রব্যের চোলাইকারী।

*কাপালিক সম্প্রদায়* (Kapali): কাপালিকগণ চটের কাপড় বুনে এবং দড়ি, পাকানো সূতা ও থলে ইত্যাদি তৈরি করত। এদের অনেকে আবার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসাবেও কাজ করত।

*পাটিয়াল* (Patial): পাটিয়ালরা ঘুমানোর জন্য ভাল শীতলপাটি বা সুন্দর সুন্দর মাদুর তৈরি করে থাকে। স্থানীয় লোকেরা এসব পাটির উপর শোয়। পুরুষ ও রমণী উভয়েই পাটি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল।

*পাটনী* (Patni): মাছ মারা, ঝুড়ি তৈরি করা ও খেয়া নৌকার মাঝি। যখন খেয়াঘাটে তাদের কাজ বন্ধ থাকে তখন এরা ঝুড়ি বা চুপড়ি ইত্যাদি বানায় এবং গ্রাম্য হাটে মাছ ক্রয় বিক্রয়ের কাজেও নিযুক্ত ছিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

*কৈবর্ত* (Kaibartta): কৈবর্তগণ দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণিতে বিভক্ত, যথা- চাষা কৈবর্ত অথার্ৎ চাষী লোক এবং জেলে কৈবর্ত বা জেলে। জেলেরা দেশের এ অঞ্চলে সবচেয়ে ভালমাঝি হিসাবে গণ্য।

*মাদাক বা মায়রা* (Madak or Mayra): মিষ্টিদ্রব্যাদি, কেক, পেস্ট্রি, চকলেট ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ও বিক্রেতা।

*ধোবা বা ধোপা* (Dhoba): এরা সোনারগাঁও ও ডেমরা শহরে বসবাস করত এবং সেখানকার বণিকদের মসলিন বস্ত্রাদি ধোয়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। গ্রামাঞ্চলে ধোপারা অপেক্ষাকৃত ধনী দেশিয় পরিবারগুলির কাপড়াদি ধোয়ার কাজ করত। এদের পারিশ্রমিক খাদ্যশস্যে এবং নগদ অর্থে দেয়া হত।

*ডোম* (Dom): ডোম বা শবদাহকারীরা সাধারণত মরদেহ বহনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে তারা শূকর পালন, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরি করত এবং এদেরকে কুকুর মারার কাজেও নিয়োগ করা হত।

*যোগী* (Jogi): এরা সাধারণত ভিক্ষাজীবী। তবে গঙ্গার পূর্বতীরে যোগীরা সকলেই তাঁতি। নারী-পুরুষ সবাই তাঁতের কাজ করত। তাছাড়া গ্রাম্য মোটা কাপড়-চোপড় তৈরি করত এবং খৈয়ের পরিবর্তে তারা সিদ্ধভাতের মাড় ব্যবহার করে এবং সে কারণে অন্যান্য তাঁতিদের নিকট তারা মাত্রাতিরিক্ত অবিশুদ্ধ জাতিরূপে গণ্য হয়। যোগীরা মৃতদেহ পুড়ে না। যোগাসনে উত্তর পূর্বমুখী বসিয়ে পুতে রাখে।

*চণ্ডাল* (Chandal): এদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ শহরে ঘাসকাটা, মালী, মাঝি-মালা, পাল্‌কি ও ডুলীর বেহারা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত।

*গারুড়ী* (Garwara): একটি ব্যতিক্রমধর্মী নিম্নশ্রেণি যাদের শুধুমাত্র ঢাকায় দেখা যেত। তারা ভোঁদড়, শুশুক ও কুমীর ইত্যাদি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রথমোক্তটি মারা হত চামড়ার জন্য এবং শেষোক্ত দুটো তৈলের জন্য- যা' তারা সিদ্ধ করে বের করে এনে ঔষধিরূপে বিক্রি করত। তাদের একমাত্র ব্যবহৃত অস্ত্র 'ট্যাডা' নামের এক প্রকার ক্ষুদ্র বর্শা; এ দিয়ে তারা কয়েকশ গজ দূরের কোনো বস্তুকেও সঠিকভাবে আঘাত হানতে পারত। এই অস্ত্রের ব্যবহারে তাদের দক্ষতার জন্যে নদী পথের ডাকাতদের নিকট তারা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা স্বরূপ ।

*Dhaka University Institutional Repository*

*চামার* (Chamar): চামাররা প্রায় ডোমদেরই সদৃশ এবং চামড়ার কাজে নিযুক্ত। চামার চামড়া প্রস্তুত করে (অর্থাৎ বিভিন্নকাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে) জুতা, ঘোড়ার সাজ, ঢাক ও সুতা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত ধনুকের তার ইত্যাদি বানাত। এছাড়া বিবাহ ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় এরা বাদ্যকরের কাজ করত।

*ভূঁইমালী বা ঝাড়ুদার বা মেথর বা হাড়ি বা ধাঙড়* (Bhuimali or Sweeper or Methar or Dhangar): এরা সকলেই শহরাঞ্চলে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কারক হিসাবে কাজ করে। এরা নিম্নস্তরের পেশাজীবী সম্প্রদায় যারা শহর, নগর, বন্দর, গঞ্জ বা জনবহুল এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ময়লা বিশেষত মল, মূত্র, মরা, পচা, বাসি ও অন্যান্য পরিত্যক্ত আবর্জনা সাফ করে থাকে। স্থানীয় হাটবাজারে এরা মেথর, ভূঁইমালী বা ঝাড়ুদার হিসাবেও পরিচিত। ধাঙড় শব্দটির অর্থ পশুপালক বা কৃষক। H.H. Wilson বলেন, "ধাঙড় বা ঝাড়ুদার হলো নিম্ন শ্রেণিভুক্ত একটি জাতির অধিবাসী যারা পাহাড়ে ঘেরা উচ্চ ভূমি রামগড় এবং ছোটনাগপুরে বসবাস করে। অনেক সময় এদের কিছুসংখ্যক কাজের খোঁজে সমতল ভূমিতে নেমে আসে। দক্ষিণ ভারতে ধাঙড় মেষ পালক ও তাঁতের কাজ করে। তামিলনাড়ুতে এরা কৃষিকাজ করে।"[৪৪] কিন্তু William Crooke বলেন, "মেথর বা ঝাড়ুদার হলো প্রত্যেক পরিবারের অনভিজ্ঞ ও সর্বনিম্নশ্রেণির শ্রমিক। মেথর বা ঝাড়ুদার বাংলা প্রদেশে খুব পরিচিত বিশেষত গৃহস্থালি কাজের জন্য।"[৪৫] ধাঙড়দের সম্পর্কে ভারতীয় *ব্রহ্মপুরাণ* এর কাহিনীতে বলা হয়েছে, মুনি বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ফলে তার কয়েকজন পুত্রের অপত্যগণ 'অন্ধ্র' শ্রেণির নীচ জাতিতে পরিণত হয়। পরে তাদের স্থান দেওয়া হয় আর্যদেশের বাইরের প্রান্তভাগে দক্ষিণ এলাকায় বিন্ধ্য পর্বতের কাছে। সেখানে তারা কারহা উপত্যকার পাশ ধরে বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে বসবাস করতে থাকে। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। ভূমিহীন ধাঙড়দের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। ফসল বোনা ও কর্তনের সময় তারা ভূস্বামীদের জমিতে অস্থায়িভাবে ঘর তৈরি করে বসবাস করত। পরে অন্যত্র চলে যেত। এভাবে তারা জীবন ও জীবিকার তাগিদে দাক্ষিণাত্য ছেড়ে তারা গ্রহণ করে ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ। হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী প্রাচীন ভারত ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের কতিপয়

---

[৪৪]. A tribe of people inhabiting the hill country in Ramgarh and Chota-nagpur: some of them come periodically into the plains for employment, and are engaged as laborers and scavengers. In the south of India, Dhangar is generally applied to the caste of shepherd and weavers of wool. In Telingana, they are also cultivators, and are divided into twelve tribes, who do not eat together, nor intermarry. H.H. Wilson, 1966, *A Glossary of Judicial and revenue Terms, and of Useful words occurring in official Documents*, Munshiram Manoharlal, Delhi, p. 135 (First published 1855)

[৪৫]. A sweeper or scavenger. This name is usual in the Bengal Presidency, especially for the domestic servant of this Class. The mater, or sweeper, is considered the lowest menial in every family. William Crooke (ed.), 2000, *Hobson-Jobson* (*A Glossary of Colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive*), Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, P. 566 (1st Published in 1903)

*Dhaka University Institutional Repository*

পেশাজীবী ছিল, যাদের অস্তিত্ব পরবর্তীকালেও বজায় থাকে। ভারতীয় ধর্ম ও সমাজভিত্তিক ব্যবস্থায় ধাঙড়দের স্থান একেবারে নীচুস্তরে। তারা অকুলীন ও অস্পৃশ্য। তাদের ধরা-ছোঁয়া বা খাওয়া কোন জিনিস ব্যবহার করাও অভিজাত হিন্দুদের কাছে শুধু নিষিদ্ধ নয়, পাপ হিসাবেও গণ্য ছিল। ধাঙড়রা সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও উঁচু বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে মন্দিরে বসে উপাসনার অধিকার থেকে বঞ্চিত। বর্ণহিন্দুরা তাদেরকে নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করে না। এ কারণে ধাঙড় জাতীয় লোকজন বিভিন্ন সময়ে উঁচুবর্ণের লোকদের দ্বারা হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ঢাকায় পেশাজীবী হিসাবে মেথর বা ধাঙড়দের আবির্ভাব হয় ১৬২৪-২৬ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময় মগ দস্যুরা ঢাকায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই ধ্বংসযজ্ঞের লাশ সরানোর জন্য মেথর নিয়োগ করা হয়। ১৮৩০ সালে ঢাকা কমিটি এবং ১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা গঠনের পর নগর জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটিও পৌর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসাবে ধাঙড়রা বেতনভোগী শ্রমিক বা দিনমজুরির ভিত্তিতে ময়লা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ নেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়। পৌরসভার দায়িত্ব তখন আরও বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে শুরু হয় বাড়তি ধাঙড় সংগ্রহ। পৌর কর্তৃপক্ষ তখন ভারতের কানপুর, মাদ্রাজ ও নাগপুর থেকে দরিদ্র ধাঙড় আনার ব্যবস্থা করে। পৌরসভায় তাদের চাকরিসহ নির্দিষ্ট এলাকায় (যেমনঃ টিকাটুলি, আগা সাদেক রোড) বসবাসের স্থান দেওয়া হয়।

*কোচ ও রাজবংশী* (Koch and Rajbansi): এরা অরণ্যাঞ্চলে বাস করত। কুঠার ও লম্বা বাটওয়ালা কোদালের সাহায্যে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে তারা ধান, তৈলবীজ ও তুলার চাষাবাদ করত। তারা কাঠ-কয়লা বানাত ও হরিণের শিং সংগ্রহ করত। এসব দ্রব্য তারা অরণ্যের কাছাকাছি সাপ্তাহিক হাটগুলিতে মাদক দ্রব্যের জন্য বিক্রয় অথবা বিনিময় করত। কোচ ও রাজবংশীরা তাদের স্ব স্ব জমিদার বা ভূমি-মালিকদের প্রয়োজন পড়লে, বরকন্দাজ ও যোদ্ধা হিসাবেও কাজ করত। কোচরা সাধারণত কয়েকটি নির্জন কুঁড়েঘর নিয়ে গড়ে-ওঠা ছোট ছোট গ্রামে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিল।

শূদ্র (Sudra): শূদ্রগণ নয়টি বিশুদ্ধ বর্ণ বা বল্লাল সেনের নব শাখা নিয়ে গঠিত। এদরে মধ্যে তাঁতি বা বয়ন শিল্পীর সংখ্যা ঢাকা জেলায় প্রচুর ছিল। শহরে তাদের মোট গৃহের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল না।

*Dhaka University Institutional Repository*

*বাঁদিয়া বা বেদে* (Bediyas): নিম্ন ও অশুদ্ধ সম্প্রদায়। তারা হিন্দু, কি মুসলমান তা' নির্ণয় করা কঠিন। আজও এ বর্ণটি সমাজে বিদ্যমান। বেদেরা নানান ধরনের কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। তারা খুব দক্ষ ডুবুরী। এরা জলাভূমি হতে ঝিনুক সংগ্রহ করে থাকে এবং শীত মৌসুমে পরিষ্কার পানিতে মাছ ধরার কাজে ব্যাপৃত। তাদের পাওয়া ছোট ছোট মুক্তা দিয়ে তারা নাক ও কানের জন্য অলংকার তৈরি করে থাকে; এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়- এমন কয়েকটি দ্রব্য যেমন, শঙ্খ ইত্যাদি তারা বাজারে বিক্রি করে। এরা পুঁতিমালা, খুব অল্প মূল্যের মনি, তুঁতিনা ও টিনের আংটি; বাঘ-নখের তৈরি গলার হার ইত্যাদি বিক্রি করে। এছাড়া তারা ভেষজ ঔষুধপত্র এবং তাঁতিদের বুনটের সুতাগুলি পৃথক করার কাজে ব্যবহৃত 'হান্না' বা বাঁশের তৈরি চিরুণী ইত্যাদিও এরা প্রস্তুত করে থাকে। এরা শিঙ্গা লাগিয়ে রক্তচোষণ বা কাপিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন রোগের উপশম করে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে যন্ত্রাদি ব্যবহার করে, তা' হচ্ছে চামড়া ছিদ্র করার জন্য কাঁকিলা মাছের ধারালো দাঁত এবং গরুর শিং এর অগ্রভাগ যা' দিয়ে চুমুক দিয়ে তারা রক্ত শুষে আনে। বেদেরা পাখি শিকারেও দক্ষ। এরা পালক সংগ্রহের জন্য ফাঁদ পেতে ও নানান উপায়ে পাখি শিকার করে। এদের যেসব বাঁদিয়া বাঘ মারে তারেদরেক 'বাঘমারিয়া' বলে এবং যারা ইঁদুরের গর্ত হতে লুকায়িত ধান তুলে তারেদকে 'বিন্দা' বলে। তবে উভয়েই বেদে শ্রেণির অন্তর্গত।

এছাড়াও যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় রয়েছে তাহলো- *Halwai, Ganrar, Aguri, Dalui, Durmi, Chasa Dhopa, Sekera, Jhal, Jalia, Pod, Tior, Beldar, Hansi, Koeri, Kacharu, Baiti, Bagdi, Dulia, Muriyari, Bahelia, Bauri, Bind, Nat, Bhumij, Santal, Kaora, Pasi, Pan, Uraon, Barnawars, Bathua, Sadgop, Kheyatilam, Nagarchi* প্রভৃতি। এরা সংখ্যায় কম এবং বৈচিত্র্যময় পেশায় নিয়োজিত ছিল।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার ঢাকার জেলার কালেক্টর ক্লে'র প্রদত্ত *'History and Statistics of the Dacca Division'* এবং জেমস টেলর এর *'Topography of Dacca'* গন্থে উল্লেখিত বর্ণের সাথে আরও কিছু পেশা ও বর্ণের নাম সংযোজন করেন। তিনি হিন্দুদেরকে পেশার ভিত্তিতে যে ১৫টি ভাগে বিভক্ত করেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ[৪৬]

---

[৪৬]. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, pp. 39-40, 46

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ২

| **Level of Caste and Professon** | **Who belongs to the particular Caste and Professon** |
|---|---|
| Superior Caste | Brahman, Rajput, Ghatwal |
| Intermediate Caste | Kayasth, Baidya |
| Trading Caste | Kshattriya, Barnawar, Bania, Gandhabanik, Subarnabanik |
| Pastoral Caste | Goala |
| Castes engaged in preparing cooked food | Kundu, Ganrar, Halwai, Madak |
| Agricultural Castes | Kaibartha, Sadgop, Aguri, Chasa Dhopa, Dalui, Kheyatilam, Parasar Das, Barui, Tamli, Mali, Koeri, Kurmi |
| Castes engaged chiefly in personal service | Dhoba, Hajjam and Napit, Behara, Kahar |
| Artisan Castes | Kamar (blacksmith), Kansari (brazier), Sonar (goldsmith), Sutradhar (carpenter), Kumar (Potter), Laheri (lac-worker), Kacharu (glass-maker) Sankhari (shell-cutter) Suri (distiller), Teli (oilman), Kalu (oilman) |
| Weaver Castes | Tanti, Hansi, khatba, Jogi, Kapali |
| Labouring Castes | Beldar, Chunari, Matial, Patial |
| Castes occupied in selling fisll and vegetables | Did not mention |
| Boating and fishing castes | Jalia, Jhal, Patni, Pod, Patur, Muriyari, Bathua, Tior, Mala, Manjhi |
| Dancer, Musician, Beggar and Vagabond Castes | Baiti, Kan, Nagarchi |
| Persons enumerated by nationality only | Hindustani, Panjabhi, Assamese |
| Unknown Profession or unspecified castes | They are number in 19568. |

*Dhaka University Institutional Repository*

বাংলায় প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল থেকে জমিদার বা রাজস্ব সংগ্রাহকগণ কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শ্রেণি ছিল এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন ঔপনিবেশিক ভূমিনীতি এই মৌলিক ভারসাম্যকে নষ্ট করেনি। ভূমির মালিকানার হাত বদল হয়েছিল, কিন্তু শ্রেণি বিলুপ্ত হয় নি। জমিদার শ্রেণির নিচেই ছিল একটা বিশাল কৃষক শ্রেণি। উক্ত ভূমিনীতি একটা মধ্যবর্তী খাজনা সংগ্রাহক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে, যার ফলে জোতদার, গণতিদার, হাওলাদার বা তালুকদার কিংবা ভূঁইয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের দেশিয় বা স্থানীয় উচ্চবর্গের অভ্যুদয় ঘটে। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সাথে সাথে শহরাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শহরে শিক্ষিত পেশাজীবী (আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, চাকুরিজীবী) এবং অন্যান্য পেশাজীবীর সম্বনয়ে একটি ভদ্রলোক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যারা শিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। উচ্চ বর্ণের অনেক হিন্দু ও মুসলমান এবং উভয় সম্প্রদায়ের বিত্তবান মিশ্র বর্ণের লোক 'পেটি বুর্জোয়া' শ্রেণিতে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও নিম্নশ্রেণির বিশেষত নিম্নবর্ণের মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক টাবু'র (Taboo) মধ্যে আবদ্ধ।

জেমস ওয়াইজ মুসলমানদের মধ্যে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সাতাশিটি বর্ণের এবং প্রধান তিনটি গুচ্ছের সন্ধান পান। তিনটি প্রধান গুচ্ছের মধ্যে ছিল আশরাফ বা উচ্চ শ্রেণির মুসলমান, আজলাফ বা নিম্নশ্রেণির মুসলমান এবং আরজল বা মানমর্যাদাহীন শ্রেণির মুসলমান। প্রথমগুচ্ছে ছিল সৈয়দ, শেখ, পাঠান এবং মুগল, পক্ষান্তরে অন্য দুটি গুচ্ছে পঞ্চাশটির মতো পেশাজীবী বর্ণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা শহরে যদিও হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তবে সংখ্যার ব্যবধান খুব বেশি ছিল না। ১৮৩০ সালে মিঃ এইচ ওয়ালটারের উদ্যোগে ঢাকা শহরের প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। তখন ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ৬৬,৬৬৭ জন। এদের মধ্যে মুসলমান ৩৫,২৩৩ জন এবং হিন্দু ৩১,৪২৯ জন। *'History and Statistic of the Dacca Division'* গ্রন্থেও বলা হয় যে, ঢাকা জেলায় হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় সমান কিন্তু শহরাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশি। বেশিরভাগ মুসলিম শেখ, সৈয়দ, মুগল। পাঠানদের সংখ্যা তুলনামূলক কম। নিম্নশ্রেণির মুসলমানরা পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত। মুসলিম যেসব নিম্নবর্ণের নাম পাওয়া যায়, তাহলো- খাসাই, কুলু, জোলাহ, মালি, চলেন হাস, বিলদার বা গোরকান্দ, ধুরিয়া, মিরিস কারিয়া, দাই, হাজাম, ধোপী, মাইফার্স, ডোলি, শ্যামপুরিয়া ও বাজিগর প্রমুখ।[৪৭] কিন্তু ১৮৭২ সালে দেখা যায় বিপরীত চিত্র, তখন ঢাকা শহরে মোট জনসংখ্যার ৩৪,৪৩৩ জন হিন্দু আর ৩৪,২৭৫ জন মুসলমান।[৪৮] ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার

---

[৪৭]. *History and Statistic of the Dacca Division.*, pp. 8-9

[৪৮]. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (অনু. ফওজুল করিম)*, মুনতাসীর মামুন (সম্পা), ১৯৯৮, প্রথম খণ্ড, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ২৬

*Dhaka University Institutional Repository*

মুসলমানদেরকে পেশার ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাজন না করে, বংশগত পরিচয় তুলে ধরেন। যেমন: Julaha or Jola, Mughul, Pathan, Sayyid, Shaikh and unspecified.[৪৯]

শ্রী কেদারনাথ মজুমদার হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কথা উল্লেখ করেন। এ ভেদমূলে মুসলমান সমাজ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথাঃ ১. আশরাফ (সম্ভ্রান্তশ্রেণি); ২. আজলফ (নিম্নশ্রেণি) এবং ৩. আরজল (নিকৃষ্টশ্রেণি)। প্রথম শ্রেণিতে যথাক্রমে- সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মুগল, মলিক ও মির্জা। এরা অত্যন্ত উচ্চবর্গীয় ও উঁচু পেশার মানুষ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে- ক-শাখায় চাষী, শেখ; খ-শাখায় দর্জ্জি, জুলা, ফকির; গ-শাখায় দাই, ধুনিয়া, কসাই, কুলু, মাহিফরস, মালা, নিকারি ইত্যাদি; ঘ-শাখায় বাদিয়া, ধুরী, হাজম, মুচি, নাগার্চি, নট প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণিতে- কসবি, লালবেগী, মেথর, আবদাল প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণির নিকৃষ্ট মুসলমানেরা মসজিদে উঠতে পারত না। সাধারণের কবরখানায়ও তাদের মৃতদেহের স্থান নাই। এদের সংস্পর্শও নিষিদ্ধ। নিম্নশ্রেণির মুসলমানরা সামাজিকভাবে নিজেদের অপরাধের বিচার ও দণ্ড দিয়ে থাকে। এই সামাজিক বিচার প্রথাকে 'পঞ্চায়েত' বলে। ঢাকা সদরে প্রত্যেক মহলায় এরূপ 'পঞ্চায়েত' প্রতিষ্ঠা ছিল।[৫০]

জেমস টেলর এর *'Topography of Dacca (pp. 244-6)'* এবং জেমস ওয়াইজ এর *'Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal'* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ থেকে ঢাকা জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নশ্রেণির পেশা ও পরিচিতি উল্লেখ করা হল যাদের বসতি ঢাকা শহরেও ছিল।

*কসাই*: মাংস বিক্রেতা। যারা তাদের জবাই করা পশু অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। মুসলমান কসাইরা দুইভাগে বিভক্ত- বকরি কসাই বা ছাগল কসাই আর গরু কসাই। পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণির কসাইদের স্থান ছিল নিম্নে। কিন্তু পরবর্তীকালে উভয় শ্রেণির মধ্যে বিয়েশাদি ও মেলামেশা চলত।

*কলু*: তিল ও সরিষার তৈল উৎপাদনকারী। হিন্দু তেলিদের মত মুসলমান কলুরাও তেল প্রস্তুত করত। কলুরা নিম্ন জাতের, সঙ্কীর্ণমনা ও গোঁড়া ফরাজি। পুরুষানুক্রমে যারা কলু তারা অন্য শ্রেণির অবজ্ঞার পাত্র। গরু দিয়ে ঘানি টানার বদলে এরা নিজেরাই ঘানি টানত। এদের সম্পর্কে বলা হত, বউ ঝগড়াটে

---

৪৯. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, p. 41

৫০. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী, (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৯০

*Dhaka University Institutional Repository*

হলে কলু তাকে সিধা করার জন্যে লাগিয়ে দেয় ঘানিতে। সব রকম বীজ থেকেই তেল প্রস্তুত করত কলু। কলুরা নারকেল তেলও তৈরি করত।

*জোলা*: মুসলিম বয়নকারী জোলা শব্দটি সব শ্রেণির মুসলমান তাঁতিদের কাছেই নিন্দনীয়। আরবি শব্দ "আহম্মক" এর অর্থ বোকা, জোলা শব্দের সমর্থক। গ্রাম্য মোটা বস্ত্র প্রস্তুতকারী তাঁতি। এরা ডেমরায় বাস করত।

*মালী*: ঢাকায় মুসলমান মালী রয়েছে অসংখ্য। আনন্দ থেকে বিষাদ পর্যন্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠানে মালীদের কাজে লাগত। এরা ফুলের চারা গাছের পরিচর্যা করে বড় করে তা বাজারে বিক্রি করত। যে সব মালী অন্যের বাড়ির বাগানে কাজ করে এরা আবার তাদের অবজ্ঞা করত। এসব মালী বিভিন্ন জাতের যুঁই, কক্সকম্ব, গাঁদা ও গোলাপের চারাগাছ জন্মাতো। মুসলমান মহিলাদের ব্যবহারের জন্য মালীরা প্রস্তুত করত বিভিন্ন রকমের ফুলের মালা, ফুলের গহনা, গজরা, বড়মালা, বিবাহের গহনা, সেহরা, খাটসজ্জা, তোড়া, ফুলের বাজুবন্ধ এবং ফুলের ছড়ি প্রভৃতি তৈরি করত। হিন্দু মালাকারদের মত মুসলমান মালীরা আলগা ফুলও রাখত যা দিয়ে ঘরবাড়ি দোকান ও নৌকা সাজানো যায়। আবার পীর দরবেশদের মাজারেও ফুলের প্রয়োজন পড়ে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে মোহররম ও বেড়া উৎসব-কাল এবং বিয়ের শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত কৃত্রিম পুষ্প ও সাজসজ্জার প্রস্তুতকারীও মালী। এদের কিছু সংখ্যক চকে এবং কিছু সংখ্যক ইসলামপুরে তিন প্রহর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত রাস্তার পাশে নিজেদের ফুলের ঝুড়ি রেখে পণ্যাদি বিক্রি করত। এরা গরিব লোক এবং মুসলমান, হিন্দু নির্বিশেষে সকলেই তাদের গুণগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও কেউই তাদের মধ্যে সচ্ছল নয়।[৫১]

*জেলে*: সেইসব ব্যক্তি যারা মাছ ধরে ও বিক্রি করে।

*বিলদার*: মাটি কাটে, গোর বা কবর খননকারী, সড়ক নির্মাণকারী ও মৃতদেহ বহনকারী প্রভৃতি।

*দড়িয়া*: এরা কুকুর রক্ষক, ভূঁইমালী, ঘটক ও জলৌকা প্রয়োগকারী চিকিৎসক সম্প্রদায় ও অন্যান্য।

*মৃশকারিয়া*: পাখিমারা ব্যাধ সম্প্রদায়।

---

[৫১]. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ৫০

*Dhaka University Institutional Repository*

*দাই*: দাই শব্দটিকে সংস্কৃত শব্দ ধাই-এর সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়। সংস্কৃত ধাই অর্থ দুধ-মা। পূর্ববঙ্গে ধাই হল ধাত্রী; আর "দুধ মিলাই" হল দুধ-মা। ধাত্রীরা সাধারণত মুসলমান। তবে ধাত্রী যদি হিন্দু হয় তবে অবধারিতভাবে তিনি চামার সম্প্রদায়ের। তাই অবজ্ঞা করে ধাত্রীকে বলা হয় "নারকাটা" অর্থাৎ যে নাড়ী কাটে। ধাত্রীর পুরুষ আত্মীয়রা সাধারণত হয় দর্জি অথবা পেশাদার গায়ক। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই এরা তাঁতির কাজ করত। ঢাকায় ধাত্রী বলতে এমন একজনকে বুঝতে হবে যিনি নিরক্ষর। সংখ্যায় এরা নিতান্তই কম। ধাই এর কাজ সাধারণত বংশানুক্রমিক ছিল।

*হাজ্জাম/হাজাম*: মুসলমান সমাজে হাজ্জামের স্থান অতি নগণ্য। সম্ভ্রান্ত বংশের কোনো লোক হাজ্জামের ঘরে বিবাহ করত না বা ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত না। বাজুনিয়া ও হাজ্জাম আগে একই ছিল। এরা নাপিতের কাজ করত, মানুষের দাঁতের পোকা তুলত, বালকদের মুসলমানি করত। দেশের অনেক জায়গায় এরা হল আবদাল অর্থাৎ ষাঁড়কে বলদ বানাতো। অন্য কোনো কাজ না থাকলে হাজ্জাম চাষাবাদের কাজ করত। হাজ্জামের বাড়ির স্ত্রীলোকরা দাঁত ব্যথা হলে ঝাঁড়ফুক করত, কানের ময়লা খশাতো কিংবা যে কোনো ব্যথা বেদনার ঝাঁড়ফুক করত। আবার পেট ব্যথা বা অন্যান্য রোগের জন্য ওষুধ দিত তারা। হিন্দু নাপিতদের মত হাজ্জামের কাজকে খুব একটা জরুরী মনে করা হত না।

*ধোবি/ধোপা*: শিয়া সম্প্রাদায়ের সকলেই এবং সুন্নিদের পরহেজগার লোকেরা ধোপাদের দ্বারা কাপড় ধোলাই করাত। তাছাড়া পূর্ব থেকেই ঢাকায় রাজমহলী ধোপা ছিল। এরা ইসলাম খানের সঙ্গে রাজমহল থেকে ঢাকায় এসেছিল। বাঙ্গালি ধোপাও ছিল।[৫২] মুসলমান ধোবিরা সাফায়েদগার, মিস্ত্রী ও ইস্ত্রিওয়ালা হিসাবেও পরিচিত। হিন্দু ধোপাদের মত এরাও চামার, মেথর, ডোম, কিন্তু পাটনিদের কাপড় ধুতে সম্মত ছিল না। ১৮৩৮ সালে ঢাকায় দশ ঘরের বেশি ধোপা ছিল না।

*মাহিফরাশ*: মুসলমান মৎস্য বিক্রেতারা মাহিফরাশ বা নিকারি নামেও পরিচিত। নিকারি কথাটি অপমানজনক। জেলেদের মধ্যে কৈবর্ত শ্রেণিকেই সাধারণত নিকারি বলা হয়। মাহিফরাশদের আর এক কাজ ছিল শুটকি করা। ঢাকা শহরে মাহিফরাশদের মাত্র আশিটি পরিবার ছিল।

---

৫২. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ৫২

*Dhaka University Institutional Repository*

*বেহারা*: এরা ডুলী ও পালকি বাহক। ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডুলীবাহক হিসাবে কাজ করত। বিলদার ও বেহারা চণ্ডাল হতে মুসলমান হয়েছে।

*কুট্টি*: মুসলমানদের একটি উপশ্রেণি, যাদের বলা হয় কুট্টি, তারা এই নামটি পেয়েছে হিন্দুস্তানি ক্রিয়াপদ "কুটনা" থেকে। কুটনা অর্থ ছাঁটা অথবা ধান ভানা। এরা নিম্ন শ্রেণির। প্রচলিত ধারণা এই যে, কয়েক পুরুষ আগে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অন্যসব নব দীক্ষিতদের মত তারা অসহিষ্ণু ও গোঁড়া। কুট্টিরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যেমনঃ পান্নু কুট্টি- এরা সংখ্যায় বেশি। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। কায়িক পরিশ্রমের যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, নৌকার মাঝি, ভিস্তিআলা প্রভৃতি। তবে ধানকোটাই হল প্রধান কাজ। হাত কুট্টি- এরা রাস্তা মেরামত ও তৈরির কাজের জন্য হাতুড়ি দিয়ে ইট ভেঙে খোয়া বানাত ও সুরখি বানাত। সংখ্যায় এরা কম। চুটকি কুট্টি- বুকাননের মতে সম্ভবতঃ চালের নমুনা থেকে চুটকি কথাটি এসেছে। এরা সম্ভবত চাল ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিল। এরা এক চুটকি চাল হাতে নিয়ে তার মান নির্ণয় করতে পারত। এছাড়া চুটকিরা তেল প্রস্তুতের জন্য নারকেলের শাঁস বের করার কাজে নিয়োজিত ছিল।

*তাঁতি*: জোলাদের থেকে মুসলমান তাঁতিরা একটু স্বতন্ত্র। তাঁতিরা বানায় জামদানি বা নকশা তোলা কাপড়; আর জোলারা বানায় মোটা মসলিন। ঢাকায় মুসলমান তাঁতি অসংখ্য। বিশেষ করে এরা বাস করত ডেমরা, নবীগঞ্জ ও লক্ষ্যা নদীর পার বরাবর। ব্যবসার মন্দা মৌসুমে এরা হাল চাষ করত। জোলা-বউরা কাপড় ধোয়া, আঁশ সাফ করা ও সূতা বুনার কাজ করে বলে তাঁতি-বউরা ওদের মনে করত ছোট জাত। হিন্দু তাঁতিরা জামদানি বানায় খুবই কম। হিন্দু পুঁজিপতিদের বলে 'মহাজন' আর মুসলমান হলে 'সাওতা'। এরা বিশেষ কাজের জন্যে টাকা অগ্রিম প্রদান করত। যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হত। তাঁতিদের তাঁত জোলাদের থেকে আলাদা।

*সাপুড়িয়া*: যারা সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায় এবং কবিরাজি ওষুধ বিক্রি করে। এছাড়া এরা মাছ মারার বরশীও বিক্রি করে।

*বাজিগর*: ভেল্‌কিবাজ ও দড়ি নৃত্যকারীগণ। বাজিগরদের বালিকা ও তরুণীরা বিভিন্ন খেলা দেখাত। আর, পুরুষরা গোলাকৃতি বল ও ছুরি দিয়ে কসরত করত নানা রকম। বাজিগরদের মেয়েরা আবার

*Dhaka University Institutional Repository*

ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করত বিশেষ করে বাচ্চাদের জ্বরজ্বারি ও পেটের অসুখের। বাতের ব্যথায় তারা মালিশ করে দিত চমৎকারভাবে। দাঁতের অসহ্য ব্যথার নিরাময় করতে পারত তারা।

*পাটুয়া*: পাটুয়া বা পাটওয়ে সম্প্রদায় ঢাকা শহরে ছিল। শুধুমাত্র মুসলমানরাই এ কাজে সম্পৃক্ত ছিল। এরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিল। এরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে অলংকার, গহনায় মুক্তা বসাবার কাজ করত। হিরা, জড়োয়া ও গহনা ব্যবহারের ফলে তেলচিটা অথবা ময়লা হয়ে গেলে এরাই ধুয়ে দিত। এসব পাটুয়া সদরীয়ার সাজ, চোগার তকমা/বোতাম, গুণ্ডিও তৈরি করত। কিছু হিন্দু পাটুয়ারও আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীতে মুসলমান পাটুয়াগণ হুক্কা এবং নৈচার দোকান পরিচালনা করত অথবা মুহররমের ভিস্তিওলাদের সাজসরঞ্জাম তৈরি করে অথবা ইজারবন্দ (কোমরে পায়জামা বাঁধার দড়ি) তৈরি করত।[৫৩]

*নৈচা তৈরিকারক*: বহুরকমের নৈচা তৈরি করা হত। তামাক খাওয়ার সময় নৈচা ব্যবহার করা হত। নৈচা তৈরিকারকরা কিছু ঢাকা শহরে এবং বেশির ভাগ নদীর অপর পারে 'নৈচাবন্দ টোলায়' বসবাস করত। কিন্তু নৈচাবন্দ টোলা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় সেখানকার উদ্বাস্তুরা ঢাকা শহরেই অধিবাস গ্রহণ করেছে। সিগারেট এবং বিড়ির ব্যবসা শুরু হওয়াতে নৈচা'র গুরুত্ব কমে যায়।[৫৪]

*শানকার*: শানকারি বা সায়কলগরী প্রাচীন পেশা। ইস্পাতে ধার বের করা, শান করা, সাজ-সরঞ্জাম লাগানো এবং বন্দুকের নলের উপর ময়ূরকণ্ঠী রঙ করার কাজ করত। তাছাড়া সাধারণ লোহা থেকে ইস্পাত তৈরি করত, অতঃপর খঞ্জর, বর্ষা ফলক, ছোট তরবারি ও ছোরা তৈরি করত।[৫৫]

*বাদলাকশ*: জরির সুতা উৎপন্নকারী, জামদানির তার উৎপন্নকারী। এরা তাঁতিবাজারের বসাক। এরাই সোনালি তারের পাড়ের আবরণী (গোটা পটহা) তৈরি করত। সুস্পষ্টত এই পেশা মুসলমানদের সঙ্গে অন্য স্থান থেকে এসেছিল এবং মুসলমানদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এ পেশারও অবনতি ঘটে।

---

৫৩. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ৫১
৫৪. হাকীম হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
৫৫. হাকীম হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

*Dhaka University Institutional Repository*

শালকর এবং রিপুকার শুধুমাত্র মুসলমানগণই ছিল এবং এরা ওয়ারী এলাকায় বসবাস করত। ঢাকায় রিপুকার নিজের কাজে খুবই সচেতন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম। রিপু এবং পট্টি লাগানোর পর বোঝা যেত না। এদের মাঝ থেকেই কিছু লোক শাল ধোলাই করে রং করত।[৫৬]

এছাড়াও *বাজুনিয়া, বলদিয়া, ভাটিয়ারা, চুড়ি-ওয়ালা, দফাদার, দর্জি, ধারি, ধুনিয়া, গোয়ালা, কথক, লোহার, মাহুত, মিসিওয়ালা, মুন্সী, কৃন্দকার, মুকাব্বির, নৈচা-বন্দ, নারদিয়া, ওঝা, পটোয়া, রফু-গার, রাখাল, শিকারি, সদাকার, পনির ওয়ালা, পাংখা ওয়ালা, তার-ওয়ালা, টিকিয়া-ওয়ালা, জর-কোফত, নীলঘর, নাল-বন্দ* প্রমুখ সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়।

১৮৩৮ সালে লোক-গণনায় ঢাকা শহরের অধিবাসীদের মধ্যে যেসব পেশা, ব্যবসা ও কাজের তালিকা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ[৫৭]

সারণি ৩

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ | ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১. | আইনজীবী | ৭. | ফড়িয়া |
| ২. | রুটি প্রস্তুত কারক | ৮. | কসাই |
| ৩. | নাপিত | ৯. | বাঈজী বা নর্তকী-রমণী |
| ৪. | বাঁবরদার বা বিয়ে সাদিতে পতাকাবাহক ইত্যাদি | ১০. | বৈরাগী |
| ৫. | বাদলাওয়ালা বা রূপার সুতা প্রস্তুতকারক | ১১. | কাঁসারী |
| ৬. | ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, যারা জজমানী অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে | ১২. | খাঁচা-নির্মাণকারী |

[৫৬]. হাকীম হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৫৭]. James Tylor, *Topography of Dacca*, pp. 180-3;

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ | ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৩. | তাস-পাশা প্রস্তুতকারক | ২৭. | স্বর্ণকার |
| ১৪. | চিকন্-দাজ, বা বুটিতোলা মসলিন বস্ত্রের সীবন-শিল্পী | ২৮. | গোরখন্দ বা কবর খননকারী |
| ১৫. | চীপিগর বা সূচীকর্মের জন্য ভিদ্রিসাজ বা ভিদ্রি হুকা প্রস্তুতকারক | ২৯. | গরু দাগানিয়া বা যারা উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে গবাদিপশুর চিকিৎসা করে |
| ১৬. | ঢুলী ও পালকি বাহক | ৩০. | ঘাস-কাটার লোক |
| ১৭. | ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায় | ৩১. | মসলিনের ছাপামারার লোকজন |
| ১৮. | সূতার মিস্ত্রী | ৩২. | চেরা-কষ, বা তাম্র-নির্মিত বাসন-কোসন ইত্যাদির খোদাইকারী |
| ১৯. | বোঝাওয়ালা বা মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা | ৩৩. | ময়রা বা মিষ্টান্ন বিক্রেতা |
| ২০. | কামার | ৩৪. | কলিওয়ালা বা পানপাত্রওয়ালা |
| ২১. | পুস্তক বাঁধাইকারী | ৩৫. | সুতা-পরিষ্কারকারক |
| ২২. | ইত্মামদার বা খাজনা আদায়কারী | ৩৬. | রাখাল |
| ২৩. | জেলে | ৩৭. | উত্তেজক মাদক দ্রব্যের ভাটিখানার মালিক ও বিক্রেতা |
| ২৪. | মালী | ৩৮. | ডোম, বা মৃতদেহ বহনকারী |
| ২৫. | ঘাটিমাঝি | ৩৯. | দোমনী বা মুসলমান মহিলা বাদ্যকর |
| ২৬. | গাস বোয়ার | ৪০. | ঢাকী বা ডুলী |

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|
| ৪১. | দস্তরবন্ধ বা পাগড়ী নির্মাতা |
| ৪২. | দস্তফরাশ বা পুরনো বস্ত্র-বিক্রেতা |
| ৪৩. | ইংরেজির দেশিয় লেখক |
| ৪৪. | খরানী মোলা বা যে সমস্ত লোক সরকারি অফিস সমূহে শপথনামা পাঠ করায় |
| ৪৫. | কের্দানী, বা কোমরে বাঁধবার মোটা বস্ত্রের প্রস্তুতকারক |
| ৪৬. | কালি প্রস্তুতকারক |
| ৪৭. | দড়ি ও টোনসুতা প্রস্তুতকারক |
| ৪৮. | গালা করার মোম প্রস্তুতকারক |
| ৪৯. | দরজা জানালার জন্যে পর্দা (চিক) প্রস্তুতকারক |
| ৫০. | গম-পেষক বা গম ভাঙ্গনী |
| ৫১. | গাইনদার বা নৌকা মেরামতকারী |
| ৫২. | ছাতা প্রস্তুতকারক |
| ৫৩. | হেকিম ও কবিরাজ, বা মুসলমান ও হিন্দু চিকিৎসক |
| ৫৪. | হাত-কুটি, বা ইট-গুঁড়াকারী |

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|
| ৫৫. | হাউশীগর, বা আতশবাজি প্রস্তুতকারী |
| ৫৬. | শূকর রক্ষক |
| ৫৭. | হুক্কা বা পুঁতি দানা প্রস্তুতকারী |
| ৫৮. | জহুরী বা মূল্যবান পাথর বিক্রেতা |
| ৫৯. | প্রতিমা-নির্মাণকারী |
| ৬০. | ইস্ত্রিরিওয়ালা বা যারা কাপড় চোপড় ইস্ত্রি করে |
| ৬১. | কাঁসারি বা তামা কাঁসার বাসন কোসন ইত্যাদি নির্মাণকারী |
| ৬২. | খুন্দিগর, বা শিঙ্গা ও গজদন্তের কারু শিল্পী |
| ৬৩. | খোঁড়াতি, বা কুন্দকার |
| ৬৪. | গিল্‌টিকারী |
| ৬৫. | কলু বা তেলী |
| ৬৬. | কুটিয়াল, বা খাদ্যশস্য পরিষ্কারকারক |
| ৬৭. | মালাকার বা কৃত্রিম পুষ্প প্রস্তুতকারক |
| ৬৮. | কম্বল-প্রস্তুতকারক |

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ | ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৬৯. | তুঁতে প্রস্তুতকারক | ৮২. | মোহরার বা লেখক |
| ৭০. | মোমবাতি প্রস্তুতকারক | ৮৩. | মোল্লা |
| ৭১. | বেতের চেয়ার প্রস্তুতকারক | ৮৪. | মুদী-দোকানী |
| ৭২. | ঢোলক বা ঢোল প্রস্তুতকারক | ৮৫. | মুরগীওয়ালা |
| ৭৩. | পৌতা বা বালা ও অলংকারাদির জন্য রেশমী দড়ি প্রস্তুতকারক | ৮৬. | মূরাকষ বা কাগজ ও কাপড় রঙকারী |
| ৭৪. | পাটনী বা খেয়ার মাঝি | ৮৭. | মোড়াদার বা ফড়িয়া, যারা খাদ্যশাস্য বিক্রয় করে |
| ৭৫. | অবসর প্রাপ্ত লোকজন | ৮৮. | মূগজি বা যারা কাপড়ের আচঁল বা পাড় সেলাই করে |
| ৭৬. | পোদ্দার বা টাকা পয়সা বদলকারী | ৮৯. | মনিহারী, বা চকবাজারের নানাবিধ দ্রব্যের দোকানদার |
| ৭৭. | বেহালা প্রস্তুতকারক | ৯০. | বাদ্যকর |
| ৭৮. | ঘটক | ৯১. | নেউলবন্ধ বা যারা ঘোড়ার পায়ে নল লাগায় |
| ৭৯. | মহাজন, ব্যবসায়ী ও গোলদারসহ বণিক সম্প্রদায় | ৯২. | নীলগর বা নীল কাপড়ের রঙকারক |
| ৮০. | মর্শিয়া গায়ক বা হুসেনী দালানে শোকগীতির গায়ক | ৯৩. | নখা বা চিত্র ও পেইন্ট বিক্রেতা |
| ৮১. | ধাত্রী | ৯৪. | নর্দিয়া বা যারা মসলিনের এলোমেলো সুতো ঠিক করে দেয় |
| | | ৯৫. | নৈচাবন্ধ বা সর্পাকৃতি হুক্কা প্রস্তুতকারী |

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ | ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৯৬. | ওস্তাগর, ওস্তাগারনী যারা কাসিদা মসলিনের উপর সূচীকর্মেও তত্ত্বাবধান করে | ১১০. | শিকলীগর বা ইস্পাত পালিশকারক |
| ৯৭. | কুম্ভকার | ১১১. | আতর ও সুগন্ধি তৈল বিক্রেতা |
| ৯৮. | পতিতা | ১১২. | বাঁশ ইত্যাদি বিক্রেতা |
| ৯৯. | পণ্ডিত | ১১৩. | টুপী ইত্যাদি বিক্রেতা |
| ১০০. | পসারী বা মসলা ও ওষুধবিক্রেতা | ১১৪. | কাঠকয়লা ও হুক্কার গোল বিক্রেতা |
| ১০১. | পরতালা বা চাপরাস অথবা তকমার জন্য পট্টি প্রস্তুতকারক | ১১৫. | কাষ্ঠবিক্রেতা |
| ১০২. | রাজ বা রাজমিস্ত্রী | ১১৬. | ময়দা বা ছাতু ইত্যাদি বিক্রেতা |
| ১০৩. | রঙওয়ালা বা টিন ও সীসার উপর কারুকার্যকারক | ১১৭. | ফলমূল ইত্যাদি বিক্রেতা |
| ১০৪. | রেজা বা ছাদ-পিটানী | ১১৮. | লেবু বিক্রেতা |
| ১০৫. | রিফুগর বা ছেঁড়া অংশ সিলাইকারী | ১১৯. | পানের চুন বিক্রেতা |
| ১০৬. | রঙসাজ বা বাড়িঘর, নৌকা ও পালকি ইত্যাদি রঙকারক | ১২০. | ঠাকুর পূজা বা হিন্দু মন্দিরে পূজা পরিচালনাকারী ব্রাহ্মণ |
| ১০৭. | শাঁখারি সম্প্রদায় | ১২১. | পায়ীওয়ালা বা স্বর্ণ সংগ্রহকারী |
| ১০৮. | সেঙ্গার বা ছুরি কাঁচি, তরবারী ইত্যাদি নির্মাতা বা বিক্রেতাগণ | ১২২. | পাটীয়াল বা বিছানা ও মাদুর বিক্রেতা |
| ১০৯. | করাতী | | |

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ | ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১২৩. | জুতো বিক্রেতা | ১৩৭. | দরজি সম্প্রদায় |
| ১২৪. | খড়কুটা বিক্রেতা | ১৩৮. | তালুকদার |
| ১২৫. | তাড়ি বা দেশিয় মদ্য বিক্রেতা | ১৩৯. | তাম্বুলী বা পানবিক্রেতা |
| ১২৬. | তামাক বিক্রেতা | ১৪০. | তারকষ বা সূক্ষ্ম তার দ্বারা পার্থক্য নিরূপণকারী |
| ১২৭. | তরি-তরকারী বিক্রেতা | ১৪১. | কাঠের বেপারি বা কারবারী |
| ১২৮. | বরকন্দাজ ও পিয়নসহ ভৃত্য সম্প্রদায় | ১৪২. | শিঙ্গাওয়ালা বা রক্ত চোষণকারী |
| ১২৯. | শালগর বা শাল ধোয়া ও রিফু করার লোক | ১৪৩. | সড়ক কুলি |
| ১৩০. | শিকারী বা জন্তু মারার লোক | ১৪৪. | সমাজী বা নৃত্যে যোগদানকারী বাদ্যকার |
| ১৩১. | জুতো-মেরামতকারী | ১৪৫. | মিসি বা দাঁতের মাজন বিক্রেতা |
| ১৩২. | সাবান প্রস্তুতকারক | ১৪৬. | মদ বা আফিম দ্রব্য বিক্রেতা |
| ১৩৩. | চশমা প্রস্তুতকারক | ১৪৭. | কাগজ ইত্যাদি বিক্রেতা |
| ১৩৪. | সাঁধুয়া বা স্বর্ণকারের দোকানের ঝাঁট দেয়া গুঁড়ো কয়লা, জঞ্জাল ইত্যাদি থেকে স্বর্ণরেণু বা পুরক পদার্থ সংগ্রহকারী | ১৪৮. | বাক্স পেট্‌রা ইত্যাদি বিক্রেতা |
| ১৩৫. | সানতরাশ, বা পাথর কাটার লোক | ১৪৯. | সুবলওয়ালা বা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক |
| ১৩৬. | ঝাড়ুদার | ১৫০. | সাপুড়িয়া বা সাপ ধরার লোক |

*Dhaka University Institutional Repository*

| ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ | ক্রমিক নং | পেশার বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৫১. | উকিল সম্প্রদায় | ১৫৫. | চামড়ার কারবারী |
| ১৫২. | ধোপা | ১৫৬. | জমিদার |
| ১৫৩. | তাঁতি | ১৫৭. | জরদর্জি বা রেশমি, সোনা ও রূপার সূতায় চিকন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গ |
| ১৫৪. | খাদ্যশস্য ইত্যাদির ওজনদার | | |

উপরোক্ত পেশাগুলির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণির মানুষযুক্ত ছিল। এখানে জেমস টেলর সাহেব একই পেশার নাম একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া কয়েদি, অভিবাসী এবং গণিকাও নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

*কয়েদি*: ঢাকা ছিল কয়েদিদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্থান। এদের দ্বারা শহরের অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন পণ্যদব্য তৈরি করান হত। ১৭৭৬ সালে ঢাকা জেলখানায় ১১০ জন কয়েদিদের মধ্যে ৮৭ জন ডাকাত, ১৫ জন খুনী, ৮ জন চোর ছিল। এদের মধ্যে ৯৫ জন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজে নিয়োজিত ছিল।[৫৮] নির্ম্মল গুপ্ত তাঁর '*ঢাকার কথা*'য় লিখেছেন, 'নিজামত আদালতে দণ্ডিত কয়েদিরা রাস্তা, দালান, নির্মাণ করত। সেন্ট থমাস চার্চ তারাই নির্মাণ করে। ঢাকা কলেজও এরা নির্মাণ করে।'[৫৯] ব্রিটিশ আমলেও আবার এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে ঢাকার সহকারী সার্জন কাটক্লিফ পৌরসভার চেয়ারম্যানকে লিখেছিলেন দরকার হলে সরকারের অনুমতি নিয়ে ঢাকা জেলের কয়েদিদের বিনা পারিশ্রমিকে ঢাকা শহরের উন্নয়নের কাজে নিয়োগ করা উচিত।[৬০] এছাড়া জেলখানায় কয়েদিদের দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে অনেক পণ্য উৎপাদন করান হত। ঐসব পণ্য বিক্রয়ের অর্থ সরকার নিত।

---

৫৮. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 217

৫৯. নির্ম্মল গুপ্ত, শ্রাবণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, *ঢাকার কথা*, কলকাতা, পৃ. ৫৪

৬০. *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal*, Judicial Department, September 1869; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১১৩

*Dhaka University Institutional Repository*

*অভিবাসী*: ঢাকা শহরের অভিবাসী (Migrated) শ্রেণিও নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব ও পশ্চিমে সম্প্রসারিত ঢাকা নগরীতে জীবিকার সন্ধানে উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সমবেত হয়েছিল নানা শ্রেণির মানুষ। একদিনে নয়, ধীরে ধীরে তারা সমবেত হয়ে গড়ে তুলেছে বসতি। ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলায় পাঁচ ধরনের অভিবাসনের কথা জানা যায়।[৬১] যেমন:

(১.) আকস্মিক আগমন (Casual or Accidental movement): যারা স্বীয় জন্মস্থান বা বাংলা প্রদেশের আন্তঃজেলাগুলি থেকে আকস্মিকভাবে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগমন করত।

(২.) অস্থায়িভাবে আগমন (Temporary movement): যারা সাময়িকভাবে রাস্তা, রেলপথ নির্মাণ শ্রমিক, ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অন্য জেলায় আগমন করত।

(৩.) সাময়িকভাবে আগমন (Periodic movement): ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের শ্রমিক অভিবাসীর আগমন ঘটে।

(৪.) আধা-স্থায়ি অভিবাসী (Semi-Permanent): ঐসব অভিবাসী যারা জীবন ধারনের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অস্থায়িভাবে বসবাস করে কিন্তু তাদের জন্মস্থান বা পুরানো বাড়ি-ঘর ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সময় অন্তর অন্তর তাদের নিকট ফিরে যান।

(৫.) স্থায়ি অভিবাসী (Permanent migrated): কোন এলাকায় জনসংখ্যাধিক্যের কারণে যখন ঐ এলাকার লোকজন পরিবার পরিজনসহ অন্যত্র গমন করেন এবং স্থায়িভাবে সেখানকার বাসিন্দা হন। তখন তাদেরকে স্থায়ি অভিবাসী বলে। ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা শহরের ক্রমশ অবয়বগত উন্নতি, নানা সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি, অফিস, আদালত গড়ে ওঠার কারণে এখানে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইউরোপীয় বণিক, অনুপস্থিত জমিদার (absentee zamindar or land-lord) এবং দেশিয় উচ্চবর্গ শ্রেণি শহরে বসবাস করে। তাদের পরিসেবা প্রদানের নিমিত্তে শহরে নিম্নশ্রেণির পেশাজীবীর আগমন ঘটে।

পেশা হিসাবে গণিকা বা পতিতাদের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার উপাত্ত অপ্রতুল।

উপরে ঢাকা জেলা ও শহরের যেসকল বর্ণ, সম্প্রদায়, জাতি ও পেশার নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা আমরা Henry Walters

---

৬১. *Report On The Census of Bengal*, 1901, Vol. 6, Part-1, pp. 127-8

*Dhaka University Institutional Repository*

এর '*Census of the City of Dacca*' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রমুখ সম্প্রদায়কে বিপুল অর্থ বৈভবের মালিক দেখি। এমনকি 'মিউনিসিপ্যাল কমিটি'র সদস্য এবং 'ঢাকা পৌরসভা'র অনেক কাউন্সিলর ঐসব সম্প্রদায় এবং বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে ঐসব সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং অসচেতন। অথচ তারা স্বতন্ত্র চৈতন্যের অধিকারী। সুতরাং এদেরকে প্রলেটারিয়াট বা অধস্তন শ্রেণি বা নিম্নবর্গ বলে অভিহিত করা যায়। এরা গরিবও ছিল। ঢাকা 'শহর' যেমন একদিনে গড়ে ওঠে নি তেমনি এসব নিম্নবর্গের মানুষও একদিনে ঢাকা শহরে এসে বসতি স্থাপন করেনি। শহর হিসাবে ঢাকা'র উদ্ভব, পুনরুত্থান ও বিকাশের সাথে সাথে এখানে নিম্নশ্রেণির নানা পেশাজীবী মানুষের সমাবেশ ঘটতে থাকে। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে ঢাকা'র পুনরুত্থান ও নিম্নবর্গের সমাবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ঢাকার পুনরুত্থান এবং নিম্নবর্গের সমাবেশ

প্রাক-মুগল আমলের ঢাকার ইতিহাস আজও অজানা। তবে ঢাকার ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থানের জন্য ঐতিহাসিককাল থেকে ঢাকার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক স্থানের নাম হিসাবে 'ঢাকা'র নামকরণ সম্পর্কে ভূমিকাতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। তাই ঢাকার নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা পরিহার করে বর্তমান অধ্যায়ে শহর হিসাবে ঢাকা'র উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সাথে নিম্নবর্গের সমাবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সঙ্গত কারণে শহরের অবয়বগত বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

### ঢাকা শহরের ভৌগোলিক অবস্থান

ঢাকা শহর কবেকার এবং কত তার বয়স এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটি সুস্পষ্ট যে, ঢাকা শহরে জনবসতি শুরু হয়েছিল বহু পূর্বে। ১২০৫ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর গৌড় বিজয়ের অনেক আগেই ঢাকায় মুসলমানদের আগমন ঘটে। তাই যদিও পাঠান বা আফগান আমলে বাংলার রাজধানী ছিল 'সোনারগাঁও' তবুও ঢাকায় জনবসতি ছিল। যদি ধরা হয়, মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁর 'ঢাকা'র নামকরণ এবং এর ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণ করেন। তাহলে এর ভৌগোলিক পরিসীমা সুস্পষ্টভাবে বলা শুধু কষ্টসাধ্যই নয় বরং অসম্ভবও বটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল (James Rennell)[১] ১৭৬৫ সালে বাংলার নদী অববাহিকা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান এবং একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। এরপর থেকে বিশেষত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন, এর বিভাগ, জেলা ও শহর বা মফস্বলসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সঠিক এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা যায়। W. W. Hunter ঢাকা শহরের অবস্থান সম্পর্কে বলেন, "The principal town and Civil Station of the District, as well as the Headquarters of

---

[১]. জেমস রেনেল (১৭৪২-১৮৩০) একজন ভূগোলবিদ ও নৌ-প্রকৌশলী। ১৭৬৩ সালে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্নর হেনরী ভ্যান্সিটার্ট কোম্পানির সেনাবাহিনীর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স কোর-এ তাঁকে কমিশন প্রদান করে বাংলার প্রধান প্রধান নদী ও এদের শাখা নদীর একটি জরিপ কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীউয়ানি লাভের (১৭৬৫) পর এই ধরনের একটি জরিপের প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হয়। গভর্নর রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৭ সালে একটি নিয়মিত জরিপ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জেমস রেনেলকে এই বিভাগের সার্ভেয়ার জেনারেল হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। ঢাকা ছিল তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনার সদর দপ্তর। তিনি ১৭৭৬ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। রেনেল ১৭৬৩ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলার একগুচ্ছ মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৭৭৯ সালে তাঁর মুদ্রিত বেঙ্গল অ্যাটলাস (Bengal Atlas) বাণিজ্যিক, সামরিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে একটি অতিমূল্যবান কাজ। আধুনিক মানচিত্রের সঙ্গে রেনেলের মানচিত্রকে মিলিয়ে দেখলে এই অঞ্চলের নদীসমূহের গতিপথের বৈচিত্র্যময় একটি চিত্র ফুটে ওঠে এবং সময়ের আবর্তে বন্যা, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরিষ্কার ধরা পড়ে বর্তমান সময়ে নদীগুলির গতিপথের সঙ্গে রেনেলের সময়কার নদীর গতিপথসমূহের উল্লেখযোগ্য পার্থক্যটি। ১৮৩০ সালের ২৯ মার্চ রেনেলের মৃত্যু হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

the Commissioner of the Division, is the city of Dacca, situated on the north bank of the Buriganga river, in north latitude 23°43′20′′, and east longitude 90°26′10′′, about eight miles above the confluence of the Buriganga with Dhaleswari river."[২] আহমদ হাসান দানী বলেন, "the two branches of Dulai River and the river Buriganga formed the Old Town."[৩]

## 'শহর' হিসাবে ঢাকা'র পত্তন

যদিও সভ্যতার যাত্রালগ্নে এবং মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপনের সময় থেকে 'শহর' গড়ে ওঠে কিন্তু এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আজও বিতর্ক চলছে।[৪] সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে 'শহর' এর উৎপত্তি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। তবে তত্ত্ববিদরা 'শহর' গড়ে ওঠার জন্য দু'টি পূর্ব-শর্তের কথা বলেন। যেমনঃ Agricultural Primacy এবং Urban Primacy.[৫] পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে প্রধানত ঢাকায় কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি নগরের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান ছিল। শহর গড়ে ওঠা সম্পর্কে Gordon Childe বলেন, 'for a settlement to quality as a city, it must have enough surplus of raw materials to support trade'।[৬] গর্ডন চাইল্ডের এ 'উদ্ধৃত কাঁচামাল তত্ত্বটি' ভারতীয় শহরগুলির উৎপত্তির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতীয় শহরের উৎপত্তির মূলে চারটি কারণ যেমন- প্রশাসনিক, সামরিক, বাণিজ্যিক এবং ধর্মীয়কে দায়ী করেন।[৭] সিনহা বলেন, পূর্ববঙ্গের শহরগুলি গড়ে উঠেছিল প্রধানত ব্যবসা ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে।[৮]

ভারতবর্ষে 'শহর'-এর ধারণাটি আধুনিক। শহর বলতে বোঝায় অপেক্ষাকৃত বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী বসতি এলাকা। ইংরেজিতে City ও Town এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন পার্থক্য নেই। যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলিতে শহর হলো রাজকীয় সনদ (Royal Charter) প্রাপ্ত স্থায়ী বসতিস্থল। ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপে শহর বলতে বোঝাতো বিশপের এলাকাধীন প্রধান গির্জাস্থলে এক উন্নত বসতি- a town that has been given

---

২. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, ibid, vol. V, p. 65

৩. Ahmad Hasan Dani, *DHAKA- A Record if its Changing Fortunes*, Abdul Momin Chowdhury (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, (3rd revised edition 2009), Dhaka, pp. 22-3

৪. *International Encyclopedia of Social Science*, vol. 1, The Macmillan and the Free Press, 1968, p. 447

৫. *en.wikipedia.org/wiki/city*

৬. Michael Pacione, 2001, *The City: Critical Concepts in the Social Science*, New York, p. 16, op. cit. by *en.wikipedia.org/wiki/city*

৭. মাহবুব আহমেদ, *নগর ঢাকার বিবরণ*, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৩য় বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৫; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮

৮. Pradip K. Sinha, 'Rural Towns in Eastern Bengal- A Study in Rural-Urban Reciprocity,' Pradip K. Sinha, *Nineteenth Century Bengal: Aspects of Social History*, Calcutta, 1960, p. 80; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, ১৯৮৬, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ৩৬

*Dhaka University Institutional Repository*

special rights by a king or queen, usually one that has Cathedral.[৯] বর্তমানে শহর হলো কিছু বিশেষ অধিকার নিশ্চিকরণের স্থান- a town that has been given special rights by the state government.[১০] ব্রিটিশ প্রতিবেদনগুলিতে শহর বলতে যা বলা হয়েছে, 'in the census the word *town* was held to include all municipalities and cantonments and such other continuous collections of houses as it might be decided to treat as towns.'[১১] তবে মফস্বল শহর (inner 'city) ও শহর (city) এর মধ্যে সূক্ষ পার্থক্য রয়েছে। *Oxford Dictionary*- তে inner 'city বলতে যা বলা হয়েছে তাহলো- the part near the centre of a large city, which often has social problems.[১২] পূর্ববঙ্গের শহরগুলিকে উনিশ শতকে সাধারণতঃ মফস্বল শহর হিসাবেই আখ্যা দেয়া হত। মফস্বল শব্দটি আপেক্ষিক, অর্থাৎ সদর বা 'হেডকোয়ার্টার' এর তুলনায় অধস্তন।[১৩] তাই মুনতাসীর মামুন বলেন, 'ঢাকার তুলনায় কলকাতা সদর এবং কলকাতার তুলনায় ঢাকা মফস্বল।'[১৪] দানীও একই কথা বলেন, 'The city developed as *mofussil* town in the presidency of Bengal .'[১৫]

১৬১০ সালে মুগল সুবাদার ইসলাম খাঁ বাংলার বিদ্রোহী পাঠান, হিন্দু রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের ক্ষমতা বিনষ্ট করে তাদের বশীভূত করা, মগদের আগ্রাসন ও পর্তুগিজদের দস্যুতা দমন করা এবং সর্বপোরি মুগলদের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি নিয়ে বিহারের রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন।[১৬] কিন্তু তখন ঢাকাকে শহর না বলে ক্যান্টনমেন্ট হিসাবেই বর্ণনা করা হত। তবে এ ক্যান্টনমেন্টটি একসময় শহরে পরিণত হয়। আবদুল করিম বলেন, '*আকবরনামা*'য় ঢাকাকে মুগল থানা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একটি থানা বলতে বোঝাতো আক্রমণ অথবা প্রতিরক্ষার জন্য কয়েকশত, এমন কি কয়েক হাজার সৈন্যের ছাউনি বা ক্যান্টনমেন্ট। স্বাভাবিকভাবে সেনা ছাউনিতে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবারহের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনেই ব্যবসায়ী এবং দোকানদার শ্রেণি এখানে এসে ভিড় জমাতো এবং তাদের কর্মতৎপরতার ফলে এই অঞ্চলটি শহরে পরিণত হয়। আধুনিক বিবেচনায় পাঁচ হাজার লোক অধ্যুষিত স্থানকে শহর বলা হয়। এভাবেই সেই সময়ে মুগল থানাকে কেন্দ্র

---

৯. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (7th edition), Oxford University Press, 2005, p. 266
১০. *Ibid.*
১১. *Report on the Census of Bengal*, 1901, Vol. 6, part 1, p. 27
১২. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (7th edition), *Ibid.*, p. 800
১৩. M.S. Islam, 1981, 'Life in the Mufassal Towns of Nineteenth Century Bengal', Kenneth Ballhatchet and John Harrison (eds.), *The City in South Asia: Pre Modern and Modern, London*, p. 226; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, পৃ. ৩৬
১৪. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ*, পৃ. ৩৬
১৫. Ahmad Hasan Dani, 1956, *Dacca- A Record of its Changing Fortunes*, The Saogat Press, Dacca, P. 8
১৬. রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ও আলোচনার জন্য দেখুন, Charles Stewart, 1847, *History of Bengal*, Black Pary & Co., London, pp. 131-37; James Tylor, *Topography of Dacca*, ibid., p. 94; Abdul Karim, 1964, *Dacca The Mughal Capital*, Asiatic Society of Pakistan, Asiatic Press, pp. 9-14; Mirza Nathan, 1936, *Baharistan-I-Ghaibi*, (tr. MI Borah), Vol. I, Government of Assam, p. 70, 74, 75 & 76; W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, ibid, vol. V, p. 67; শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ২০০৬, *ঢাকার ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, তৃতীয় সংস্করণ, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

করে ঢাকা 'শহর' হিসাবে গড়ে ওঠে।[১৭] তাই আবদুল করিম বলেন, 'With the establishment of a Muhgal *thana* the place turned into a town.'[১৮]। সব শহরের বিকাশে প্রশাসনিক কেন্দ্র একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ঢাকা বাংলার মুগল প্রশাসনের কেন্দ্র হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[১৯] ফলে দ্রুত তার বিকাশ ঘটে। ১৯০১ সালে একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলায় সর্বমোট ১৯৯টি শহর ছিল। সেগুলির মধ্যে ১৯০টি ব্রিটিশ টেরিটরির মধ্যে বাকী ৯টি নেটিভ স্টেটস (Native States) এর মধ্যে।[২০]

## ঢাকা শহরের প্রসার বা পারিসরিক বৃদ্ধি

প্রাক-মুগল আমলে ঢাকার অবস্থান পশ্চিমে বাবুবাজার থেকে পূর্বে সদর ঘাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুগল থানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন পর্যন্ত শহরের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ঢাকা হিন্দু শাসনামলে জনবসতিপূর্ণ ছিল কিন্তু তৎকালীন ঢাকার পরিধি বা বিস্তৃতি সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না। তবে প্রাক-মুগল আমল থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ঢাকার বিস্তৃতি সহজে আলাদা করা যায়। তাই হাকীম হাবীবুর রহমান বলেন মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় সুলতানি আমলে (তুর্কি, পাঠান, সৈয়দ এবং স্থানীয় নওমুসলিম সুলতানগণের শাসনামল) আমরা ঢাকাকে জনবসতিপূর্ণ দেখি। উক্ত সুলতানদের ঢাকা থেকে মুগলদের ঢাকা এবং মুগলদের থেকে কোম্পানি আমলের ঢাকাকে সহজে পৃথক করা যায়।[২১] আবদুল করিম ঢাকা শহরের প্রসারের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা বলেন। যেমন: (ক) মুগল প্রশাসকগণ এবং তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজন সমূহ; (খ) বাঙ্গালি পেশাজীবী, মিস্ত্রি ও কারিগর শ্রেণি এবং (গ) ইউরোপীয় কোম্পানিসহ বিদেশি বণিক শ্রেণি।[২২]

## প্রাক-মুগল বা সুলতানি আমল

বুড়িগঙ্গার বাম তীরে (উত্তর) বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ নিয়েই গড়ে ওঠে প্রাক-মুগল ঢাকা। সুলতানি আমলে ঢাকা শহরের পূর্ব সীমা ছিল দোলাই খাল বা নদী যা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত। এ খালের এক অংশ শহরের মধ্যে বর্তমান ইংলিশ রোড পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। ইংলিশ রোড পর্যন্ত খালটি যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল এবং প্রকৃতই নদীর মতো দেখাত। অতঃপর ইংলিশ রোড থেকে খালটি কোথাও চওড়া কোথাও সরু

---

১৭. Abdul Karim, 1964, *Dacca The Mughal Capital*, p. 28
১৮. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, ibid., p. 48
১৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮
২০. *Census Report of Bengal*, 1901, ibid, p. 27
২১. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ২১
২২. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, ibid., p. 47-8

*Dhaka University Institutional Repository*

হয়ে বংশাল, নাজিরা বাজার, মিরনের কেল্লা, সিক্কাটুলী, আমানাত খালের দেউড়ি হয়ে চাঁদখাঁর পুলের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হোসেনী দালানের পূর্বে গিরদে কিল্লা এবং চুরিহাট্টার পিছন দিক দিয়ে রহমতগঞ্জের শেষে পশ্চিম সীমায় বুড়িগঙ্গায় পড়ত। বুড়িগঙ্গা ও উক্ত খালের মধ্যবর্তী অঞ্চল পুরাতন শহর বা সুলতানি আমলের ঢাকা। কেননা এই অংশে সমস্ত পাঠানী স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। যেমনঃ বিনত বিবির মসজিদ। উত্তর দিকে পাঠানদের শহর কতদূর ছিল তা বলা কঠিন কিন্তু স্থানীয় একটি বর্ণনা অনুযায়ী খিলগাঁও পর্যন্ত জনবসতি ছিল। হযরত শাহ নেয়ামাতুল্লাহ বুতশিকন এবং হযরত চিস্তি বেহেস্তির মাজার এবং গম্বুজ ঐ সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।[২৩] আহমদ হাসান দানী প্রাক-মুগল বা সুলতানি আমলে ঢাকার পরিধি সম্পর্কে হাকীম হাবীবুর রহমানকে উদ্ধৃত করে বলেন, "Dacca of the Pathans (i.e., Pre-Mughal) really stretched from Masandi (correctly Maveshi-mandi-cattle market) northward to Pandu river, and on the west crossing Fulbaria to Chandnighat. The inside boundary was, on the east, Dulai river, on the south, the branch of the Dulai river, which coming to Bangsal passes under the bridges of Srichak and Chand Khan and through Bakhshibazar, and falls into the Buriganga east of the Chandnighat. This was also the western boundary."[২৪] অর্থাৎ সুলতানি আমলে ঢাকা শহর বুড়িঙ্গার উত্তর পাড়ে সদরঘাট থেকে দুই দিকে সমদূরত্বে চার মাইল বিস্তৃত ছিল।[২৫] পুরাতন ঢাকার বিস্তৃতি সম্পর্কে হৃদয়নাথ মজুমদার বলেন, 'The Khal known as the Baboo's Bazar Khal divides the town into two halves. The older portion of the town was to the west and the north of this Khal.'[২৬]

আবদুল করিম ঢাকা শহরের জনপথগুলির বিশ্লেষণ করে পুরাতন ঢাকা, মুগল ঢাকা ও কোম্পানি আমলে ঢাকার ক্রমবিকাশ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি মির্জা নাথানের পুরাতন ঢাকা এবং পরবর্তী পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য যেসব অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করেন তা হলো: কলতাবাজার, বাংলাবাজার, গোবিন্দগঞ্জ (দয়াগঞ্জ), মোহনগঞ্জ, পাটুয়াটুলী, সূত্রাপুর, নারায়িনদিয়া (নারিন্দা), তাঁতিবাজার, জালুয়ানগর, গোয়ালনগর, শাঁখারি বাজার, কামারনগর, কুমারটুলী, রায়সাহেব বাজার, লক্ষীবাজার, ছুতারনগর, আলমগঞ্জ, পোস্তগোলা, রুকনপুর, বানিয়ানগর ও ফ্রেঞ্চগঞ্জ (ফরাশগঞ্জ)। এগুলি অমুসলিম বা অমুগল জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ত। অধিকাংশ স্থান হিন্দু পেশাজীবী এবং শিল্পীশ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন: টুয়া, সুতার, তাঁতি, জেলে, বানিয়া, গোয়ালা, শাঁখারি,

---

[২৩]. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ২১-২

[২৪]. Hakim Habibur Rahman, *Asudgan-i-Dacca*, Introduction, p. 12; *Dhaka aj se pachas baras pahle*, Lahore, 1949, p. 12 op. cit. Ahmad Hasan Dani, *DHAKA- A Record if its Changing Fortunes*, Abdul Momin Chowdhury (ed.), Asiatic Society of Bangladesh, (3rd revised edition 2009), Dhaka, p. 23

[২৫]. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ৮

[২৬]. Hridayanath Majumder, 1926, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, p. 2

*Dhaka University Institutional Repository*

কামার ও কুমার। কিন্তু একই সাথে এ সকল স্থানের নামের শেষে বাজার, গঞ্জ, পুর, তলী, টালী, টুলী ও নগর শব্দ সংযুক্তি প্রমাণ করে এ সব স্থানের উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম যুগে।[২৭]

উৎস: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৯৩

## মুগল আমল

মুগল শহরের বিস্তার হয়েছিল মূলত দুর্গের পশ্চিম দিকে এবং নদীর তীর বরাবর মুগল বসতি বর্ধিত হয়েছিল শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে জাফরাবাদ-মিরপুর এলাকা পর্যন্ত। মুগল আমলে ইসলাম খাঁ, আওরঙ্গজেব ও শায়েস্তা খানের সময় ঢাকা শহর সবচেয়ে বেশি প্রসারতা লাভ করে। ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর প্রশাসনিক প্রয়োজনে এবং সরকারি কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে শহরের সম্প্রসারণ ঘটে। সুবাদার, দিউয়ান, বখশি ও অন্যান্য রাজকীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে আনুমানিক ৫০,০০০ সামরিক ও বেসামরিক লোকের জন্য বিশাল সংস্থাপনার পাশাপাশি ভূমির প্রয়োজন ছিল। সরকারি সংস্থাপনা ছাড়াও মুগল আমলে ঢাকা

[২৭]. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, pp. 42-3, 45; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৫

*Dhaka University Institutional Repository*

শহর বিকাশের পিছনে আরো দুটি উপাদান রয়েছে- ভূ-সম্পত্তি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ।[২৮] ইসলাম খানের রাজধানী স্থাপন এবং পশ্চিমদিকে পরবর্তী সম্প্রসারিত হওয়ার জন্য আবদুল করিম যেসব জনপথের কথা উল্লেখ করেন- চকবাজার, মনোহরখান বাজার (মুনওয়ার খান বাজার), কেল্লিয়া বাজার (কেল্লাবাজার, লালবাগ), বংশীবাজার, বক্শীবাজার, দেওয়ান বাজার, বাজার মীরমুরাদ, এনায়েতগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ, রহমতগঞ্জ, বুরানগঞ্জ (চাঁদনী ঘাট), সোয়ারীঘাট, ইসলামপুর, নবাবপুর, নিমতলী, ঢাকেশ্বরী, লালবাগ, পূর্ব দরওয়াজা (ইসলাম খানের দুর্গের পূর্ব দিকের ফকট-এখন এখানে আধুনিক কারাগার), ফুলবাড়িয়া, ফুলমান্দি, আজিমপুর, পাকুরতলী, নবাবগঞ্জ, নবাববাগিচা, হাজারীবাগ, জাফরাবাদ, আতিশখানা, মোগলটুলী, চৌধুরী বাজার, ইমামগঞ্জ, মালীটোলা, মাহুতটুলী, কায়েতটুলী, পিলখানা, মিরপুর। শব্দের শেষে সংযুক্ত বাজার, গঞ্জ, বাগ, বাগিচা, টালী, টুলী, পুরা, মণ্ডি ও খানা মুগল যা মুসলিম আমলে উৎপত্তির ইঙ্গিত বহন করে।[২৯] এর সাথে কেদারনাথ মজুমদার, বাজার করতলব খান (বেগমবাজার) ও আমলীগোলা (আমীরগোলা বা আমীরগঞ্জ) দু'টি জনপথের সংযুক্ত করেন।[৩০]

[২৮]. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, p. 29

[২৯]. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, p. 42-5; ঢাকার বিকাশ ও সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত হওয়ার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮

[৩০]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৫

*Dhaka University Institutional Repository*

উৎস: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৯৪

## কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমল

১৭১৭ সালে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে ঢাকার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ঢাকা হয়ে ওঠে নায়েব নাজিমের আস্তানা এবং পূর্ববাংলার মুগল সামরিক ও নৌ বাহিনীর সদর দপ্তর। তবে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড তখনও ঢাকাকে জীবিত রাখে, যদিও তার পারিসরিক কোনো বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দীউয়ানি লাভ করার পর ঢাকার পতন শুরু হয়। যদিও প্রাদেশিক বিচার বিভাগ ও আপিল দপ্তর ঢাকাতেই ছিল তথাপি ১৮২৮ সাল নাগাদ নগরটি শুধু একটি জেলা সদরে পরিণত হয়। আঠারো শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে সূতিবস্ত্র বাণিজ্যের পতন হলে শহরটির জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে অধিকাংশ মুগল শহরই হয় পরিত্যক্ত নয় জঙ্গলাকীর্ণ হয়। ঢাকা হয়ে ওঠে সংকুচিত। একদা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হয় লোকশূন্য। ১৮৫৯ সালে প্রস্তুতকৃত একটি মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে, এ সময় ঢাকা শহরটি দৈর্ঘ্যে সোয়া তিন মাইলের সামান্য বেশি এবং প্রস্থে সোয়া এক মাইলের মতো জায়গা দখল করে আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিকে (১৭৮৬ ও ১৮০০) শহরের সীমানা ছিল– দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গী, পশ্চিমে জাফরাবাদ, মিরপুর এবং পূর্বে পোস্তগোলা। এসময় বাজার ধনকোরয়া, ফ্রেঞ্চগঞ্জ, তেজগাঁও, ওলন্দাজ দেউড়ি, মানিকচাঁন্দ গার্ডেন, বেকুন গার্ডেন, বোস গার্ডেন, ফেন্স গার্ডেন, ইংলিশ গার্ডেন গড়ে ওঠে।[৩১]

[৩১]. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, p. 42-3

*Dhaka University Institutional Repository*

উৎস: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৯৫

তবে আবদুল করিমের বর্ণনায় অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। কারণ অনেক জনবসতির নাম পাওয়া যায় না। তাই তিনি বলেন ১৭৯০-৯১ সালে কলকাতার *বোর্ড অব রেভেনিউ* এর কাছে ঢাকার কালেক্টররা যেসব হাট-বাজার ও গঞ্জের নাম তাদের পত্রে উল্লেখ করেছেন শুধু সেগুলি জানা যায়।[৩২] সেজন্য তাঁর বর্ণনায় শাহবাগ, তোপখানা, পল্টন, মতিঝিল, টুঙ্গী প্রভৃতির কথা উল্লেখ নেই। আর ওয়ারী, গেণ্ডারিয়া, শান্তিনগর, সেগুনবাগিচা, স্বামীবাগ, টিকাটুলী ইত্যাদি হাকীম হাবীবুর রহমানের (১৮৮১-১৯৪৭) জীবতকালে জনবসতিপূর্ণ হয়েছে।[৩৩] ১৮৪০ সালে জেমস টেলর তাঁর গ্রন্থে বলেন, ঢাকা জেলা দশটি থানা নিয়ে গঠিত যার আয়তন উনচল্লিশ বর্গমাইল। যে অংশটি নিয়ে ঢাকা শহর গঠিত ছিল তা কেবল নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ। শহরটি দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে প্রায় সোয়া এক মাইল।[৩৪]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকার ভাগ্য খুলে যায় যখন একে নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়। মুসা খান মসজিদ এর উত্তর পূর্বে বাগ-ই-বাদশাহী এলাকায় লর্ড কার্জন কর্তৃক কার্জন হল নির্মাণের

---

৩২. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, p. 42
৩৩. হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ২২
৩৪. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 86

*Dhaka University Institutional Repository*

মাধ্যমে ১৯০৪ সালে 'নতুন ঢাকা'র অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯০৬ সালের মধ্যে ঢাকা পৌরসভার আয়তন ছিল ৬.১৫ বর্গমাইল।[৩৫]

উৎস: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ১৯৬

## পতনমুখী ঢাকা শহর

মুগল আমলে সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার কারণে ঢাকার অতি দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে। নবনিযুক্ত সুবাদার মুর্শিদকুলী খান বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তবে এতে শহরের তেমন কোন একটা মর্যাদাহানি হয় নি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর ঢাকার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বাংলার রাজধানী হিসাবে কলকাতা হয়ে ওঠে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ১৭৬৮-৬৯ সালে ঢাকায় মুগল

[৩৫]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৬৮

*Dhaka University Institutional Repository*

নৌবাহিনীর দপ্তর ও অন্যান্য সংস্থাপনাও বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। মুগল আমলারা ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে চলে যাবার সময় তাদের সাথে শ্রমিক শ্রেণিও চলে যায়। ১৭৮৭ সাল থেকে পূর্বের ঢাকা-নিয়াবতের (ঢাকা আঞ্চলিক প্রদেশ) বেশ কিছু এলাকা পৃথক করে ছোট ছোট জেলার সৃষ্টি করা হয়। ১৮২৮ সালের মধ্যে ঢাকা কেবলমাত্র একটি জেলা সদরে পরিণত হয়।

মুগল আমলে, শহরের অধিকাংশ প্রশাসনিক কাজকর্ম, যেমন- শান্তি, স্বাস্থ্যবিধি ও নৈতিক মনরক্ষা প্রভৃতির দায়িত্ব ছিল সরকারের। ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক পুর্নবিন্যাসের ফলে, শহর প্রশাসনের কর্মকর্তা মনোনীত হয়েছিলেন একজন ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট।[৩৬] এরপর থেকে ঢাকা শহরের পতন শুরু হয়। R. Palme Dutt এর বর্ণনাতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখেন, পুরানো জনাকীর্ণ শিল্প শহর যেমন, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট এবং এমনি ধরণের অনেক শহর মাত্র কয়েক বছরের আঘাতে জনশূন্য ও বিনষ্ট হয়ে যায়।[৩৭] অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের পর্যবেক্ষণও ব্যতিক্রম নয়। তিনি বলেন, মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তরের পরও ঢাকা বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও নিয়াবতের কেন্দ্র হিসাবে টিকে ছিল। কিন্তু কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে শাসনভার গ্রহণের পর ঢাকার ক্ষয় শুরু হয়।[৩৮]

মুগল আমলে সারা শহরব্যাপী ছিল ক্যানাল যা একদিকে যাতায়ত ও অন্যদিকে ময়লা নিষ্কাশনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করত। এসব ক্যানাল শহরের সৌন্দার্যও বৃদ্ধি করেছিল। তাই অনেকে ঢাকাকে ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এসব ক্যানেল ভরাট করে ফেলা হয় বা ভরাট হয়ে যায় ফলে ময়লা নিষ্কাশন এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।[৩৯] মুগল আমলে যে শহর গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সে শহরের জৌলুস হারিয়ে যায়। ঢাকা পরিণত হয় দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত একটি শহরে।[৪০] উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শহরের মোটামুটি ক্ষয় শুরু হয় এবং শহরের পরিধিও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ঢাকা খুব দ্রুত নোংরা, জঙ্গলময় ও অস্বাস্থ্যকর একটি শহরে পরিণত হয়। এসময় ঢাকা সম্পর্কে কলকাতার লর্ড বিশপ রেজিনাল্ড হেবারের অভিমত হলো- ঢাকা এখন প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ। এর বাণিজ্য যা ছিল, তা' থেকে ষাট ভাগ কমে গেছে, আর

---

৩৬. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৭

৩৭. R. Palme Dutt, 1970 (Second Indian edition), *India To-day*, Manisha Granthalaya (P.) Ltd., Calcutta, (1st published in England in 1940) p. 119; আরও দেখুন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২

৩৮. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১১

৩৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২২

৪০. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১২

*Dhaka University Institutional Repository*

চমৎকার সব অট্টালিকা, এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ জাহাঙ্গীরের দুর্গ, তাঁর তৈরি মসজিদ, এর প্রাচীন নবাবদের রাজপ্রাসাদসমূহ ডাচ, ফরাসি এবং পর্তুগিজদের ফ্যাক্টরি ও চার্চ এখন ধ্বংস প্রাপ্ত, জঙ্গলে গেছে ঢেকে।[৪১]

১৮২০-এর দিকে, ঢাকা অস্বাস্থ্যকর নোংরা পূতিময় জঞ্জাল জঙ্গলে ভরা এক শহরে পরিণত হয়।[৪২] লোকসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পায়। তাইফুরের মতে, শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবনতির ফলে ঢাকার লোকসংখ্যা কমতে থাকে। ১৭৬৫ সালে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪৫০০০০।[৪৩] ১৮০১ সালে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা হয় ২০০০০০।[৪৪] ১৮০০-১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের কারণে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পায়।[৪৫] কিন্তু ষাটের দশক থেকে পুনরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ১৮৬৩ সালে 'ঢাকা প্রকাশ' এ ঢাকা শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য ৪টি কারণকে দায়ী করা হয়। যেমনঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কসাইদের আস্তানা, বনজঙ্গল বৃদ্ধি এবং আবর্জনা। ব্রিটিশ আমলের ঢাকার ভয়াবহ অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় তৎকালীন ঢাকার সহকারী সিভিল সার্জন কাটক্লিফ ও কমিশনার সিম্পসনের দুটি রিপোর্টে। কোম্পানি আমল থেকেই ঢাকা তার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যে খ্যাত ছিল। জনৈক পর্যটকের ভাষায়, ঢাকা শহরের পূতিময় বুড়িগঙ্গায় দু'মাইল ভাটি থেকেই নাকে লাগতো।[৪৬] ১৮৩৮ সালে এক আদমশুমারিতে শহরতলিসহ ঢাকার জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৮,৬১০ জন। ১৮৪০ এর কাছাকাছি সময় ঢাকার পতন চূড়ান্ত হয় এবং পুরানো মুগল শহরের বেশির ভাগই পরিত্যক্ত অবস্থায় জঙ্গলে ঢেকে যায়।[৪৭]

## ঢাকা শহরের 'পতন' বলা যায়?

মুগল আমলে ঢাকা পরিণত হয় ছোট খাটো একটি কসমোপলিটান শহরে। মুগল আমল থেকে ঢাকা সব সময়ই থেকেছে পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রে এবং সব সময়ই পরিগণিত হয়েছে এ অঞ্চলের প্রধান শহর হিসাবে। যদিও বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে ঢাকায় এবং তা সরিয়ে নেয়াও হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হওয়ার জন্য শহর উজ্জিবীত হয়েছে। তাই প্রশাসনিক স্থানান্তর ঘটলে শহরের ম্রিয়মাণ

---

৪১. Reginald Heber, 1826, *A Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India*, from Calcutta to Bombay, London; উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৩

৪২. Walter Hamilton, 1828, *The East India Gazetteers,* Vol. I, 2nd edition, B. R. Publishing Corp., Delhi, (reprint 1984) P. 477 ; আরও দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৭

৪৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮

৪৪. *Census Report*, 1901, Ibid., p. 30

৪৫. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকায় বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৬৮

৪৬. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২২-৩

৪৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮

*Dhaka University Institutional Repository*

হয়েছে বটে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।[৪৮] শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন ১৮৬০-এর দশকের মধ্যে ঢাকা তার ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়কে পেছনে ফেলে আবারও নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করে।[৪৯] শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলতে চেয়েছেন ১৮৪০ সাল থেকে ঢাকার পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে। এ সালটি পুরানো ও নতুন যুগের মধ্যে এক বিভক্তি চিহ্নিত করে। এমনকি সেজন্য তিনি ১৮৪০ সালকে তাঁর গ্রন্থের শুরুর সময়কাল নির্ধারণ করেন।[৫০] এ সময় ঢাকা কলেজে ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এরপর স্থাপিত হয় পৌরসভা, গড়ে ওঠে নতুন নতুন স্কুল, দোকান-পাট ইত্যাদি। কিন্তু মুনতাসীর মামুন ঢাকার পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত আধ্যাপক শরীফ উদ্দীন আহমেদের উক্ত বিবৃতির সাথে একটু দ্বি-মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, ষাটের দশক থেকে ঢাকা শহরের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়, অন্তত বুদ্ধি বৃত্তিক ক্ষেত্রে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা পৌরসভা স্থাপন। শরীফ উদ্দীনও তাই উল্লেখ করেছেন। তবে, পৌরসভা শুধু নয়, মুদ্রণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। এ সময় সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, সভা সমিতি, স্কুল প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হতে থাকে যার চরম বিকাশ ঘটে ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে। ব্রাহ্ম আন্দোলন বিকশিত হয়, গ্রন্থ প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সংবাদপত্রেরও প্রকাশ ঘটে। ফলে মনোজগতের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পাট চাষের সম্প্রসারণ মধ্যবিত্তের বিকাশে সাহায্য করে। ব্যবসার পুনরুজ্জীবনও এ সময় লক্ষণীয়।[৫১] হৃদয়নাথ মজুমদার বলেন ১৮৬৪ সালে ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর ঢাকা শহর পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে।[৫২]

অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদের গ্রন্থটি ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ। তিনি ১৮৪০ সালকে ঢাকা শহরের চূড়ান্ত পতন বলে অভিহিত করেন এবং ১৮৬০ এর মধ্যে ঢাকা নতুনভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর এ মন্তব্যটি আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, শত বছরের ঐতিহ্য ও গৌরবমণ্ডিত একটি শহরকে '*পতন*' এর জন্য নির্দিষ্ট একটি সালকে চিহ্নিত করা প্রশ্নবিদ্ধ কাজ। দ্বিতীয়ত, কৌশলগত দিক দিয়ে, যে ঢাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, তা ১৮৬০ সালের অনেক পূর্বেই সরকারি বিভিন্ন প্রশাসনিক সদর দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত করা, শহরের পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য কমিটি গঠন এবং বিভিন্ন সংস্থাপনা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন ঢাকা শহরের পুনরুজ্জীবন হয়েছে ষাট থেকে সত্তর দশক বা এর মাঝামাঝি সময়ে। এক্ষেত্রে তিনি বুদ্ধি বৃত্তিক বিকাশ ও মুদ্রণ শিল্পের প্রসারতার উপর জোর দিয়েছেন। '*পুনরুজ্জীবন*' শব্দটি আপেক্ষিক এবং একটি চলমান প্রক্রিয়া। পণ্ডিতরা এ প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী কোন

---

৪৮. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮-৯
৪৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২
৫০. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫
৫১. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), প্রথম ভাগ, পৃ. ১২; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১২-৩
৫২. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৬-৭

*Dhaka University Institutional Repository*

কোন ঘটনাকে মাইলফলক হিসাবে নির্ধারণ করেন। সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু ঢাকাকে 'পতন' এবং সচ্ছল ঢাকাকে 'পুনরুজ্জীবন' বলা একটি বিতর্কিত বিষয়।

এখন দেখা যাক, কখন বা কেনো ঢাকা শহর ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু শহরে পতিত হল এবং সেখান থেকে কোন প্রক্রিয়ায় ঘুরে দাঁড়াল। সামগ্রিকভাবে দুটি কারণে ঢাকা শহরে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং বন-জঙ্গলে ঢেকে যায়। যথাঃ ব্রিটিশ নীতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

## ব্রিটিশ নীতি

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দেশিয় শিল্পের ধ্বংস শুরু হয় বিশেষত ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব যখন চূড়ান্ত রূপ নেয়। এসময় তারা ভারতবর্ষে বিলেতি পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য হিসাবে নীল চাষ শুরু করে। ব্রিটেনে ১৭৮১ সালে মসলিন বোনা শুরুর চার বছরের (১৭৮৫) মধ্যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সূতী-নির্মিত শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি আরম্ভ হয়। এ সময় থেকে ঢাকার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তীকালে এখানকার সুতা বা কাঁচামালের উপর শতকরা ৭৫ ভাগের মত অত্যাধিক পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলে ঢাকার মসলিন শিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। অবশেষে ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং ঢাকায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির পদও বাতিল করা হয় । ১৮২১ সালে বৃটেনে তৈরি করা সুতার প্রথম বড় চালান ভারতে আসে। ১৮২৮ সাল থেকেই এর প্রভাব তীব্রভাবে অত্র জেলায় অনুভূত হতে শুরু করে। কারণ এ সময় থেকে ব্রিটিশ পণ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে দেশি সুতার স্থান দখল করে নেয়। ফলে এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকল শ্রেণির অধিবাসীরা কাজ থেকে বঞ্চিত হয়।[৫৩] অন্যদিকে আঠারো শতকের শেষের দিকে বাংলায় নীল উৎপাদন মসলিন শিল্পের স্থান দখল করে নেয়। তাই জেমস টেলর বলেন, ইউরোপীয়দের দ্বারা এই জেলায় প্রবর্তিত একমাত্র বাণিজ্য দ্রব্য এবং যা' এখানকার শিল্প দ্রব্যের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করেছে বলে ধরে নেয়া যায়- তা'হলো নীল ও জাফরাণ। ১৮০০ সাল থেকে বৈদেশিক বাজারের জন্য এ দুটো রঙের চাষ করা হচ্ছিল।[৫৪] ১৮০১ সালে ঢাকা জেলায় দুটি নীল কারখানা ছিল। সোনারগাঁও এর পানাম নগরে কোম্পানির একটি নীলকুঠি ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নীল উৎপাদান ও রপ্তানির ব্যবসা ছিল রমরমা। ১৮৪০ সালে নীল কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩ এ। নীল চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ বিঘা। এতে নীল উৎপন্ন হত ২৫০০ মণ। রায়ত ও

---

৫৩. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 306
৫৪. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 307

*Dhaka University Institutional Repository*

কারখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য এ থেকে অর্থ আসে গড়ে বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা বা ৩০,০০০ পাউন্ড।[৫৫] ঢাকা শহরে উনিশ শতকে জেমস ওয়াইজ নামক একজন বিশিষ্ট নীলকর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তাঁর বিস্তৃত জমিদারি ছিল। ওয়াইজ ঘাট তাঁর নামানুসারেই করা হয়।[৫৬] নীল ও জাফরাণ কলকাতায় রপ্তানি করা হত।[৫৭] জমিদারগণের সঙ্গে সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিল্প দ্রব্যের দ্রুত হ্রাস এবং বিদেশি বাজারের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে নীল ও কুমকুম বা জাফরান চাষের প্রবর্তন- এসব কিছুই চাষাবাদের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কৃষি ও সাধারণ শ্রমের মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে। ১৮০৩ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ জেলার একটি পরগনায়, শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৮] ফলে ঢাকা শহরের বেকার মানুষ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে যা শহরের জনসংখ্যা হ্রাসে সহায়ক ছিল।

তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথমভাগে (১৮২৬) আসাম অঞ্চল ব্রিটিশদের অধীনস্ত হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও চা উৎপাদনকারীগণ নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের জন্য ঢাকা থেকে ব্যাপক সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক আসামে নিয়ে যান। এ প্রক্রিয়ায় বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতকারক, দর্জি, বই বাঁধাইকারক, তোষক বা গদি ও বালিশ প্রস্তুতের কারিগর প্রমুখ শ্রমজীবীরা ঢাকা থেকে আসামে অভিবাসন করে। এতে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছিল ব্রিটিশরা। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই তাদেরকে আসামে বসবাসের সুবিধাজনক স্থান নির্ধারণ করে দেন ও প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। অভিবাসী পেশাজীবীদের একটা বড় অংশ আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীতীরবর্তী জোড়হাট, নগাঁও এবং বরাক উপত্যকার শীলচর অঞ্চলে তাদের নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল। ঢাকা থেকে আগত পেশাজীবীদের এ নতুন বসতিই আসামে 'ঢাকাপট্টি' নামে পরিচিত হয়। এমনকি বর্তমানেও এ অঞ্চল ঢাকাপট্টি নামেই পরিচিত। আসাম অঞ্চলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ পেশাজীবীদের অভাব ছিল বলেই ব্রিটিশদের আর্থিক সহায়তায় সেখানে ঢাকাপট্টি নামে নতুন আবাসভূমি গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক আসাম বিজয়ের অনতিবিলম্বেই ১৮২৬ সালে জোড়হাট অঞ্চলে প্রথম ঢাকাপট্টি স্থাপিত হয়। সেখানকার চকবাজারে জনৈক গুলজার বেপারি 'সুলতান বেকারি' নামে একটি বিস্কুট তৈরির কারখানা স্থাপন করে এ প্রক্রিয়ার সূচনা করেন। এর ধারাবাহিকতায় আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে চা বাগান ও অন্যান্য প্রশাসনিক কেন্দ্রসমূহে যেখানে বিস্কুট ও অন্যান্য বিদেশি পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল সে সব স্থানে একাধিক বেকারি বা বিস্কুট তৈরির কারখানা স্থাপিত হতে থাকে। কেন্দ্রীয় আসামের নগাঁওয়ে গড়ে ওঠা নতুন গুরুত্বপূর্ণ শহরে দ্বিতীয় ঢাকাপট্টিটি স্থাপিত হয়। এ অঞ্চলে ঢাকাপট্টির প্রতিষ্ঠাতা জনৈক আমিরুদ্দিন বেপারি। ১৯০৫ সালে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি হলে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রতিষ্ঠার পথ ধরে বাংলা থেকে আসামে অভিবাসন প্রক্রিয়া নতুন গতি সঞ্চার করে। ১৯০৫ সাল থেকে শুরু হওয়া ঢাকা থেকে আসামে

---

[৫৫]. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 135-6

[৫৬]. *জেমস ওয়াইজ, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত), প্রথম ভাগ, পৃ. ১৩

[৫৭]. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 184

[৫৮]. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 305-6; শ্রমিকদের শ্রমের মজুরি বৃদ্ধির পরিসংখ্যানটি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

অভিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং তাদের অনেকেরই পেশা ছিল দোকানদারি এবং আয়ুর্বেদিক ঔষুধ বিক্রয়। তারা প্রায় সমগ্র আসামে 'সাধনা ঔষধালয়' নামে একাধিক বিপণি বা চেইনসপ স্থাপন করে। ঐই সকল বিপণির অনেকগুলি এখনও বর্তমান। উল্লেখ্য, বিশ শতকের প্রথমার্ধে আসাম সরকার আসামের আদিবাসী ও বাঙ্গালি অভিবাসীদের মধ্যে নানা কারণে যেন কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই লাইন প্রথা (Line System) প্রবর্তন করে। মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী এ লাইন প্রথার বিরোধিতা করেন।

## প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১৭৮১ সালে সারা বাংলায় এক মহামারির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। যা সিলেটেও পরিলক্ষিত হয়। ১৭৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিন্ডসে লিখেন, "বর্তমানে সিলেটে মহামারি চরম আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। জমিদার ও নায়েবদের অনেকে এ মহামারির কবলে প্রাণ হারিয়েছেন এবং অন্যরা একত্রে শহর ছেড়ে চলে গেছেন।"[৫৯] তাছাড়া ১৭৮৭-৮৮ সালে মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস একটানা প্রবল বৃষ্টির ফলে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়, গ্রামের মানুষ কলা গাছের ভেলায় বা বাঁশের তৈরি উচ্চমঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করে। আউশ ও আমন ফসল নষ্ট হয়। কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডে নভেম্বর মাসে পরিদর্শন শেষে লিখেছিলেন, "এ স্থানে দুঃখ দুর্দশার এরূপ দৃশ্য চোখে পড়েছে, যা তিনি সারা জীবনে কোথাও কখনো দেখেন নি। সমগ্র ভূভাগ সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হয়েছে; গ্রামাঞ্চলের কোথাও চাষাবাদের সামান্য চিহ্নও পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং অধিবাসীগণ পানির উপরে উচ্চমঞ্চে বসবাস করছে।"[৬০] প্রচণ্ডভাবে দুর্ভিক্ষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ১৭৮৭ সালের জুলাই মাসে শহরে খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছিল। খাদ্যদ্রব্যের দাম সাধারণ মৌসুম অপেক্ষা শতকরা ৩০০ থেকে ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শহরের ধনী অধিবাসীগণ যতটা সম্ভব শস্য সংগ্রহ ও জমা করার চেষ্টা করে এবং যে কোন দামে তা ক্রয় করে নিল। ১৭৮৮ সাল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই কয়েক হাজার লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মৃত্যু বরণ করল। এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত কোন সরবরাহ ঢাকাতে পাওয়া যায়নি; এপ্রিলে ৭২৫০ মণ চাল ঢাকায় আসে। কিন্তু তখন শহরে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় এবং তাতে ৭০০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। এর ফলে খুচরা বিক্রেতাদের বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এপ্রিলে দুর্ভিক্ষ সর্বাপেক্ষা চরম আকার ধারণ করে বলে প্রতীয়মান হয়। বিপুল সংখ্যক নিরন্ন মানুষ রাস্তা ঘাটে, শহরে ও তার আশপাশ

---

[৫৯]. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 334
[৬০]. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 301-2

*Dhaka University Institutional Repository*

এলাকায় মৃত্যুবরণ করে।[৬১] এছাড়াও ১৮১৭ সালে কলেরা মহামারি একই সময়ে ঢাকা জেলা, যশোর ও নাটোরে দেখা দেয়। কিন্তু মহামারিতে কত লোক মারা যায় সে তথ্য সংগ্রহ করতে টেলর সক্ষম হননি। ১৮২৫ সালে কলেরা মহামারিতে শহরে ৪২৭ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে।[৬২]

সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য শহরের নিম্নশ্রেণির মানুষ জীবিকার তাগিদে এবং বর্ধিষ্ণু শ্রম মজুরির জন্য শহর ছেড়ে গ্রামমুখী হয়। ফলে শহরের জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ঢাকা বন জঙ্গলে ছেঁয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪৫০০০০, ১৮০১ সালে ২০০,০০০ এবং ১৮৬৭ সালে ৫১৬৩৬।[৬৩] উনিশ শতকের শুরু থেকে ঢাকা শহরের নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। সুতরাং শহরের জনসংখ্যার হ্রাস পাওয়াকে শুধু পতন বলে অভিহিত করা যায় না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শহরের জন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ এরপর থেকে বিশেষত, ১৮৬৫ সাল থেকে ঢাকায় পাট চাষ ও পাট শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে[৬৪] এবং শহরের নোংরা পরিবেশও অনেকাংশে দূর হয়। ১৮৯১/৯৫ সালে ঢাকা জেলায় পাট চাষের আওতাধীন আবাদি জমির পরিমাণ ছিল শতকরা ১৮ ভাগ।[৬৫] উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপ ও আমেরিকাতে পাট কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারের ফলে কলকাতা থেকে পাটজাত কাঁচামালের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। নিম্নের পরিসংখ্যানটি তারই প্রমাণঃ

**সারণি ৪**

**Export of raw Jute in the 19th Century[৬৬]**

| Year | Quantity (in tons) | Value (in rupees) |
|---|---|---|
| 1828-29 | 18.2 | 620 |
| 1832-33 | 590 | -------- |
| 1836-37 | 8785 | 436667 |
| 1850-51 | 29140 | 1970715 |
| 1860-61 | 54822 | 4107453 |
| 1870-71 | 310000 | -------- |
| 1885-86 | 385435 | -------- |
| 1900-01 | 632434 | -------- |

৬১. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 302-3
৬২. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 335
৬৩. জনসংখ্যার পরিসংখ্যানটি আলোচ্য অধ্যায়ের 'অভিবাসন' অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
৬৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৩৩০
৬৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৩২
৬৬. Rakibuddin Ahmed, 1966, *The Progress of the Jute Industry and Trade (1855-1966)*, Pakistan Central Jute Committee, Dacca, P. 33

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৭৯-'৮০ সাল পর্যন্ত বাংলায় পাট কলের সংখ্যা ছিল ২২ এবং এতে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২৭০০০ জন। ১৯০০-০১ সালে মিলের সংখ্যা হয় ৩৬ এবং শ্রমিক ছিল ১১৪৮০০ জন।[৬৭] এ প্রেক্ষিতে শহরের লোকসংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। নির্ম্মল গুপ্তের উক্তিও পরোক্ষভাবে একথারই সত্যতা প্রমাণ করে। তিনি বলেন, "যদিও মসলিন শিল্পের অবনতির জন্য লোকসংখ্যা কমিয়া যায়। নীলচাষ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সেই স্থানে পাট চাষ শুরু হয়।"[৬৮] অন্যদিকে ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৪ ভাগ।[৬৯]

## পুনরুত্থান প্রক্রিয়া

ফিরিমঙ্গার বলেন ১৭৮০ সালের ১১ এপ্রিল রেগুলেশন দ্বারা ঢাকায় স্থাপন করা হয় মফস্বল দেওয়ানী আদালত।[৭০] ১৮০৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকাতে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য একটি *নেটিভ হাসপাতাল* প্রতিষ্ঠা করে। ১৮১৯ সালে একটি *লুনাটিক এসাইলাম* বা পাগলা গারদ স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া ১৮৩৯ সালের মধ্যে আরো একটি নেটিভ হাসপাতাল, একটি পাগলা গারদ, একটি জেল হাসপাতাল, একটি সামরিক হাসপাতাল ও একটি ঠিকাদানকারী বিভাগ স্থাপন করা হয়।[৭১]

১৮১৩ সালের ১৩ নং রেগুলেশন অনুযায়ী ১৮১৩ সালে ঢাকা শহরে চৌকিদারি বা নৈশ প্রহরী নিয়োগের প্রয়োজনে চৌকিদারি ট্যাক্স বসানো হয়। বলা হয় এ ব্যবস্থার মধ্যে খুব প্রাথমিক স্তরের পৌরশাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের বীজ নিহিত ছিল।[৭২] ১৮১৬ সালের ২২ নং রেগুলেশন এর মাধ্যমে চৌকিদারি ব্যবস্থাকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়। ১৮৩৭ সালের মধ্যে ১৫ নং অ্যাক্ট (Act xv of 1837) দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, চৌকিদারি করের একটি অংশ স্বাস্থ্য, রাস্তা মেরামত, রাস্তায় আলো সরবারহ ব্যবস্থা ও অন্যান্য উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে। এ কর প্রতি মাসে বাড়ি প্রতি দু'আনা থেকে দু'টাকা পর্যন্ত আদায় করা হবে। এটিই ছিল পৌরকাজ সম্পাদনের জন্য আরোপিত প্রথম কর, আর এ সময় থেকেই 'পৌর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়'।[৭৩]

---

৬৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২
৬৮. নির্ম্মল গুপ্ত, শ্রাবণ ১৩৬৬, *ঢাকার কথা*, আলিপুর, কলিকাতা, পৃ. ৬৯
৬৯. *Census Report of Bengal*, 1901, p. 70
৭০. The Regulation of 11th April, 1780, established Mufassal Diwani Adalats at Dacca. (Ven Walter Kelly Firminger (ed.), 1917, *The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company*, R. Cambray and Co., Calcutta, (reprinted 1969), p. cclxxxviii )
৭১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, পৃ. ৫৪
৭২. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৯
৭৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮১

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮২০ এর দশকে ম্যাজিস্ট্রেট ডজ ও ওয়াল্টারস ঢাকা শহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও যোগাযোগের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেয়।[৭৪]

উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ঢাকায় একটি আধুনিক ডাকঘর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮২৯ সালে বিভাগীয় কমিশনার পদসৃষ্টি করে ঢাকাকে ঢাকা বিভাগের সদর দপ্তর হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়। ১৮৩০ সাল থেকে ঢাকায় ১৮তম প্রকৌশলী বিভাগ খোলা হয়। আঞ্চলিক এক প্রশাসনিক সদর দপ্তর হিসাবে ঢাকা ১৮৩০ এর দশক থেকে এক নতুন জীবন শুরু করে। ১৮৪৪ সালে ঢাকাতে আবগারি বিভাগ করা হয়। ১৮৫০ এর দশকে ঢাকা পূর্বাঞ্চল জরিপ বিভাগের সদর দপ্তর নির্বাচিত হয়। ঢাকা জেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর এবং জেলা জজ আদালতও ছিল ঢাকা শহরে।[৭৫] ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি (১ জুন ১৮৪৫) ও রেলপথ নির্মাণের (১৮৫১) পর সাধারণ মানুষদের মুভমেন্টও বৃদ্ধি পায়।

১৮৩৫ সালে ঢাকা শহরে শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য একটি *Local Education Committee* বা স্থানীয় শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়।[৭৬] ১৮৪৬ সালে ঢাকায় প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ঢাকা ব্যাংক' স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 'ঢাকা নিউজ' কে উদ্ধৃত করে বলেন, ব্যাংকটি স্থাপিত হয় ১৮৪৮ সালে।[৭৭] ১৮৫৮ সালে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে টেলিগ্রাফ সংযোগ স্থাপন করা হয়। ১৮৬০ এর দশকে *ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব হসপিটাল*-এরও সদর দপ্তর হিসাবে ঢাকাকে নির্বাচিত করা হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম থেকেই একটি বড় আঞ্চলিক কারাগার স্থাপন করার জন্য ঢাকাকে নির্বাচিত করা হয়। দেওয়ান বাজারে অবস্থিত পুরানো মুগল দুর্গটিকে কারাগারে রূপান্তরিত করা হয় এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এটিকে ৮০০ জন কয়েদি রাখার উপযুক্ত করা হয়। বস্তুত এই জেলখানায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত গড়ে দৈনিক প্রায় ৫০০ জন কয়েদি অবস্থান করত। কার্যত অনেক দিন ধরে ঢাকা জেলখানা সমগ্র পূর্ব বাংলার অঘোষিত কেন্দ্রীয় কারাগার হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে। ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ফরিদপুর, সিলেট, ত্রিপুরা থেকে কয়েদিদেরকে ঢাকায় এনে রাখা হত। ১৮৬৯ সালে ঢাকাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে উন্নীত করা হয়।[৭৮]

---

৭৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৩

৭৫. ঢাকা কিভাবে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯-৬৪

৭৬. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৬

৭৭. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৪৪-৫

৭৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

## ঢাকা পৌরসভা

পূর্বেই পতনমুখী ঢাকা শহরের নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে ১৮১০ সালে ঢাকায় অবস্থানরত কিছু ইংরেজ কর্মচারী কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন, শহর ও আশ-পাশের অঞ্চলের উন্নতি সাধনে সরকারি কর্তৃত্বাধীন তাঁরা একটি কমিটি গঠন করতে চান।[৭৯] লর্ড মিন্টো এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও ঢাকায় নিযুক্ত বেশ কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট ব্যক্তিগতভাবে শহর পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগী ছিলেন। ১৮১৩ সালের দিকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ পদস্থ বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারীর অনুরোধে (বিশেষ করে ঢাকা প্রভিন্সিয়াল কোর্ট অব সার্কিটের জজ জন মিটফোর্ড) গঠন করেছিলেন একটি কমিটি, যার নাম ছিল- '*কমিটি ফর দি ইম্প্রুভমেন্ট অফ দি সিটি অফ ঢাকা অ্যান্ড আদার প্লেসেস ইমিডিয়েটলি অ্যাডজাসেন্ট টু দি সিটি*'। এর সদস্য ছিলেন মিটফোর্ড, অ্যাকটিং জজ ম্যাজিস্ট্রেট জন বর্দো এলিয়ট, কালেক্টর উইলিয়াম রেনেল এবং সার্জন ডা. ডেভিট টড। এই কমিটিই ছিলো এক হিসাবে ঢাকা পৌরসভার আদি রূপ।[৮০] ১৮২৩ সালে লর্ড আর্মহার্স্ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির যেসব শহরে নগর শুল্ক আদায় করা হচ্ছিলো সেসব শহরের জন্য বিশেষত ঢাকার জন্য '*কমিটি ফর দি ইম্প্রুভমেন্ট অফ দি সিটি অফ ঢাকা*' গঠন করেন। এ কমিটি ১৮২৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এর প্রাণ-পুরুষ ছিলেন দু'জন ম্যাজিস্ট্রেট- ড'জ (Charles) ও ওয়াল্টারস (Henry Walters)। ছয় বছর কমিটি নবাবপুরের রাস্তায় ইট বিছিয়েছিলো, স্থাপন করেছিলো রমনা রেসকোর্স, ক্যান্টনমেন্ট তেজগাঁও থেকে সরিয়ে এনেছিল পল্টনে, আর্মেনীটোলার বিল-ঝিল পরিষ্কার করেছিলো, উন্নয়ন করেছিলো চকবাজারের আর নির্মাণ করেছিল লোহারপুল। ১৮২৬ সালের দিকে কমিটি ঢাকা শহরকে পৌরসভার একটি রূপ দিয়েছিলো। এ সময় কমিটির অধীনে কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট, একজন সরকার, একজন করণিক, চারজন চাপরাশি, কুড়িজন গরু গাড়িওয়ালা এবং দশজন ঝাড়ুদার ছিল।[৮১] এছাড়া কমিটি আর বেশি কিছু করতে পারেনি। জনসাধারণের অসহযোগিতা ও অর্থের অভাবে কমিটির কর্মতৎপরতা হ্রাস এবং এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৮৩৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলের (Lower Province) শহরগুলিতে পৌর সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়।[৮২] এরই পরিপ্রেক্ষিতে '*কমিটি অফ ইম্প্রুভমেন্ট*' বিলুপ্তির এগারো বছর পর ১৮৪০ সালে কর্তৃপক্ষ ঢাকা শহরের জন্য '*মিউনিসিপ্যাল কমিটি*' বা '*ঢাকা কমিটি*' নামে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থাপন করেছিল একটি বাজার- 'কমিটিগঞ্জ বাজার'। এর সঙ্গে যোগা করা হয়েছিলো চৌকিদারি ফান্ড। এ কমিটি কোন আইন দ্বারা

---

৭৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৭
৮০. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৭
৮১. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৮
82. *Bengal Judicial Proceedings*, CIVI, 4, 27 December 1836, p. 217; উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭১

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেজন্য শহরের অধিবাসীদেরকে বাধ্য করার কোন বৈধ ক্ষমতা ছিল না। যা ছিল কমিটির প্রধান সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা। তাই ১৮৪২ সালে বাংলা সরকারের ১০ নং অ্যাক্ট (Bengal Act X of 1842) এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ঢাকা শহরের অধিবাসীকে পৌরসভা স্থাপন করার এবং নগরের ও জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায়ের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ দেয়।[৮৩] কমিটি ময়লা অপসারণ, সেতু নির্মাণ, সড়ক পাকা করা, পুকুর সংস্কার, লালবাগ দুর্গের সংস্কার, রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু মুসলমানদেরকে মৃতদেহ রাস্তার পাশে বা বাড়ির আঙ্গিনায় পুতে রাখা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। যা শহরের পরিবেশকে দূষিত করত। ফলে ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে শহরে জ্বর, বসন্ত ও কলেরা মহামারি আকারে দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে ১৮৫০ সালের ২৬ নং অ্যাক্ট (Act XXVI of 1850) ঢাকা শহরে প্রবর্তনের জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটির সেক্রেটারি আলেকজান্ডার ফোর্বস এবং ডাঃ ডব্লিউ. এ. গ্রীন (W. A. Green) এর উদ্যোগে কমিটি সরকারের কাছে ১৮৫২ সালের মে মাসে একটি আবেদন পত্র পাঠান।[৮৪] ২১ মে কমিটি জনসাধারণের সম্মতি বা প্রতিক্রিয়ার জানার জন্য ঢাকা কলেজ (১৮৪১) প্রাঙ্গনে এক জনসভার আহ্বান করে। এতে সাধারণ মানুষের এ আইনের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায়।[৮৫] কারণ এর পূর্বে সাধারণ মানুষদের ওপর কমিটি কর্তৃক আরোপিত কর-এর বোঝা ও কমিটির লোক কর্তৃক নাজেহাল হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৮৩৬ সালের ৯ জুলাই জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে যা ২৩ জুলাই 'ঢাকা প্রকাশে' ছাপা হয়। যাতে বলা হয় ২৬ আইনের পক্ষে বা বিপক্ষে সম্মতি জানানোর জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাচারিতে গিয়ে স্বাক্ষর করার জন্য।[৮৬] অবশেষে অনেক বাধা-বিপত্তি, বির্তক, প্রতিবন্ধকতার ইতিটেনে ২৬ আইনের কিছু সংশোধন করে ১৮৬৪ সালের ১ আগস্ট ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্ট ঢাকা'য় প্রবর্তন করে *'ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি'* প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৮৭] ১৮৮৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে মিউনিসিপ্যালটির সভাপতি ছিলেন। ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন ল্যাফেটেন্যান্ট গর্ভনর। ১৮৮৪ সালে বঙ্গীয় সরকার পৌরসভাগুলি জনগণের (শুধুমাত্র যারা রেট পেয়ার) নির্বাচিত সদস্য ও চেয়ারম্যান দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

পৌরসভা ঘোষণার পর ঢাকা শহরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত উন্নয়নকাজে গতি সঞ্চারিত হয়। ১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্বোধনের পরবর্তী এক দশকে সময়কালে

---

৮৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮৩

৮৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮৩

৮৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ জুন ১৮৬৩; শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮৩-৪; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৯, ৪৩-৪; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৭১

৮৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জুলাই ১৮৬৪; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৪৫

৮৭. *(Wooden Bundle) 'A'- Proceedings, Government of Bengal, Municipal Department*, Branch-Municipal, Serial No. 21, List-7, August 1890-February 1891; *'A'- Proceedings, Government of Bengal, Municipal Department*, Branch-Municipal, Serial No. 36, List-7, August 1905-August 1906; A.L. Clay, *Principal Heads of the History and Statistic of the Dacca Division*, ibid, p. 87; শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯৭; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২০

*Dhaka University Institutional Repository*

হাসপাতালটিতে প্রায় ১০,০০০ বহির্বিভাগীয় রোগীর চিকিৎসা করে। শ্রীঘ্রই হাসপাতালটি পূর্ববাংলার প্রধান চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং এই অঞ্চলের দূর-দূরান্তে বসবাসকারী লোকেরা এখানে চিকিৎসা লাভের জন্য আসতে থাকে। ১৮৭১ সালে দৈনিক গড়ে বহির্বিভাগীয় রোগী ছিল শতকরা ৫৭.৪২ এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে চিকিৎসা নিত শতকরা ৫৮.২৯।[৮৮] ১৮৭০ এর দশকে ঢাকা পূর্ব বাংলার *সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব ভ্যাক্সিনেশন* এর সদর দপ্তর নির্বাচিত হয়। ১৮৭৪ সালের আগস্ট মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক ঢাকায় জলের কলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৭৭ সালে নবাব স্যার আবদুল গণি বাহাদুর K.C.S.I উপাধি অর্জন করলে, নবাব স্যার আসানউল্লাহ বাহাদুর তাঁর স্মরণার্থে ঢাকা নগরে আলোক প্রদান করতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯০১ সালে ঢাকা শহরে বৈদ্যুতিক আলো বা বিজলি বাতির বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৮০ সালে খোলা হয় 'ঢাকা লোন অফিস'। ১৮৮২ সালে ঢাকা-ময়মনসিংহ স্টেট রেল লাইনটির কাজ শুরু হয়। ১৮৮৫ সালের মধ্যে ঢাকা-নরায়ণগঞ্জের মধ্যে সর্বপ্রথম যাত্রীবাহী রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়। ১৮৮৬ সালে জয়দেবপুর-ঢাকা, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল চালু হয়। ১৮৮৬ সালের ১লা অক্টোবর ঢাকা জেলায় 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন' প্রবর্তিত হয়। বিভিন্ন অফিস, আদালত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংযুক্তির ফলে ১৮৮৫ সালের মধ্যেই ঢাকা, কলকাতার পরেই বাংলা প্রদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হয়।

১৮৪৭ সালের পর থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যবহার ও অনেক গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটে। ফলে বুদ্ধি বৃত্তিক উন্নয়নও ঘটে। নিম্নে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৮৪৭-১৯০৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:[৮৯]

**সারণি ৫**

| নাম | প্রকৃতি | ১৮৪৭-৬০ | ১৮৬১-৭০ | ১৮৭১-৮০ | ১৮৮১-৯০ | ১৮৯১-১৯০৫ | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সংবাদপত্র | সাপ্তাহিক | ১ | ৫ | ৫ | ৯ | ১ | ২১ |
| | পাক্ষিক | | ১ | ১ | | | ২ |
| | সপ্তাহে দু'দিন | | ১ | | | | ১ |
| সাময়িকপত্র | মাসিক | ৪ | ৮ | ১০ | ১৫ | ১১ | ৪৮ |
| | পাক্ষিক | | ১ | | ১ | ১ | ৩ |

[৮৮]. W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. v, p. 149; শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৫

[৮৯]. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, পৃ. ২৪৩-৪৪

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সাপ্তাহিক | | | | ১ | | ১ |

**নিম্নবর্গের সমাবেশ**

আলোচ্য অধ্যায়ে 'সমাবেশ' বলতে রাজনৈতিক মিটিং, মিছিল ও সভা-সমাবেশকে বোঝানো হয় নি। বরং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকা শহরে নিম্নবর্গের আগমন এবং বসতি স্থাপনের বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। ঢাকা শহরে নিম্নবর্গের সমাবেশ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দু'ভাবে ঘটেছে। অথার্ৎ, যে সকল নিম্নশ্রেণির মানুষ চৌদ্দ পুরুষ ধরে ঢাকা শহরে বাস করে আসছে তারা প্রাকৃতিকগতভাবে সমাবেশ ঘটিয়েছে। যেমনঃ আবদুল করিম বলেন, তাঁতি, শাঁখারিরা ঢাকার পুরানো বাসিন্দা। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ধর্মীয় যাত্রা, বাণিজ্য ও জীবিকার তাগিদে যারা ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা এবং বর্তমান ভারতের কয়েকটি জেলা থেকে স্ব-ইচ্ছায় বা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নিয়ে এসেছেন তারা অপ্রাকৃতিকভাবে সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

মুসলমানদের আগমনের অথবা বসবাসের পূর্বে এ শহরের প্রকৃত বাসিন্দা ছিল সাহু, তাঁতি, বেনে এবং শাঁখারি। এরা নিজ নিজ মহল্লায় বাস করত। যেমনঃ সাহুদের কেন্দ্র জালুয়ানগর, তাঁতিদের আবাস ছিল তাঁতিবাজার, নবাবপুর এবং বনগাঁ; শাঁখারিরা সব সময়ের জন্য শাঁখারি বাজারই ছিল যেখানে আজও আছে। মুর্শিদকুলী খান পর্যন্ত এই রেওয়াজ ছিল যে, আগ্রা এবং দিল্লি থেকে যখন কোন গভর্নর আসতেন তিনি নিজের সঙ্গে এক বিরাট দল এবং লস্কর নিয়ে আসতেন। যেমনঃ সুবাদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে সৈন্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়ে মোট ৫০-৬০ হাজার লোক আসেন।[৯০] কিন্তু যখন তারা ফিরে যেতেন তখন আগত লোক লস্করের এক বিরাট অংশ বাংলার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে এখানেই থেকে যেত। এই থেকে যাওয়াদের মধ্যে হিন্দু কম এবং মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠী এবং পেশার লোক থাকত।[৯১] রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে মুগল প্রশাসকগণ বাবুবাজার থেকে পশ্চিম দিকে শহর সম্প্রসারিত করে। অন্যদিকে শহরের বিকাশমান গুরুত্বের কারণে শিল্পী, মিস্ত্রি, কারিগর ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির দৃষ্টি শহরের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তারা পূর্বদিকে শহরের সম্প্রসারণ ঘটায়।[৯২] পর্তুগিজ পরিব্রাজক সেবাস্টিয়ান ম্যানরিকের (Sebastian Manrique, 1640) বর্ণনায় পাওয়া যায়, এ শহরে বিভিন্ন পণ্যের ব্যাপক ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুবিধা থাকার কারণে বহু বিচিত্র জাতির (Strange nations) ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ভিড় জমাতো। দিন মজুররা বেশি বেতনের জন্য ঢাকার প্রতি

---

৯০. আবদুল করিম সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা (*Tuzuk-I-Jahangiri*) এবং মির্জা নাথানের রচিত '*বাহারিস্তান-ই-গায়েবী*' এ উল্লিখিত সুবাদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে আগত সৈন্য, অফিসার, কর্মচারী প্রমুখের সংখ্যা নির্ধারণ করেন ৫০-৬০ হাজার, Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, pp. 90-1

৯১. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭১৮; হাকীম হাবীবুর রহমান, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে*, পৃ. ২৩

৯২. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, p. 47

*Dhaka University Institutional Repository*

আকৃষ্ট হত।[৯৩] তাছাড়া শিল্পকেন্দ্র হিসাবে ঢাকার খ্যাতি সুপ্রাচীন। বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প। আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকার সূতা উৎপাদন ও মসলিনের ব্যাপক কদর ছিল। এই শিল্প নগরীতে বহু মানুষ এসে বসবাস শুরু করে এবং তারা শিল্প কর্মে জড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, শহরের আয়তনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সোনারগাঁও এবং কাপাসিয়ার সুদক্ষ কারিগররা এসে ঢাকায় সমবেত হয়। তাছাড়া মানুষের গ্রাম ত্যাগের অন্যতম দুটি কারণ হলো- জমিদারদের অত্যাচার এবং দস্যু তস্করদের উপদ্রব।[৯৪]

অপ্রাকৃতিকভাবে নিম্নবর্গের সমাবেশ কিভাবে হলো তা বোঝার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, ঢাকা বিভাগ ও জেলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা জানা প্রয়োজন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠন করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে কলকাতাতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিককাল থেকে ঢাকা শহরের সাথে নবগঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির যোগাযোগ ছিল বিশেষত নদী পথে। সুতরাং নিম্নে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভৌগোলিক অবস্থান ও নদীসমূহের গতিপথ লক্ষ করলে ঢাকায় কিভাবে নিম্নবর্গের সমাবেশ ঘটেছে তা সহজে উপলব্ধি করা যাবে।

## বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি

ব্রিটিশ সরকার সমগ্র ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রেসিডেন্সি বা প্রদেশে বিভক্ত করে। এদের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে কয়েকটি অংশে এবং জেলায় বিভক্ত ছিল। যেমন[৯৫]ঃ

*পশ্চিমবঙ্গঃ* বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়।

*মধ্যবঙ্গঃ* ২৪ পরগনা, কলকাতা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর।

*উত্তরবঙ্গঃ* রাজশাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জেলিং, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদা, কুচবিহার, সিকিম।

*পূর্ববঙ্গঃ* খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা (Tippera), নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা (Hill Tippera)।

---

৯৩. Sebastian Manrique, 1926, *Travels of Fray Sebastian Manrique*, vol. I, Hakluyt Society, London, pp. 44-5 op. cit, by Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital*, p. 70

৯৪. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৫

৯৫. *Report on the Census of Bengal*, 1901, vol. 6, part 1, p. 146

*Dhaka University Institutional Repository*

*উত্তর বিহার*: শারন (Saran), চম্পারন (Champaran), মুজাফ্ফরপুর, দ্বারভাঙ্গা (Darbhanga), পূর্ণিয়া।

*দক্ষিণ বিহার*: পাটনা, গয়া, সাহাবাদ (Shahabad), মুঙ্গের (Monghyr)।

*উড়িষ্যা*: কটক (Cuttack), বালেশ্বর, পুরী (Puri)।

*ছোটনাগপুর*: হাজারিবাগ, রাঁচি (Ranchi), পালামৌ (Palamau), মানভূম (Manbhum), সাঁওতাল পরগনা, অঙ্গুল (Angul), ছোটনাগপুর করদমহল (Chota Nagpur Tributary States), উড়িষ্যা করদমহল (Orissa Tributary States)।

## পূর্ববঙ্গ ও ঢাকা জেলা

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ অঞ্চলটি সাধারণত পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব বাংলা নামেই পরিচিত ছিল। ঢাকা ছিল এই পূর্ব বাংলার প্রধান শহর। অতি পূর্বকালে ঢাকা জেলার উত্তর ভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ ভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। মহারাজ বল্লালসেনের সময় এ ভূখণ্ড 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। মুগল সম্রাট আকবরের সময় তাঁর রাজস্ব সচিব টোডরমল বাংলার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্ত করেন। টোডরমলের বন্দোবস্ত কাগজে ঢাকা জেলার দক্ষিণভাগ ও পূর্বভাগ 'সরকার সোনারগাঁও' এবং উত্তরভাগ 'সরকার বাজুহা'র অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হলে সরকার সোনারগাঁও এবং সরকার বাজুহা 'ঢাকা নেয়াবতের' অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্রমে জেলা স্থাপিত হলে তা 'ঢাকা জেলা' নামে অভিহিত হয়। জেলা স্থাপনের সময় এর আকার বর্তমান আকার অপেক্ষাও ৬ গুণ বৃহৎ ছিল। উল্লেখ্য, ১৭৮৭ সালের মধ্যে জেলা ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

ঢাকা জেলা পূর্ব বাংলার একটি প্রসিদ্ধ জেলা। এ জেলাটি উত্তরে নিরক্ষ ২৩°-১৪ ও ২৪°-২০ কলার মধ্যে এবং পূর্ব দ্রাঘিমা ৮৯°-৪৫ ও ৯০°-৫১ কলার মধ্যে অবস্থিত। এ জেলার উত্তর সীমায় ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব সীমায় ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণ সীমায় ফরিদপুর জেলা ও পশ্চিম সীমায় ফরিদপুর ও পাবনা জেলা। বৃহত্তর ঢাকা জেলা সাধারণত তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল- পূর্ব ঢাকা, মধ্য ঢাকা ও দক্ষিণ ঢাকা। মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার মধ্যবর্তী স্থান পূর্ব ঢাকা। শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্তী স্থান মধ্য ঢাকা। ধলেশ্বরী ও পদ্মার মধ্যবর্তী স্থান দক্ষিণ ঢাকা।[৯৬]

ঢাকার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা শহরের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল সড়ক ও নৌপথ। হান্টার ঢাকা জেলায় ১৬টি[৯৭] এবং জেমস টেলর ৯টি[৯৮] নদীর কথা উল্লেখ করেন। বৃহত্তর ঢাকা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত প্রধান

---

৯৬. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকায় বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৭১-২

৯৭. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. V, p. 20

৯৮. James Tylor, *Topography of Dacca*, pp. 9-13

*Dhaka University Institutional Repository*

চারটি নদ-নদী হচ্ছে: ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা ও যমুনা। এসব প্রধান নদ-নদী হতে উৎপন্ন হয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী। শ্রী কেদারনাথ মজুমদার নদীগুলির গতিপ্রবাহ যেভাবে নিরূপণ করেছেন তাহলো:[৯৯]

*ব্রহ্মপুত্র নদ:* ব্রহ্মপুত্র ময়মনসিংহ জেলা হতে এসে টোকচাঁদপুরের নিকট ঢাকা জেলার উত্তর সীমায় পড়েছে এবং সেখান থেকে পূর্বাভিমুখে চার মাইল এসে পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়ে আরও কতদূর অগ্রসর হয়ে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উত্তর সীমা রক্ষা করে পূর্বাভিমুখে গিয়েছে। রায়পুরা থানার পূর্বদিকে এসে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে।

*প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র:* ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত টোকচাঁদপুরের পূর্বদিকে এসে মহেশ্বরদী পরগনার মধ্য দিয়ে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করত দক্ষিণাভিমুখে এসে 'বাঙ্গলার' প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও-এর পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার নিকট ধলেশ্বরীর সাথে মিলিত হয়ে মেঘনায় পতিত হত। এর তীরে পঞ্চমীঘাট ও লাঙ্গলবন্ধ অবস্থিত।

*মেঘনা:* মেঘনা ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলার পূর্ব-উত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর উভয়ের সম্মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামেই পরিচিত থেকে ঢাকা জেলার পূর্বসীমা রক্ষা করে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। মেঘনাকে ঢাকা জেলার পূর্বসীমা বলা যেতে পারে। মেঘনার পূর্ব তীরে ত্রিপুরা জেলা। মেঘনা ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।

*পদ্মা:* পদ্মা, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে এসে ঢাকা জেলার পশ্চিমসীমায় যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। যমুনার সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা ঢাকা জেলার দক্ষিণসীমা রক্ষা করে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে ঢাকা জেলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণাভিমুখী হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

পূর্বে পদ্মা ফরিদপুর জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাখেরগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হত। পদ্মার এই প্রাচীন প্রবাহ বর্তমানে ময়নাকাটা ও আড়িয়াল খাঁ নামে পরিচিত।

*যমুনা:* যমুনা ব্রহ্মপুত্রের নতুন প্রবাহ। এই প্রবাহ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে ব্রহ্মপুত্র হতে বহির্গত হয়ে এসে ঢাকা জেলার পশ্চিম সীমায় পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। পদ্মা ও যমুনার এই মিলন স্থলের নাম বাইশ কোদালিয়ার মোহনা।

---

৯৯. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬১৩-১৫; এসব নদ-নদীর উৎপত্তি স্থল, প্রাচীন গতি-প্রবাহ ও শাখা নদী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন, যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫১-৮

*Dhaka University Institutional Repository*

*ধলেশ্বরী:* ধলেশ্বরী যমুনার একটি বৃহৎ শাখা। বর্তমান সময় ধলেশ্বরী যমুনার একটি শাখা হিসাবে পরিচিত হলেও এটি যমুনা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। যমুনার উৎপত্তির পূর্বে ধলেশ্বরী করতয়া ও আত্রাইর সম্মিলিত প্রবাহ হুরাসাগরের সাথে মিলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার উৎপত্তির পর থেকে করতয়ার সাথে ধলেশ্বরীর সম্বন্ধ ছিন্ন হয় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হতে যমুনার একটি শাখা এসে ধলেশ্বরীর সাথে মিলিত হয়ে ধলেশ্বরীকে যমুনার শাখারূপে পরিণত করে। ধলেশ্বরী ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণ হতে কোনাকোনিভাবে জেলার মধ্যভাগ দিয়ে এসে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মেঘনায় পড়েছে।

*বুড়িগঙ্গা ও শাখা-প্রশাখা:* বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা। সাভার থানার চার মাইল দক্ষিণে ধলেশ্বরী হতে উৎপন্ন হয়ে নারায়ণগঞ্জের চার মাইল পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পড়েছে। বুড়িগঙ্গা ছাব্বিশ মাইল দীর্ঘ এবং পাঁচ-ছয় মাইল প্রস্থ স্থানকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করেছিল যা পাড়জোয়ার নামে পরিচিত ছিল।
ইছামতী ধলেশ্বরীর আর একটি শাখা- সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হতে উৎপন্ন হয়ে মদনগঞ্জের পূর্বদিকে ধলেশ্বরীতে পড়েছে।

তুরাগ নদী ময়মনসিংহ জেলা হতে এসে বুড়িগঙ্গায় পড়েছে। টঙ্গী নদী তুরাগের শাখা। বংশাই ব্রহ্মপুত্রের শাখা- ময়মনসিংহ জেলা হতে এসে সাভারের নিকট ধলেশ্বরীতে পড়েছে। বুড়িগঙ্গা ও এর উৎস নদী ধলেশ্বরী অন্যান্য বড় বড় নদীর মাধ্যমে বাংলার প্রায় সবকটি জেলার সঙ্গে ঢাকার সংযোগ স্থাপন করেছে। ঢাকা ছিল *ভাটি'* (নদীবেষ্টিত নিম্নভূমির *বাঙ্গালাহ*) অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। আর এখানে কাজকর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক সুযোগ ছিল। এসব নদীপথ 'মুভমেন্ট অব ওয়ার্কিং' শ্রেণির মানুষদের যাতায়তকে সহজ করে দিয়েছে। নিম্নে বর্তমান বাংলাদেশের একটি মানচিত্র দেয়া হলো যা থেকে বোঝা যাবে নদীপথে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে ঢাকায় লোক সমাগমের স্বরূপঃ

*Dhaka University Institutional Repository*

মানচিত্র ৫

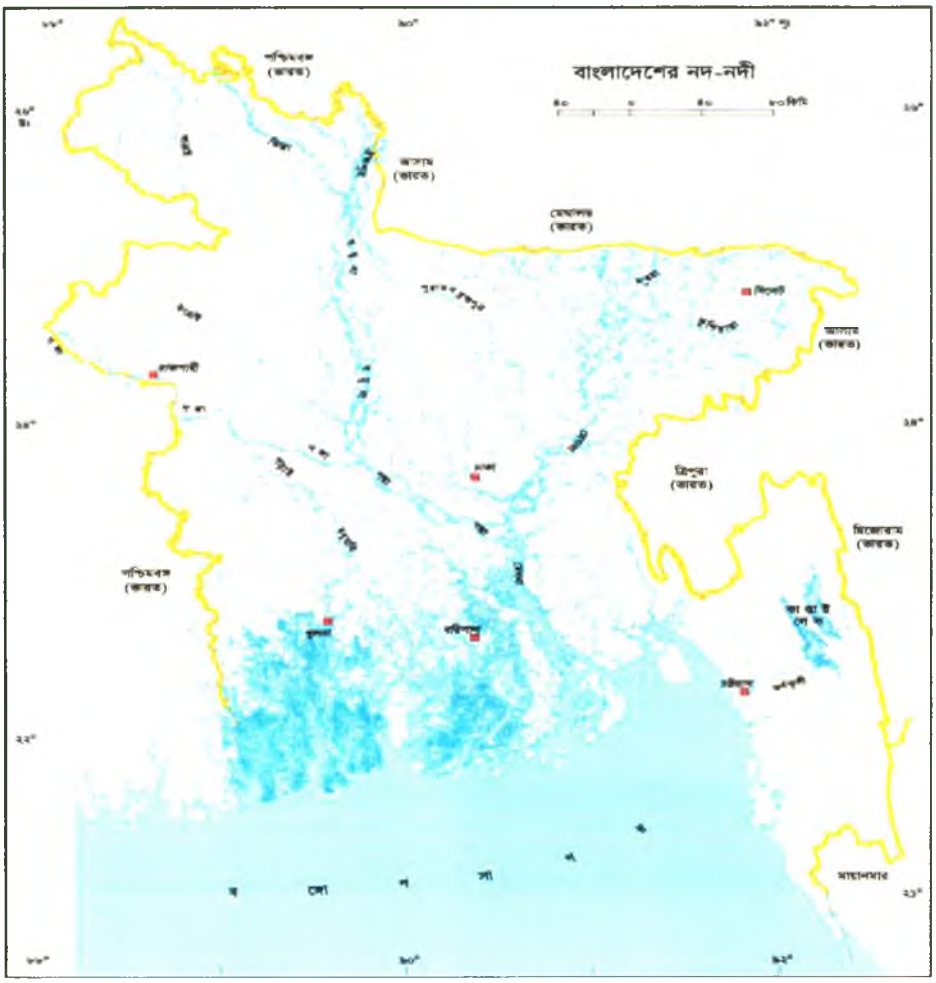


উৎস: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ. ৪৮৩

## অভিবাসন

ঢাকা জেলা ও শহরে অভিবাসন দু'ভাবে ঘটেছে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অঞ্চল (বিহার, উত্তর প্রদেশ, ভগলপুর, উড়িষ্যা, পূর্ণিয়া, ছোট নাগপুর প্রভৃতি) এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা (ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ, রাজশাহী,

*Dhaka University Institutional Repository*

নোয়াখালী প্রভৃতি) থেকে যারা ঢাকায় আগমন করে তাদেরকে বলা হয় 'emigration'। পক্ষান্তরে, যারা ঢাকা থেকে অন্যত্র চলে গেছে তাদেরকে বলা হয় 'immigration'। জেমস টেলর ও মি. ক্লে এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে কিছু দেশত্যাগী (emigrants) মানুষ ঢাকায় বসতি স্থাপন করে। বাংলার উত্তর-পশ্চিম জেলা (পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর) থেকে ৩০০ জন পথ-কুলি (street Coolies) প্রায় দেড় শতক ধরে ঢাকায় বাস করছে। তেজগাঁও এবং লালকুটি গ্রামে কিছু মনিপুরী পরিবার রয়েছে। নগর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ঢাকার বাইরে যেতে পারত না। এক কথায় কারাবন্দীদের মত জীবন-যাপন করত। কারণ এরা বিশৃঙ্গলা সৃষ্টি করত। বানওয়া (Banwa) কুলীরা নীল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। এরা বর্ধমান, বীরভূম ও ভগলপুরের পাহারি অঞ্চল থেকে এসেছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে স্থানীয়দের নিয়ে এসে ব্রিটিশরা পুলিশ, বরকন্দাজ, পিয়ন প্রভৃতি সরকারি বিভিন্ন পেশায় নিয়োগ করত। দেশিয় জমিদারদেরও দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করত।[১০০] ১৮৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, বাংলার অন্যান্য জেলার এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মোট ২৫৬৩৯ জন লোক তখন ঢাকায় বাস করত। এর মধ্যে ১০৪৪৮ জন এসেছিল আশে-পাশের জেলাগুলি থেকে; ১৬৯০ জন বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে; ৭০১০ জন বিহার, ১০৭ জন উড়িষ্যা, ২৫ জন ছোট নাগপুর এবং অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশ থেকে ৬৩৫৯ জন।[১০১] নবাবী আমলে বর্তমান ঢাকা জেলা (ঢাকাজেলা- বৃহত্তর ময়মনসিংহ, বাখেরগঞ্জ ও বর্তমান ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা নিয়ে গঠিত ছিল) বঙ্গোপসাগরের ১০০ মাইলের মধ্যে অবস্থানের কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘুর্ণিঝড়, শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্পে বার বার সঙ্কটে পড়েছে। ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হতে দরিদ্রপীড়িত মানুষ শহরমুখী হয়। ১৭৮৭-৮৮ সালে বৃষ্টি জনিত কারণে ফসল নষ্ট হয় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রামে মানুষ বাস করতে থাকে নৌকা ও ভেলায়। তারা চলে আসতে থাকে শহরে। শহরের লঙ্গরখানায় দৈনিক ১০ হাজার আশ্রয় গহণকারীকে খাবার দেয়া হলেও, অনেকে অনাহারে মারা পড়ে।[১০২] পাট শিল্প বিকাশের সাথে সাথেও ঢাকাতে নিম্নবর্গের সমাবেশ ঘটে। ১৯০১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদনে বলা হয়, 'The jute industry attracts numerous natives of Biharand the United Provinces, and many of the domestic servants, Street Coolies, Palki-bearers, etc. also come from up-conutry'।[১০৩] ঢাকা পৌরসভার ময়লা পরিষ্কারের কাজকে ভাল চোখে দেখা হত না। তাই স্থানীয় অধিবাসীরা এ কাজ করত না। ধাঙড়, মেথর, ডোম অন্যত্র থেকে নিয়ে আসা

---

[১০০]. James Tylor, Topography of Dacca, p. 241-2, 311; A.L. Clay, *Principal Heads of the History and Statistic of the Dacca Division*, p. 8

[১০১]. Census of 1891, Provincial Tables; উদ্ধৃত শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৫

[১০২]. James Tylor, Topography of Dacca, p. 303; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা.), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৪

[১০৩]. *Report on the Census of Bengal*, 1901, vol. 6, part 1, p. 70

*Dhaka University Institutional Repository*

হত। ১৮৮৮-৯১ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভার কমিশনারদের কার্য বিবরণিতে দেখা যায়, ১৮৮৮-৮৯ সালে ৭৪ জন মেথর ও মেথরানী আনা হয়।[১০৪]

সুলতানি আমলে বা প্রাক-মুগল আমলে বাংলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। বিদেশি পরিব্রাজকগণ (ইবনে বতুতা, মা হুয়ান, রালফ ফিচ প্রমুখ) তাঁদের বর্ণনায় সোনারগাঁও এর কথা বলেছেন। কিন্তু ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাথে ঢাকা ব্যবসায়ী ও বণিকশ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে এবং সোনারগাঁও তার প্রাধান্য হারাতে থাকে। কারণ নদী পথে চারদিকের সকল অঞ্চলের সাথে অতি সহজে যোগাযোগের জন্য ঢাকার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। তাই আহমদ হাসান দানী বলেন, "Dacca is situated in the very heart of this land of rivers and plains, about a hundred miles above the mouths of the Ganges, connected with the various river-routes and thus suitable for effectively controlling the province. This central region, where meet the great rivers- the Meghna, the Brahmaputra, the Lakhy and the Dhaleswari (ancient channel of the Ganges)...."[১০৫]

মুগল আমলের পূর্বে পালকি, নৌকা আর ঘোড়াই ছিল যোগাযোগ এবং যাতায়তের প্রধান মাধ্যম। নায়েব নাজিম রেজাখান ঢাকা থেকে তেজগাঁও পর্যন্ত একটি সড়ক নিমার্ণ করেন। সামরিক প্রয়োজনে একটি রাস্তা নির্মিত হয় বেগুনবাড়ি, পিয়ারপুর, শেরপুর হয়ে ঢাকা থেকে কাপাসিয়া অঞ্চলের টোক পর্যন্ত। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৫২ মাইল। আরেকটি রাস্তা ঢাকা থেকে বিক্রমপুর হয়ে ইছামতী পেরিয়ে ফরিদপুর পর্যন্ত এবং ঢাকা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত অপর একটি রাস্তা তৈরি হয়। সে সময়কার উল্লেখযোগ্য সড়কগুলি হল: ঢাকা-ধামরাই সড়ক, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রক্ষাকারী সড়ক এবং আরিচা বা গোয়ালন্দ সড়ক। ১৮৭৯ সালের ১০ আগস্ট 'ঢাকা প্রকাশ' এ প্রকাশিত হয় যে, ঢাকায় কয়েকজন ভদ্রলোক দ্বারা একটি নাবিক কোম্পানি (*ঢাকা স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি*) গঠন করা হয়েছে। এটি ঢাকা-মানিকগঞ্জ যাতায়ত করত। ১৮৮১ সালের ৯ জানুয়ারি 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে আরেকটি খবরে বলা হয় যে, পণ্য দ্রব্য ও জনসাধারণের যাতায়তের জন্য প্রতি সপ্তাহে *প্রিন্সেস এলিস* নামক একটি বড় স্টিমার ও দুটি টাগ স্টিমার ঢাকা ও গোয়ালন্দে গমনাগমন করবে। ১৮৮৫ সালে সরকার 'ঢাকা স্টেট রেলওয়ে' গঠন করে। এর অধীন ছিল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ময়মনসিংহ সংযোগকারী রেলপথ। ১৮৮৭-৯২ সালের মধ্যে ঢাকার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর অংশের রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠে।[১০৬]

---

১০৪. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১০৮

১০৫. Ahmad Hasan Dani, 1956, *Dacca- A Record of its Changing Fortunes*, The Saogat Press, Dacca, P. 1

১০৬. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা.), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৫৯-৬০

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পাগলাগারদে ঢাকাসহ আশে-পাশের সকল জেলার উম্মাদদের চিকিৎসা করা হত। উম্মাদদের তালিকায় যাদের নাম পাওয়া যায় তারা সকলেই নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দেশিয় অধিবাসীদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্ণচিত্র তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এখানে কেবল সেই সমস্ত উম্মাদগ্রস্থ লোকদেরই ভর্তি করা হয় যাদের মাত্রাধিক্য পাগলামীর বিষয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করা হয় এবং এর প্রেক্ষিতে যাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৮৩১ সালে এ পাগলা গারদে রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৩ জন, ১৮৫৭-৬০ এর মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩০০ জনে।[১০৭] ১৮২৭ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে, মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ৭৫৭ জন রোগীকে ঢাকার পাগলা গারদে ভর্তি করা হয়। উক্ত সংখ্যার মধ্যে ৬৫৮ জন ছিল পুরুষ এবং ৯৯ জন মহিলা। এদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে। মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তাদের পেশা সম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:[১০৮]

সারণি ৬

| রোগীর পূর্ববর্তী পেশা | রোগীর সংখ্যা | রোগীর পূর্ববর্তী পেশা | রোগীর সংখ্যা | রোগীর পূর্ববর্তী পেশা | রোগীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. গৃস্থ বা কৃষি সংক্রান্ত শ্রমিকগণ | ৬৭২ | ১০. তাঁতি | ২ | ১৯. চাল ব্যবসায়ী | ১ |
| ২. ফকির | ১৪ | ১১. ধোপা | ২ | ২০.আরদালী(বেয়ারার /চাপরাশ) | ১ |
| ৩. ব্রাহ্মণ | ১৩ | ১২. গোয়ালা | ২ | ২১. স্বর্ণকার | ১ |
| ৪. সিপাই | ৮ | ১৩. রিফুগর | ১ | ২২. রাজমিস্ত্রী | ১ |
| ৫. পতিতা | ৭ | ১৪. ব্যবসায়ী | ২ | ২৩. ঝাড়ুদার | ১ |
| ৬. ভৃত্য | ৫ | ১৫. বরকন্দাজ | ১ | ২৪. ধাঙড় | ১ |
| ৭. নাপিত | ৩ | ১৬. পাচক | ১ | | |
| ৮. দর্‌জি | ৩ | ১৭.ঔষধবিক্রেতা | ১ | | |
| ৯. বৈরাগী | ২ | ১৮. গায়ক | ১ | সর্বমোট | ৭৫৭ জন |

[১০৭]. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৪
[১০৮]. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 344-5

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র প্রদেশে এ রকম মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ঢাকার পাগলাগারদটি উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং অচিরেই সমগ্র পূর্ব বাংলা এবং আসামের রোগীদের চিকিৎসার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ১৮৩১ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে ভর্তি-হওয়া রোগীদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

সারণি ৭

| জেলার নাম | রোগীর সংখ্যা |
|---|---|
| ঢাকা | ২৩৫ |
| ত্রিপুরা | ৩৫ |
| বাখেরগঞ্জ | ২৮ |
| ফরিদপুর | ২৪ |
| ময়মনসিংহ | ১৯ |
| চট্টগ্রাম | ১৮ |
| নোয়াখালী | ১৪ |
| আসাম | ৪ |

১৮৩৭ সালে ঢাকা জেলখানায় কয়েদিদের সংখ্যা ছিল ৫২৬ জন, ১৮৭৩-৭৪ সালে তা বেড়ে গিয়ে হয় ৬৩৫ জন এবং ১৮৮৩ সালে ৮০৩ জন।[১০৯] তাছাড়া ঢাকাতে জেলা ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা যতই সম্প্রসারিত হতে থাকে ঢাকা ততই নতুন নতুন অফিস ও সংস্থাপনা গড়ে ওঠে। শহরটি অনেক দপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র ছিল, যেমন- গণপূর্ত বিভাগ, ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ। এই সকল বেসামরিক ও পুলিশ বিষয়ক আঞ্চলিক এবং জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান একত্রে মিলে বিরাট এক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান যোগায়। এর ফলে ঢাকাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জেলার রেজিস্টার অফিস ছিল ঢাকাতে। তাই জমি বিক্রি, দান, বন্ধক, সাময়িক বরাদ্ধ বা হস্তান্তর ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে লোকজনের ঢাকায় আগমন বৃদ্ধি পায়। ১৮৫০ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিটির জনবল ও সম্পদের মধ্যে ছিল একজন ইংরেজ কর্মকর্তা, একজন করণিক, একজন সরকার (হিসাব রক্ষক), তিনজন দফাদার, একজন করে চাপরাশ (অর্ডারলি), মালি, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি ও প্রহরী; বারজন মেথর; আটজন গরুর গাড়ি চালক; আটটি গরুর গাড়ি ও ষোলটি ষাঁড়।[১১০] ঢাকা শহরে যে ক্রমশ

[১০৯]. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫২
[১১০]. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮২

*Dhaka University Institutional Repository*

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঢাকার পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে তা 'ঢাকা প্রকাশ' এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়-

"....প্রথমত এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা এস্থলে লোকসংখ্যার বিলক্ষণ আধিক্য হইয়াছে। এমনকি, পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে এস্থলে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। আমরা পূর্ব্বে বড় সড়কের দুই পার্শ্বের যেসব বাড়াটিয়া গৃহ নিয়ত শূন্য থাকিতে দেখিয়াছি, এক্ষণে তাহা এক মুহূর্ত্তও শূন্য দেখা যায় না। নিতান্ত কুৎসিত স্থানগুলিতেও এক্ষণে লোককে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এস্থানে ভাড়াটিয়া বাড়ি অত্যন্ত সুলভ ছিল। এক্ষণে দিন দিনই তাহা দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। এ সকলই অধুনা এখানকার লোক সংখ্যাধিক্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু লোকসংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, স্থানের প্রশস্ততা সেরূপ বাড়ে নাই, তাহা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যে পরিমাণ স্থলে যত লোকে বাস করিত, এক্ষণে তাহাতে তাহার প্রায় দ্বিগুণ লোকে বাস করিতেছে। ইহাতে ঢাকা এক্ষণে এইরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া না উঠিবে কেন? আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি আর কিছুদিন পরে ঢাকা দ্বিতীয় অন্ধকূপ হইয়া উঠিতে পারে।"[১১১]

(মূল লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো)

আবদুল করিম গভীরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণপূর্বক বলেন, ইসলাম খাঁ যখন ঢাকাতে রাজধানী স্থানান্তরিত (১৬১০) করেন তখন ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক এক লক্ষ। ১৬৪০ সালে সেবাস্টিয় ম্যানরিক (Sebastien Manrique) বলেন ঢাকার লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ঢাকার সর্বোচ্চ উন্নতির যুগে লোকসংখ্যা ছিল ৪-৫ লক্ষ। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদে (১৭১৭) রাজধানী স্থানান্তরের ফলে লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের সময় ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪৫০,০০০ জন।[১১২] ১৭৬৫ সালে পর ১৭৮৬ অথবা ১৮০০ সালে এ সংখ্যা প্রায় এক লক্ষে নেমে আসে।[১১৩] ১৮০১ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের লোকসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান:[১১৪]

**সারণি ৮**

| সাল | ১৮০১ | ১৮৩০ | ১৮৩৮ | ১৮৬৭ | ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯০৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিমাণ (জন) | ২০০,০০০ | ৬৬৯৮৯ | ৬০৬১৭ | ৫১৬৩৬ | ৬৯২১২ | ৭৯০৭৬ | ৮২৭২১ | ৯০৫৪২ | ১০৮৫৫১ |

১১১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ জুন ১৮৬৩ ; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৪২-৩

১১২. Kamal Siddique & et al, *Social Formation in Dhaka City*, p. 7

১১৩. Abdul Karim, *Dacca The Mughal Capital*, pp. 91-2

১১৪. Mr. Clay, *History and Statistics of the Dacca Division*; W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. v; *Census Report of 1901*; James Tylor, *Topography of Dacca*; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা.), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড; জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, মুনতাসীর মামুন (সম্পাদিত) প্রথম ভাগ

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৭২ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পাশাপাশি জনসংখ্যার ঘনত্বও বৃদ্ধি পায়। ১৮৭২ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্রতি বর্গমাইলে নীট (net) বৃদ্ধি পায় ২৩৭০ জন।[১১৫] নিম্নে প্রতি বর্গ মাইলে কতজন বাস করত তার একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল।[১১৬]

সারণি ৯

| | প্রতি বর্গ মাইলে | | | | প্রতি দশবছর অন্তর প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাল | ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৮৭২-৮১ | ১৮৮১-৯১ | ১৮৯১-১৯০১ |
| পরিমাণ (জন) | ৭৬৯০ | ৮৭৮৬ | ৯১৪৭ | ১০০৬০ | (+)১০৯৬ | (+)৩৬১ | (+)৯১৩ |

১৮৪০ সালে জেমস টেলর *Topography of Dacca* গ্রন্থে এবং ঢাকার কালেক্টর Mr. Clay ১৮৬৭ সালে তাঁর *History and Statistics of Dacca Division* গ্রন্থে ঢাকা জেলার যেসব হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেন তার ভিত্তিতে এবং হান্টার আরও কিছু সম্প্রদায়ের নাম সংযুক্ত করে ১৮৭২ সালের আদমশুমারির পরিসংখ্যান ব্যবহার করে তিনি ঢাকা জেলার নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানটি তৈরি করেন।[১১৭] মূল সারণি থেকে বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায়ের তথ্য উল্লেখ করা হল:

সারণি ১০

| বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায় ও জাতির নাম | পেশার বিবরণ | সংখ্যা | | বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায় ও জাতির নাম | পেশার বিবরণ | সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|

[১১৫]. *Census Report of 1901*, p. 35
[১১৬]. *ibid*
[১১৭]. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. V, pp. 47-51; James Tylor, *Topography of Dacca*, pp. 221-55; Mr. Clay, *History and Statistics of the Dacca Division*, pp. 3-9 ; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা.), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৯-৩২

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মণ | হিন্দু পুরোহিত, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, কেরানি ও আদালতের কাজে নিযুক্ত | ৫১৬৩২ | বারুই/তামলি/তাম্বুলি/ | পান উৎপাদক ও বিক্রেতা | ১৬১৩১ |
| ক্ষত্রিয় | বণিক | ৬২১ | তিলি বা তেলি | তৈল ব্যবসায়ী | ১৫৫ |
| রাজপুত | পুলিশ, কনস্টেবল, সংবাদদাতা, দারোয়ান | ১৬৬৫ | সদ্‌গোপ | কৃষিজীবী | ১০৮৫ |
| ঘাটওয়াল | ঐ | ১১ | গন্ধবণিক | মসলা বিক্রেতা। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের গন্ধবণিকরা উচ্চবর্গের হলেও,ঢাকার গন্ধবণিকরা নিম্নবর্গের | ৬৬৩৪ |
| কায়স্থ | জমিদার, উকিল, হিসাবরক্ষক, কেরানি, কোষাধ্যক্ষ | ১০২০৮৪ | সূত্রধর | গাছকাটা, কাঠকাটা, নৌকা ও লাঙল তৈরি করে | ১৫৯০৭ |

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

| | | |
|---|---|---|
| তাঁতি | বয়নশিল্পের সাথে জড়িত | ৮৯০৬ |
| শাঁখারি | শঙ্খশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত | ৮৫৩ |
| কামার | সোনারূপার কাজ করে | ১২০৭২ |
| আহিরা গোয়ালা | দুধ, মাখন, ঘি সরবারহকারী | অনুল্লিখিত |
| মালাকর | বাগানে মালির কাজ করে | ২৭৫৭ |
| নাপিত | ত্রিপুরা থেকে এসেছে। চুলকাটা | ১৮২০৮ |
| মোদক বা ময়রা | মিষ্টি বানায় | ৫২১ |
| কুণ্ডু | রান্নার খাবার বানায় | ৮০৫ |

| | | |
|---|---|---|
| সুবর্ণবণিক | সুদ কারবারী, দামি পণ্য বিক্রেতা | ৪৬৯৬ |
| সাহা | বড় বড় আড়ৎদার। খাদ্যদ্রব্য, চিনি, পান, লবণ ও দেশিয় অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহকারী | অনুল্লিখিত |
| কাপালি | চটবোনা, দড়িও বানায়, গরুর গাড়ির চালক | ১৭০১৭ |
| পাতিয়াল | শীতলপাটি তৈরি কারক | ১২৪১ |
| পাটনি | মাঝি, ঝুড়ি বানায়, মাছ বিক্রেতা | ৪৬৯৫ |
| কৈবর্ত | কৃষিকাজ ও মাছ বিক্রেতা | ৩২৩১৭ |
| চামার | পশুর চামড়া ও জুতো তৈরি করে | ২৪০৬৩ |
| ভূঁইমালি | রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও ধাঙড়ের কাজ এবং বাগানের কাজ করে | ৭২৬৭ |

465882

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| অগুরি | চাষ করে | ৩১৩ |
| বর্ণয়াড়া | ভিনরাজ্য থেকে আগত ব্যবসায়ী | ৬৪ |
| হাইলকর | ভিনরাজ্যের মিষ্টি প্রস্তুতকারক | ৯১ |
| কুরমি | ভিনরাজ্যের মানুষ যারা বাড়ির ভৃত্য ও শ্রমিকের কাজ করে | ৫০৮ |
| কাঁসারি | তামা ও পিতলের নিপুণ কারিগর | ৪৬৪ |
| কুমার | মাটির খেলনা ও বাসনকোসন তৈরি করে | ১৪৮৩৫ |

| | | |
|---|---|---|
| চণ্ডাল | চাষ করা, ঘাস কাটা, বাগান তৈরি, নৌকা চালায় এবং পালকি বহন করে | ১৯১১৬২ |
| ডোম | জেলে, শববাহক, শূকর পোষে এবং ঝুড়ি বানায় | ৬৪১ |
| যোগী | দেশিয় মোটা কাপড় বোনে | ১৬৪১০ |
| হনসি | তাঁতি | ৬৫ |
| সুড়ি | মদ বিক্রেতা | ৬৩৫১১ |
| বেলদার | দিনমজুর | ১৭১ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| সদ্‌গোপগোয়ালা | দুধ, মাখন, ঘি সরবারহকারী | অনুল্লিখিত |
| চাষা ধোপা | কৃষিজীবী | ২৮০৯ |
| সেকরা বা স্যাকরা | স্বর্ণকার | ২৯২ |
| বৈষ্ণব | স্বতন্ত্র সম্প্রদায় | ১১৮৮৬ |
| ধোবা | জামাকাপড় কাচার কাজ করে | ৯৬১৫ |

| | | |
|---|---|---|
| বাগদি | দিনমজুর, মাছ ধরা ও কৃষি কাজ | ১৫০৫ |
| রাবণি কাহার | ভিনরাজ্যের পালকি বাহক | ১৪৩৬ |
| মাল | সাঁপুড়ে | ৪৬৬৩ |
| হাড়ি | শূকর পালক ও ঝাড়ুদার | ১৯৫৪ |
| বেদিয়া | জিপসিদের মত উপজাতি | ৯ |

১৮৭২ সালে মুসলিম সম্প্রদায়ের যেসব বর্ণের নাম ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:[১১৮]

**সারণি ১১**

| বিভিন্ন বর্ণ, সম্প্রদায় ও জাতির নাম | সংখ্যা |
|---|---|
| জুলাহা বা জোলা | ১০৪৬৪ |
| মুগল | ১৭ |
| পাঠান | ১১৩৪ |
| সৈয়দ | ৪৪৫ |
| শেখ | ১৩২৪৭ |
| অনির্দিষ্ট | ১০২৪৮২৪ |

১৯০১ সালের মধ্যে উক্ত সংখ্যার হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে। ১৯০১ সালের আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে শ্রী কেদারনাথ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে ঢাকা জেলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নবর্গের একটি পরিসংখ্যান তৈরি করেন। নিম্নে পরিসংখ্যানটির চম্বুকাংশ তুলে ধরা হল:[১১৯]

---

[১১৮]. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, ibid, vol. V, p. 41

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ১২

| হিন্দু | | |
|---|---|---|
| বর্ণের নাম | সংখ্যা | |
| | পুরুষ | স্ত্রী |
| গোয়ালা | ১৫৬৯ | ১২২৬ |
| বাগদি | ৫ | ২ |
| বৈদ্য | ৮৭০ | ৪৪৬ |
| বৈষ্ণব | ২১১ | ৩৭২ |
| বাণিয়া | ৩৬ | ৩৫ |
| বারুই | ৭৬ | ১৪ |
| বারুয়া | ৩ | অনুল্লিখিত |
| ভূঁইমালি | ১২৭ | ৭৩ |
| ব্রাহ্মণ | ৩০৮৩ | ১৪৭৫ |
| চামার | ৬২৮ | ৩৩৩ |
| ধোপা | ৬০১ | ৬২০ |
| দাই | অনুল্লিখিত | অনুল্লিখিত |
| গন্ধবণিক | ৪৫৫ | ৫২০ |
| যুগী | ৭০ | ৭ |
| কাহার | ২৩৭ | ১০২ |
| কৈবর্ত | ৫১৭ | ২৫৩ |
| কামার | ৬৫৯ | ৬১১ |
| কাপালি | ১৬ | ১ |
| শূদ্র | ৭৭৬ | ৩৫১ |
| শূড়িসাহা | ২৮৬৯ | ২৬১৫ |
| সূর্যবংশী | ২ | অনুল্লিখিত |
| সূত্রধর | ৪২০ | ৩৫৬ |

| হিন্দু | | |
|---|---|---|
| বর্ণের নাম | সংখ্যা | |
| | পুরুষ | স্ত্রী |
| কায়েস্থ | ৫৩৫৮ | ২৩১১ |
| কুমার | ১১৩৫ | ১১৬১ |
| কুরমি | ৬৫৮ | ১৪৮ |
| মালাকার | ১১৮ | ৮২ |
| মাল্লা | ২৮৭ | অনুল্লিখিত |
| মালো | ২৪১ | ১২৮ |
| ময়রা | ৫০ | ৩০ |
| মুচি | ২৩৬ | ২২২ |
| মুণ্ডা | ৫৩ | ১০৬৪ |
| নমশূদ্র | ৭০৭ | ২৭৩ |
| নাপিত | ৩৫৬ | ১৪০ |
| নুনিয়া | ৬৮ | ১০ |
| পাটিকর | ৫ | অনুল্লিখিত |
| পাটনি | ১৪ | ২ |
| রাজবংশী | ১০ | অনুল্লিখিত |
| রাজপুত | ৪৭৮ | ১৫৫ |
| শাঁখারি | ৯৮৫ | ১১৪৮ |
| সুবর্ণবণিক | ৯৭৭ | ১০০৯ |
| তাঁতি | ৩০৫০ | ২৭৬৮ |
| তেলি | ৭৩১ | ৪৮৫ |
| তিয়র | ১৯৭ | ২৯৭ |
| | | |

[১১৯]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা.), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৭৩-৮০

*Dhaka University Institutional Repository*

মুসলিমদের তালিকাটি নিম্নরূপ:

**সারণি ১৩**

| মুসলমান | | |
|---|---|---|
| **বর্ণের নাম** | **পুরুষ** | **স্ত্রী** |
| বেলদার | অনুল্লিখিত | অনুল্লিখিত |
| বেদিয়া | ৪ | ৩ |
| জোলা | ৬ | ২ |
| কুলু | অনুল্লিখিত | অনুল্লিখিত |
| নাগারিক | অনুল্লিখিত | অনুল্লিখিত |
| নিকারী | ২৪ | ১৪ |
| পাঠান | ৫৭৬ | ২৯০ |
| সৈয়দ | ৪৫৭ | ২৯২ |
| সেখ | ২০১৫৭ | ১৯৫৭৮ |

এছাড়াও কেদারনাথ মজুমদার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন যা নিম্নরূপ:

**সারণি ১৪**

| হিন্দু বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নাম এবং তাদের সংখ্যা | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **পুরুষ** | **স্ত্রী** | | **পুরুষ** | **স্ত্রী** | | **পুরুষ** | **স্ত্রী** |
| আগরওয়ালা | ৫ | ২ | গনর | ৩৮২ | ৮০ | দোমাদ | ৫৫৯ | ১২০ |
| বাহেলিয়া | ৩৭ | ২ | গনরী | ২৫১ | ২ | গঙ্গাস্তত | ৯ | অনু. |
| বাইসবানিয়া | ১৬ | ১৭ | হাজং | ১৭ | ২ | গনবার | ১৮৯ | ১৬৯ |
| ভিটি | ৩০৮ | ৩২৪ | হালানকর | ৮৫ | ৭৮ | গাবোরি | ৪৭ | ২৬ |
| বন্দুযাত | ১ | অনু. | হালুয়াই | ৮৯ | ৬২ | গারো | ২৮১ | ২৬৬ |
| ভোলা | ৮৭ | ১৩১ | হাঁড়ি | ৫৮ | ২৪ | মার্কেণ্ডি | ১ | অনু. |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বড়াই | ১১ | অনু. | হো | ১ | ১ | মৌলিক | ২ | ১ |
| বারি | ৪ | অনু. | জয়তিস | ১ | অনু. | মুরীয়ারি | ৬৪ | ১৫ |
| বাউরি | ৩৩ | ১৪ | কাচারো | ২৮৮ | ৪১১ | নাগর | ৮ | ৬ |
| বেদিয়া | ১৯ | অনু. | কাচ্চি | ৬ | অনু. | নূরী | ১ | অনু. |
| বেহারা | ১৮৯ | ৯৩ | কালোয়ার | ৪৫ | ১০ | উড়িয়া | ৬ | ২ |
| বেলদার | ২৪৬ | ২ | কান্দু | ৬৩৩ | ১৪১ | পশি | ১৯৬ | ১৪১ |
| বেদ্দালি | ২ | অনু. | কাঁসারী | ৪১২ | ২২৬ | রাজভর | ১৬০ | ২৩ |
| বেশ্যা | ১৮ | ৫৯৪ | কবন | ৪ | অনু. | সন্ন্যাসি | ৯৪ | ১১৫ |
| ভাণ্ডারি | ১ | অনু. | করণি | ৪২২ | ২৪০ | সোনার | ৩৯ | ১৩ |
| ভড় | ৩৬৫ | ৯৭ | কাওয়ালি | ১৩১ | ১১৮ | তাম্বুলি | ৯২ | ৯৫ |
| ভাট | ৮ | অনু. | কেয়ত | ১৭৬ | ৭৬ | টিপরা | ৮৯ | ৮৭ |
| ভূঁইয়া | ১৭৩ | ১৪৯ | ঘণ্ডাইত | ৮৯ | অনু. | টুরী | ৬ | অনু. |
| ভূমিজ | ১৭৬ | ১৮৪ | ঘারোয়ার | ৮৮ | ১২৮ | খাস | ১ | অনু. |
| বীন্দ | ৬৩২ | ৫৯ | ব্রাহ্মজ | ১১ | ১ | খটিক | ২ | ৯ |
| অগ্রদানী(ব্রাহ্মণ) | ৪৬১ | ৩৫০ | চেইন | ১৫৬ | অনু. | খাটুই | ৯ | অনু. |
| ব্রাহ্মণ | ৩৮ | ৩৫ | চাইনিজ বৌদ্ধ | ৩ | ১ | খেতুরি | ১ | অনু. |
| ঘমি | ১ | অনু. | ধমুল | ১৮৮ | অনু. | কিচক | ৫৭ | ৫৮ |
| গনদ | ১২ | ১২ | ডোম | ২৬৭ | ১৫৫ | কৈরী | ৪৪৫ | ১৬০ |

সারণি ১৫

| হিন্দু বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নাম এবং তাদের সংখ্যা | | |
|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী |
| কারো | ১২ | ১৬ |

| মুসলমান বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নাম এবং তাদের সংখ্যা | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | পুরুষ | স্ত্রী | | পুরুষ | স্ত্রী |
| আজলক | ৮৮ | ১৪৩ | মাল্লা | ৯ | ৬ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কোষ্ঠা | ৪ | অনু. | আমারক | ২ | অনু. | মেথর | ১৬ | ১২ |
| লালবেগী | ১৬৬ | ৫৭ | বেহারা | ১৭৪ | ১৫১ | মীর | ৩০ | ১৪ |
| মগবৌদ্ধ | ১২ | ৩ | দফাদার | ১৮৩ | ২৮০ | মীরজা | ৫১ | ৫১ |
| মাহুলি | ১ | অনু. | দাই | ২৫৪ | ৩০০ | মুগল | ২২৬ | ২২১ |
| মারোয়াড়ী | ৭৪ | ১৮ | দর্জি | ১ | অনু. | মুন্নি | ৩ | |
| মেথর | ৩২০ | ১৮৪ | দেওয়ান | ১৯ | ৭ | | | |
| মুশাহারা | ৫ | অনু. | ধোপী | ৯ | ৮ | | | |
| নট | ২৩১ | ৩১৫ | ধূনিয়া | ১৪ | ১৫ | | | |
| ওয়াউন | ৩০ | ৩২ | ফকির | ১ | ৪ | | | |
| আনোয়াল | ২ | অনু. | হাজং | ২৫২ | ২৮৩ | | | |
| পাটুয়া | ৩ | ৬ | কাশ্মিরী | ৫ | অনু. | | | |
| সদগোপ্ | ১৬৬ | ২৩৫ | কাজি | ৪ | ৪ | | | |
| সাঁওতাল | ৫ | ১ | খাঁ | ৫৯ | ৬২ | | | |
| সোরাহিয়া | ৩৬৭ | ৫ | খুজা | ১২ | ১০ | | | |
| তেলেদ্দা | ১ | অনু. | খাওয়ানদফর | অনু. | ১১ | | | |
| তুরয়া | ৭ | অনু. | লালবেগী | ৩০ | ২২ | | | |
| বৈশ্য | ৫৯ | ৯০ | মাহিফরাস | ৮ | ৭ | | | |

উপরে বর্ণিত পরিসংখ্যানটির সীমাবদ্ধতা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সকল নিম্নবর্গের সংখ্যা প্রতিফলিত হয়নি। অন্যদিকে পুরুষ ও নারীর সংখ্যার আনুপাতিক হারের মধ্যে অসামাঞ্জস্য দেখা যায়।

সুবাদার ইসলাম খাঁ বিদ্রোহী বাংলায় মুগল আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা'য় একটি সেনা ছাউনি স্থাপন করেন। এ সেনা ছাউনিকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরের পত্তন হয়, ঢাকা'র পারিসরিক বৃদ্ধি ঘটে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাক-মুগল আমলেও ঢাকা শহরে জনবসতি থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক আমলে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ঢাকা শহরের প্রায় পতন ঘটে। এ অবস্থা থেকে ঢাকা শহর তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে

*Dhaka University Institutional Repository*

বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, পেশা, বর্ণ ও শ্রেণির মানুষ ছিল। ব্রিটিশ আমলে ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর। তাছাড়া কৌশলগত ও ভৌগোলিকভাবে সুবিধাজনক স্থানে ঢাকার অবস্থানের জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে লোকজন ঢাকায় আসে। এসব জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল অর্থনৈতকিভাবে অসচ্ছল ও পশ্চাৎপদ। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বর্ণপ্রথার অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণের গুটিকয়েক ব্যক্তি (যারা বিত্ত-বৈভবের মালিক), জমিদার, দেশিয় রাজন্যবর্গ, ইউরোপীয় বণিক, প্রশাসক ও কর্মকর্তা ব্যতীত সবাই ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ১৮৩৮ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার সিংহভাগ ছিল নিম্ন আয়ের মানুষ। এসকল নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবন এবং জীবিকা মসৃণ ছিল না। তারা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও নিম্ন আয় উভয় দিক জয় করে জীবন পরিচালিত করতে হত। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যার ফলে ফসলের ক্ষতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব, দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি ও তাদের বসত-বাড়ির অবস্থা প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## আর্থ-সামাজিক অবস্থা

সরকারি নথি-পত্রের সীমাবদ্ধতার কথা ভূমিকাতেই বলা হয়েছে। তারপরও উল্লেখ্য, আর্কাইভসে সংরক্ষিত বেশির ভাগ দলিল-পত্রই ব্যবহারের অনুপযোগী (নাজুক অবস্থা) ফলে গবেষণার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা দুরূহ। তাছাড়া এতে নিম্নবর্গের অবস্থা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে প্রতিবেদন তৈরি করত। তবে নিম্নশ্রেণির মানুষদের আয়/বেতন, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এবং দৈনন্দিন ব্যয় প্রভৃতি বিষয় বিশ্লেষণ করলে তাদের প্রকৃত রূপটি বোঝা যাবে। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার প্রধান বিষয় নিম্নবর্গের 'আর্থ-সামাজিক অবস্থা' এবং যেসব উপাদান তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে সেগুলির বিশ্লেষণ। তাই তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক সঙ্গত কারণে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। তাসত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত দিকগুলি যতদূর সম্ভব তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা জানি ঢাকায় মুষ্টিমেয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তি ছিল। বাকিরা ছিল গরিব, দরিদ্র, বুভুক্ষ ও বেকার। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল বেকার। ১৮০১ সালে ঢাকার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ২,০০,০০০। কিন্তু ১৮৩৮ সালে মাত্র সাতত্রিশ বছরে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮,০৩৮। এসময় যে হারে জনসংখ্যার হ্রাস ঘটেছে, তার চেয়ে বহুগুণে দারিদ্র বৃদ্ধি পায়।[১] এ বিষয়টি চৌকিদারি বা নির্ধারিত পুলিশ কর-এর (লোকের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার অন্যতম নির্ণায়ক বা মানদণ্ড) রেকর্ড থেকে অবগত হওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৩১,৫০০ টাকা থেকে মাত্র ১০,০০০ টাকায় নেমে আসে। নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ লোক কাজের অভাবে চরম দুঃস্থ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে।[২] ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠার তিন দশক পর জনসংখ্যা, কর পরিশোধের সংখ্যা ও কর পরিশোধের হার দেখলে একথা আরও সত্য প্রমাণিত হবে। ১৮৯০ সালে ঢাকা শহরের লোক ছিল ৭৭,৬৬১ জন কিন্তু কর পরিশোধ করে মাত্র ৯,৯৩৫ জন।[৩] নব্বইয়ের দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকে এসে এই সংখ্যাটা সামান্য বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ:[৪]

---

১. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 366; Ahmad Hasan Dani, (3rd Revised edition, 2009), *DHAKA: A Record of Its Changing Fortunes*, (edited by Abdul Momin Chowdhury), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, p. 91

২. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 366

৩. *Wooden Bundle, A- Proceedings, Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Serial No. 21, List No. 7, File No. 39

৪. *Wooden Bundle, A- Proceedings, Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Serial No. 28-32,36; List No. 7; Municipal Resolution for 1895-96, 1896-97, 1897-98, 1898-99, 1899-1900, 1904-05; page, 27, 26, 26, 26, 26, 45 (respectively)

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ১৬

| Year | Population | Tax-payers | % of Tax-payers |
|---|---|---|---|
| 1895-96 | 82,321 | 12,512 | 15.1 |
| 1896-97 | 82,321 | 12,324 | 14.9 |
| 1897-98 | 82,321 | 12,269 | 14.9 |
| 1898-99 | 82,321 | 12,334 | 14.9 |
| 1899-1900 | 82,321 | 12,454 | 15.1 |
| 1904-05 | 90,542 | 12,777 | 14.11 |

অর্থাৎ উপরোক্ত উপাত্ত থেকে একথা প্রতীয়মান যে, ১৮৯০-১৯০৫ সালে এসেও গড়ে প্রায় ৮৫% লোক কর পরিশোধ করত না। কর পরিশোধ না করার জন্য দুটি কারণকে দায়ী করা যেতে পারে। প্রথমত: কর পরিশোধে অনীহা এবং দ্বিতীয়ত: আর্থিক অসচ্ছলতা বা দারিদ্রতা। শেষোক্ত কারণটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, পরবর্তীতে আমরা দেখবো, কর পরিশোধ করতে না পেরে বা কর পরিশোধের ভয়ে শহরের অধিকাংশ মানুষ অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে চলে যায়। সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যার বৃহদাংশ ছিল দরিদ্র এবং নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত। এ বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আহার্য ছিল নিম্নমানের এবং তাদের বাসস্থানও ছিল খুব খারাপ এবং অস্বাস্থ্যকর। এ সমস্ত নিম্নমানের ঘরবাড়ি ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসকারী স্বল্পভুক মানুষেরা নানা ধরনের অসুখ-বিসুখের শিকার হত। তাই প্রতিবছর কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, গুটি বসন্ত, ম্যালেরিয়াসহ নানা ধরনের ব্যাধি এবং দরিদ্রজনিত কারণে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটত। নিম্নে তাদের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

## বসত-বাড়ি

মুগল আমলে 'ধনীদের' বাড়ি-ঘর কেমন ছিল, তার বিবরণ আমরা বড় একটা পাই না। সম্ভবত তারা বাঁশ ও খড় দিয়ে নির্মিত বাংলো ধাচের বাড়িতে বসবাস করতেন। এসব বাড়ি ঘর সাধারণত বছর পনেরোর মতো স্থায়ী হত।[৫] তবে মুগল আমলের ইটের তৈরি অনেক মসজিদ ইমারত ও স্থাপত্য প্রমাণ করে উচ্চবিত্তদের বাড়ি বা প্রাসাদ সম্ভবত ইট দ্বারাও নির্মাণ করা হত। তাই তাইফুর বলেন, রমনা এলাকায় (বাগ-ই-বাদশাহী) মুগল আমলে প্রতিষ্ঠিত মহল্লা সুজাতপুর ও মহল্লা চিশতীয়ায় তিনি ইটের তৈরি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছেন।[৬] মুগল

[৫]. F. Karim Khan and Nazrul Islam, 'High Class Residenial Areas in Dacca City', *The Oriental Geographer*, vol. III, No. 1, 1964, p. 11; উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১০

[৬]. Syed Muhammad Taifoor, 1984, *Glimpses of Old Dhaka, Dhaka*, pp. 261-2; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১০

*Dhaka University Institutional Repository*

আমলে ঢাকা শহরের একটি বিন্যাস খুঁজে পাওয়া যায়। যেমনঃ শাসকদের বসতি এলাকা ভিন্ন, প্রজাদের এলাকা ভিন্ন। মুগল আমলে উচ্চবর্গের অন্তর্গত ছিলেন- অমাত্য, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ ও জমিদার প্রমুখ। এসকল ব্যক্তিদের সাথে নিম্নবর্গের যেমন মর্যাদাগত পার্থক্য ছিল, তেমনি তাঁরা নিম্নবর্গের সঙ্গে পার্থক্য রাখতে পছন্দ করতেন। এ কারণে নিম্নশ্রেণি পেশাজীবীদের আবাসিক এলাকা সমূহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছিল। মুগল আমলে অমাত্য বা সুবাদারগণ বুড়িগঙ্গার তীরে তাঁদের বাসগৃহ নির্মাণ করেন। কর্মকর্তারা বাসগৃহ নির্মাণ করেন বখশীবাজার, আজিমপুর বা নওয়াবপুরে। ইসলাম খাঁ থাকতেন তাঁর বিলাসবহুল বজরা চাঁদনীতে। পদমর্যাদাহীন নিম্নশ্রেণির লোকজন বাস করত বেচারাম দেউরি, আগা সাদেক ও আলী নকি দেউড়ি প্রভৃতি এলাকায়।[৭]

কোম্পানি আমল এবং ব্রিটিশ আমলে শাসকশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির আবাসস্থল পরিকল্পিতভাবে আলাদা করে গড়ে তোলা হয়। অ্যান্থনি কিং (Anthony King) দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসকরা এমনভাবে নগর পরিকল্পনা করতেন যাতে সরকারি এটিলদের সঙ্গে স্থানীয়দের (Indian People) একটি পার্থক্য সূচিত হত যাকে তিনি 'Physical separation' বলে উল্লেখ করেন। শাসক এটিলদের বসতির পরিবেশ ছিল শৃঙ্খলাপূর্ণ বাগান ঘেরা বড় বাড়ি, প্রশস্ত সোজা সড়ক প্রভৃতি। অন্যদিকে স্থানীয়দের টাউন বা আবাসিক এলাকা ছিল ঘিঞ্জি, আকাঁবাঁকা, সরু রাস্তা ও রহস্যময়; যে কারণে সৈনিকদের জন্য আলাদা সেনানিবাস নির্জন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছিল।[৮] কিন্তু ঢাকায় ঐ ধরনের নগর বিন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। ঢাকা শহরের ইউরোপিয়ানদের বাড়িগুলি ছিল বাগান ঘেরা ও সুপরিসর, কিন্তু আলাদা নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের বসবাস ছিল না।

শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীর ঘর-বাড়ি তৈরি করা হত বাঁশ, মাটি, কাঠ, খড়, নলখাগড়া ও গোবর (cow-dung) দিয়ে। ছোট ঘর এবং এর থেকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ঘরগুলি সাধারণত যথাক্রমে বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। মাটি ও গোবরের সংমিশ্রণে ঘরগুলির দেয়াল করা হত।[৯] শহরের বিশিষ্ট বণিক, উচ্চবিত্ত ও তাদের সহযোগীরা স্থানীয় দরিদ্র লোক, জঙ্গল এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে ভিন্ন অঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরি করত।[১০]

---

৭. F. Karim Khan and Nazrul Islam, 'High Class Residenial Areas in Dacca City', *The Oriental Geographer*, vol. III, No. 1, 1964, p. 9; উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৯-১০

৮. (Anthony King has shown how the British ensured a physical separation between the life of the official elite and that of the Indian people by planning civil stations adjoining but apart from Indian towns. There they lived in an ordered environment, in spacious houses enclosed by large gardens and joined by wide, straight roads. Indian towns, with their congested, winding streets, seemed a different world-mysterious and sometimes threatening. A similar seclusion was provided for the soldiers in cantonments, or permanent military camps.) Kenneth Ballhatchet, 1979, *Race Sex and Class under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and their Critics, 1793-1905*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, PP. 2-3; আরও দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১১

৯. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, pp. 75-6

১০. A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 81

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকা শহরের বাড়িঘর সম্পর্কে একটি বিশদ ও তথ্যবহুল রিপোর্ট পাওয়া যায় ১৮৩২ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হেনরি ওয়াল্টারস এর নিকট থেকে। ওয়াল্টারের মতে, তখন ঢাকা শহরের ১০টি থানার ১৭৮টি মহল্লায় লোকসংখ্যা ছিল ৬৬৬৬৭ জন এবং মহল্লাগুলিতে মোট বসত বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৬২৫৭টি। এগুলির মধ্যে মুসলমানদের ৮৮২৫টি, হিন্দুদের ৭৩২৭টি এবং অন্যান্যদের ছিল (আর্মেনীয় ৪২, গ্রীক ২১, পর্তুগীজ ৪১ ও ফরাসি ১) ১০৫টি।[২১] এছাড়া অনেক বাড়ি ছিল যাদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় সম্ভবত এসব বাড়িতে মানুষ বাস করত না। সুতরাং সর্বমোট বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৬২৭৯টি। জাতি এবং সম্প্রদায় অনুযায়ী কোন থানা ও মহল্লায় কতটি বাড়ি ছিল তা নিম্নরূপ[২২]:

সারণি ১৭

| থানার নাম | মহল্লার সংখ্যা | হিন্দুদের বাড়ির সংখ্যা | মুসলমানদের বাড়ির সংখ্যা | আর্মেনীয়দের বাড়ির সংখ্যা | পর্তুগিজদের বাড়ির সংখ্যা | গ্রীকদের বাড়ির সংখ্যা | ইউরোপীয়দের বাড়ির সংখ্যা | মোট বাড়ির সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইসলামপুর | ২০ | ১২৩৯ | ৭৫৫ | ২১ | ১৯ | ৩ | ৮ | ২০৪৫ |
| গির্ডকিল্লা | ৩১ | ৯২৬ | ১৬৬৩ | ৫ | ৪ | ১২ | ১ | ২৬১১ |
| ঢাকাশ্বেরী | ১০ | ৩১৫ | ৫৬১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৮৭৬ |
| সুলতানগঞ্জ | ১২ | ৫৩১ | ৪৮০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১০১১ |
| সুজাতপুর | ১১ | ২৮৬ | ৬২৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৯১৪ |
| পূরব দরওয়াজা | ১৯ | ২৯৩ | ১৬০৪ | ২২ | ১৭ | ০ | ০ | ১৯৩৬ |
| আমলীগোলা | ২৪ | ১২৩৯ | ১৩৬১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৬০০ |
| নওয়াবপুর | ১৭ | ১১৩৭ | ৫৮২ | ০ | ১ | ০ | ০ | ১৭২০ |
| নারিন্দা | ১৮ | ৫৪২ | ৫২৭ | ০ | ৭ | ০ | ০ | ১০৭৬ |
| শরাফাতগঞ্জ | ১৬ | ৭৫২ | ৭৩০ | ০ | ১ | ০ | ৭ | ১৪৯০ |
| সর্বমোট | ১৭৮ | ৭২৬০ | ৮৮৯১ | ৪৮ | ৪৯ | ১৫ | ১৬ | ১৬৭২৯ |

গির্ডকিল্লা একটি মুসলিম প্রধান থানা এবং এ থানাতে সবেচেয়ে বেশি মহল্লা (৩১টি) ছিল। এই থানায় মুসলমানদের বাড়ি ছিল সবচেয়ে বেশি (১৬৬৩টি)। মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান থানা হলো পূরব দরওয়াজা।

---

[২১]. Henry Walters, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches*, 1832, vol. 17, Cosmo Publications, New Delhi (rep. 1980), p. 548; আরও দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৭-৮

[২২]. Henry Walters, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches,* vol. 17, p. 549

*Dhaka University Institutional Repository*

এখানে তাদের বাড়ি ছিল ১৬০৪টি। পক্ষান্তরে, ইসলামপুর ও আমলীগোলাতে হিন্দুদের বসতি বেশি ছিল। অর্থাৎ এ দুটি থানায় তাদের বাড়ির সংখ্যা ছিল ১২৩৯টি করে। সর্বাপেক্ষা ছোট থানা ঢাকাশ্বেরীতে মহল্লা সংখ্যা (১০টি) সবচেয়ে কম ছিল।

১০ টি থানায় ইটের তৈরি বাড়ি ছিল মাত্র ৩১৬৪টি যেখানে খড়ের তৈরি বাড়ি ছিল ১৭৯৬৩টি। বাড়ির নির্মাণ উপাদান অনুযায়ী থানা ওয়ারী বাড়ির সংখ্যা নিম্নরূপ[১৩]:

সারণি ১৮

| থানার নাম | ইটের তৈরি বাড়ি | খড়ের বাড়ি, দোকান ও গোলা | মোট |
|---|---|---|---|
| ইসলামপুর | ৬০৪ | ২৫১৩ | ৩১১৭ |
| গির্ডকিল্লা | ১২২৫ | ২১১০ | ৩৩৩৫ |
| ঢাকাশ্বেরী | ১১২ | ৬৯৪ | ৮০৬ |
| সুলতানগঞ্জ | ১৮ | ১৯২৭ | ১৯৪৫ |
| সুজাতপুর | ৫৩ | ৫৪১ | ৫৯৪ |
| পূরব দরওয়াজা | ১৯২ | ১৬৭৪ | ১৮৬৬ |
| আমলীগোলা | ২৫১ | ৪০২৮ | ৪২৭৯ |
| নওয়াবপুর | ২১২ | ১৫৫৮ | ১৭৭০ |
| নারিন্দা | ২৩৮ | ১৭৪৯ | ১৯৮৭ |
| শরাফাতগঞ্জ | ২৫৯ | ১১৬৯ | ১৪২৮ |
| সর্বমোট | ৩১৬৪ | ১৭৯৬৩ | ২১১২৭ |

উপরোক্ত পরিসংখ্যানটির উপাত্ত অনুযায়ী মুসলিম প্রধান থানা গির্ডকিল্লাতে ইটের তৈরি বাড়ি ছিল ১২২৫টি যেখানে সুলতানগঞ্জ থানাতে ইটের বাড়ি ছিল মাত্র ১৮টি। কিন্তু পূর্ববর্তী চার্টটিতে আমরা দেখেছি হিন্দু প্রধান দুটি থানা- ইসলামপুর ও আমলীগোলা। এ দুটি থানায় ইটের বাড়ি ছিল কম যথাক্রমে ৬০৪ ও ২৫১টি এবং খড়ের তৈরি বাড়ির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি যথাক্রমে ২৫১৩ ও ৪০২৮টি।

[১৩]. Henry Walters, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches,* vol. 17, p. 549

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৩২ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইটের তৈরি বাড়িগুলি বাগান, দেয়ালসহ বহুতল বিশিষ্ট ছিল। বোঝ যাচ্ছে এসব বাড়িতে উচ্চশ্রেণির বাস ছিল। নিম্নে এসব বাড়ির একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল[১৪]:

সারণি ১৯

| থানার নাম | একতলা বিশিষ্ট বাড়ি | দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ি | তিনতলা বিশিষ্ট বাড়ি | দেয়াল ও বাগান সংযুক্ত বাড়ি |
|---|---|---|---|---|
| ইসলামপুর | ২৭৬ | ৩২১ | ৭১ | ২৪ |
| গির্ডকিল্লা | ১৪ | ১২ | ০ | ০ |
| ঢাকাশ্বেরী | ১৩৯ | ৪৫ | ২ | ১০ |
| সুলতানগঞ্জ | ২৮ | ১৮ | ১ | ৬ |
| সুজাতপুর | ১৩৩ | ১১৩ | ২ | ২৯ |
| পূরব দরওয়াজা | ১৩২ | ১২৭ | ৬ | ৪ |
| আমলীগোলা | ২২১ | ১০০১ | ৪ | ১০ |
| নওয়াবপুর | ৬৬ | ৩৫ | ২ | ১৪ |
| নারিন্দা | ১০৫ | ১৫৩ | ১২ | ২০ |
| শরাফাতগঞ্জ | ১৩৯ | ৮৫ | ৪ | ৩৬ |
| সর্বমোট | ১২৫৩ | ১৯১০ | ১০৪ | ১৫৩ |

আমরা পূর্বেই দেখেছি ইসলামপুর ও আমলীগোলা হলো হিন্দু বসতি প্রধান থানা এবং গির্ডকিল্লা ও পূরব দরওয়াজা হল মুসলিম বসতি প্রধান থানা। প্রথমোক্ত দুটি থানায় একত্রে একতলা, দ্বিতল ও তিনতলা বিশিষ্ট বাড়ি ছিল যথাক্রমে ৪৯৭, ১৩২২ ও ৭৫টি। দ্বিতীয়োক্ত থানা দুটিতে একত্রে একতলা, দ্বিতল ও তিনতলা বিশিষ্ট বাড়ি ছিল যথাক্রমে ১৪৬, ১৩৯ ও ৬টি। ১৮৮৮ সালের এপ্রিলে টর্নেডোতে ঢাকা শহরের ৩৫২৭টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। নবাবের প্রাসাদ ও ৪৮টি ইটের তৈরি বাড়ি আশিংকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১২১টি নৌকা ডুবে যায়। ১৩০ জন অধিবাসী নিহত ও ১৫০০ জন আহত হয়।[১৫] ১৮০১ সালে ঢাকা শহরে ৪৩৯৪৯টি বাড়ি, যেগুলির

[১৪]. Henry Walters, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches,* vol. 17, p. 550

[১৫]. B C Allen *et all, Gazetteer of Bengal and North East India,* Mittal Publications, (rep. 1979, 1984) Delhi, p. 312; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা) *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬১

*Dhaka University Institutional Repository*

মধ্যে ২৮৩২টি ইটের তৈরি, বাকিগুলি ছিল কাঠ, মাটি, বাঁশ ও শুকনো খড় দিয়ে তৈরি।[১৬] ১৯০১ সালে ঢাকা শহরের ছয় বর্গমাইল আয়তনে বাড়ির সংখ্যা ছিল ১৭৫০৪টি।[১৭]

নিম্নশ্রেণি, নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণি 'ঢাকা কমিটি' কর্তৃক কর আদায়ের বিষয়টিকে সুনজরে দেখেনি। আমরা পূর্বে দেখেছি শতকরা প্রায় ১৫ জন লোক ট্যাক্স পরিশোধ করত এবং বাকি ৮৫ জন ট্যাক্স প্রদান করত না। তারা ট্যাক্স প্রদানে অপরাগ ছিল। তাই তারা শহরের বাইরে ঘর-বাড়ি তৈরি করত। ১৮৪৩ সালে 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ' উইলিয়াম ডেমপিয়ার (William Dampier) ঢাকা পরিদর্শন করতে এসে চৌকিদারি ট্যাক্সের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির ফলে নিম্নশ্রেণির লোকজন দারুণ অসুবিধার মধ্য রয়েছে এবং এমন অনেক পরিবারও আছে যারা কর এড়ানোর জন্য শহরের অদূরে অস্বাস্থ্যকর চর অঞ্চলে গিয়ে বাস করছে। ডেমপিয়ার দরিদ্র শ্রেণির কর রহিত এবং অন্যান্যদের করভার লাঘব করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন।[১৮]

পাট চাষের প্রসারের ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে পূর্ববঙ্গে পেশাজীবী তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাসত্ত্বেও ১৮৮৮ সালের সংবাদপত্রের এক খবরে জানা যায়, নবাবগঞ্জ, চাঁদনি ঘাট, চকবাজার প্রভৃতি স্থানে তো বটেই, শহরের মধ্য ভাগেও অধিকাংশ ছিল খড়ের ঘর। দৃশ্যটি নিশ্চয় খুব মনোহর ছিল না, কিন্তু এই দৃশ্য আবার প্রমাণ করে শহরে মধ্যশ্রেণির প্রসার এবং দরিদ্রদের ক্রমশ দরিদ্র হওয়ার।[১৯] উনিশ শতকের শেষার্ধে ঢাকায় কিছু আবাসিক এলাকা গড়ে উঠে। যেমনঃ গেণ্ডারিয়া, উয়ারি, স্বামীবাগ প্রভৃতি। নতুন মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা সেখানে নির্মাণ করেছিলেন তাদের বাসগৃহ, আর নদীর তীর দখল করেছিলেন 'অভিজাত' ধনীরা।[২০] নদীর তীর ঘেঁষে যাঁদের বাড়ি ছিল তাঁরা হলেন, কাজী আলামউল্লাহ, চিনি কলের ম্যানেজার জীবন বাবু, গোলাম পীর, লিওনার্ড, আরাতুন, আমীর উদ্দিন দারোগা, মানুক, সোয়াটম্যান, মৌলভী হাফিজউল্লাহ, মির্জা আলী, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।[২১] এরাঁ নদীর তীরে সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করে। তাই জেমস টেলর (১৮৪০) অনেক পূর্বেই লিখেছেন, নদী তীরের অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে 'ভেনিসের ন্যায় জলোত্থিত নগরী বলে প্রতীয়মান হয়'।

---

১৬. Sir Charles D'Oyly, *Antiquities of Dacca*, John Landseer, Foly Street, London, p. 5

১৭. *Census of India*, 1901, (ed. E.A. Gait), Vol. VIB, Part III, Provincial Tables, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1902, p. 7

১৮. বাংলা সরকারের কাছে ডেমপিয়ারের চিঠি, Bengal Criminal Judicial Consultations, CXLII, 6, 11, September, 1843, p. 79; উদ্ধৃত শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮১

১৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৯

২০. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৭

২১. মুনতাসীর মামুন, ১৯৮৯, *পুরনো ঢাকার ঘরবাড়ি ও উৎসব*, ঢাকা; উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৮

*Dhaka University Institutional Repository*

শহরের নিম্ন ও মধ্যশ্রেণি লোকজনদের নিবাস ছিল বিভিন্ন গলিতে। এরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে ঢাকার নিবাসী। তারাই নিয়মিতরূপে ট্যাক্স প্রদান করে। কিন্তু পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ঢাকার গলিগুলির প্রতি মিউনিসিপ্যাল কমিটির সুনজর ছিল না। তারা কেবল বারংবার পায়খানা ঘর তৈরির নোটিশ প্রদান করত। কিন্তু যারা উপনিবেশী, কেবল কার্যগতা, কিছুকালের জন্য বাস করিতেছে, এমন কি ট্যাক্সও প্রদান করে না, তাদের জন্যই মিউনিসিপ্যাল কমিটি ব্যস্ত।[২২] বিংশ শতকের গোড়ায় এসেও শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নতি হয়নি। ১৮৯৯ সালে বাংলার স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার এ.ই. সিল্ক লিখেন, ". . . since I have been Sanitary Engineer I have seen a good deal of the fifth of the big municipalities of Bengal, but never has it been my lot to have to inspect anything so revolting as I have seen in Dacca. . ." ।[২৩]

## নিম্নবর্গের আয়

মুগল আমলে বিদেশি পর্যটকদের বিরণীতে ঢাকার সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। এ সমৃদ্ধি ছিল মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীর যারা উচ্চবর্গীয় শ্রেণির প্রতিনিধি। মুগল আমলে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অথার্ৎ সুবাদার, দিউয়ান, বখ্শি বা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনসবদার থেকে শুরু করে লেখক (পাটোয়ারী), কেরানি ও গৃহ ভৃত্যসহ নিম্নমর্যাদার অফিসার পর্যন্ত সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আয়ের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত বেশি এবং প্রকট। নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন ছিল সর্বনিম্ন। একজন চাবদার (আরদালী) ৩ টাকা, ধোপা ৪ টাকা, নাপিত ২.৫০ টাকা, ফরাস ৪ টাকা, পতাকাবাহক ২.৫০ টাকা, মৃধা ৩ টাকা, কাহার ৩ টাকা ও মশালবাহী ২ টাকা বেতন পেত। বাবুর্চি ও ঝাড়ুদারদের বেতন পৃথক করা যায় না। কারণ তাদের কয়েকজনের বেতন একত্রে এক বিবরণে দেখানো হত এবং পৃথক পৃথক বেতন নির্দেশ করা হত না। উল্লেখ্য, একস্থানে একজন ঝাড়ুদারের বেতন মাসে ১ টাকা বলা হয়েছে। তবে সাধারণ পিওন এবং অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীদের বেতন ২ টাকার কম ছিল না।[২৪] মুগল আমলে শ্রমিক শ্রেণির বিশেষত তাঁতির একজন সহকারীর মাসিক আয়ের পরিমাণ কখনও দুই টাকার বেশি ছিল না বরং তার চেয়ে কম। অদক্ষ শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। যে কোনো অবস্থাতেই দিনমজুরদের মাসিক আয় ২ টাকার বেশি ছিল না। তাদের জীবনমান কিরূপ ছিল তা জানা/বোঝার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের সূচক পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এক টাকায় প্রায় সোয়া মণ সাধারণ চাল পাওয়া যেত। একজন লোক যে মাসে মাত্র দুই টাকা আয় করে সে সারা মাসের আয় দিয়ে মাত্র তিন মণ বা তার কম চাল ক্রয় করতে পারত। যদি তাকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট (যাকে আদর্শ পরিবার হিসাবে গণ্য

---

[২২]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮০

[২৩]. Azimusshan Haider (ed.), 1966, *A City and its Civic Body, Dacca*, East Pakistan govt. press, Tejgaon, Dacca, p. 115; আরও দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৪

[২৪]. Abdul Karim, *Dacca The Muhgal Capital*, p. 100

*Dhaka University Institutional Repository*

করা হয়) একটি পরিবারের ভরণ পোষণ করতে হয় তাহলে সে তার পরিবারের জন্য কেবল যথেষ্ট চাল সংগ্রহ করতে পারবে। অতএব, এর অর্থ হচ্ছে, সে সারা জীবন অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে থাকবে। একজন দিনমজুরের আয়ের পরিমাণ তার চেয়েও কম। সুতরাং অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, মুগল আমলে সাধারণ মানুষ, দিনমজুর এবং সর্বনিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল।[২৫]

১৭২৩ সালে কলকাতা কাউন্সিল ঢাকা কুঠির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক যে ব্যয় অনুমোদন করে তার মধ্যে একজন ধোপা, দুইজন চাবদার, দুইজন মালি, নাপিত, ঝাড়ুদার এর বেতন ছিল যথাক্রমে ৪ টা., ৬ টা., ৪ টা., ২-৮ টা. ও ৫ টা.।[২৬] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-১। ১৭৫৯ সালে ইউরোপীয় গৃহে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত লোকদের বেতন নির্ধারিত করে দেয়া হয়। তখন একজন মালি, ধোপা, নাপিত, ধাত্রীর মাসিক বেতন ছিল যথাক্রমে ২ টা., ১.৫০ টা.-৩ টা., ১.৫০ টা. ও ৩ টা।[২৭] বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২ অংশে দেখুন। জেমস টেলর দরিদ্র সম্প্রদায়কে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন।

প্রথমত, বেকার ও রুগ্ন অবস্থার কারণে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি। এ শ্রেণি প্রধানত ভৃত্য, দাঁড়ি মাঝি এবং শহরের নানা ধরণের কারিগরদের নিয়ে গঠিত। রুগ্ন ও কাজ করতে অসমর্থ হলে এরা সাধারণতঃ রৌপ্য অলঙ্কারাদি, কাপড়-চোপড় বা তাম্র ও পিতলের ঘটি-বাটি ইত্যাদি বন্ধক রেখে অর্থ ঋণ করে। শহরাঞ্চলে ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রায় প্রত্যেকটি লোক বন্ধকী ব্যবসায়ী। মাসিক সুদের হারে শতকরা আড়াই থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত ছিল। ১৭৭০ সালে মাসিক সুদের হার ছিল শতকরা ৬ টাকা ২ আনা যদিও পরে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩ টাকা ৮ আনা।

দ্বিতীয়ত, আশ্রয়হীনা বিধাব ও অনাথ ছেলেমেয়ে। শহরে বিধবরা সাধারণতঃ তাদের স্বামীদের বা গোত্রীয় কোন ঘরে কাজ পেয়ে যায়। তাঁতিরা এদেরকে মোটাবস্ত্র তৈরির কাজে নিয়োগ করত। শাঁখারিরা এদেরকে শঙ্খ পরিষ্কার করানো ও সিপাহিদের হারের জন্য পুঁতিতে চিহ্ন বসানো ইত্যাদি কাজে এবং টিনের থালা বাসন রঙ করানোর ও পুতুল সজ্জিতকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিধবাদের কাজে লাগাত। এরা হিন্দু পরিবারে পাচিকা হিসাবেও কাজ করত। আবার অন্যান্যরা নবজঙ্গল ও বিলঝিল থেকে সংগ্রহ করে আনা শাক্সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। মুসলমানদের মধ্যে বিধবাদেরকে ধানভাঙ্গা ও গমভাঙ্গার কাজে

---

[২৫]. Abdul Karim, *Dacca The Muhgal Capital*, p. 104-5
[২৬]. Abdul Karim, *Dacca The Muhgal Capital*, pp. 97-98;
[২৭]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী, *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫৭।

*Dhaka University Institutional Repository*

নিয়োগ করা হত। তাছাড়া কলসী দিয়ে নদী থেকে বিভিন্ন পরিবারে পানি সরবারহ করে দিত, হাতে তৈরি টুপি ও পোশাক বিক্রি করত, বাজারে তেলে ভাজা পিঠা বিক্রি করে দিনাপাত করত।

তৃতীয়ত, যারা দৈহিকভাবে অক্ষম বা রোগ-ব্যধিগ্রস্থ যেমনঃ খঞ্জ, অন্ধ ও কুষ্ঠ ইত্যাদি হওয়ার দরুন জীবিকা অর্জনে অসমর্থ ছিল। এরা সবাই রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত।[২৮]

কারিগর বা তাঁতিরা মুগল আমলে তাদের নিজস্ব পুঁজি দিয়েই মসলিন তৈরি করত। তবে আঠারো শতকের শেষার্ধে কিংবা উনিশ শতকের প্রথমদিকে ব্যবসায়ী বা তাদের প্রতিনিধি পাইকারদের নিকট থেকে তাঁতিরা সূতা ও অগ্রিম টাকা গ্রহণ করত। একবার অগ্রিম টাকা বা দাদন গ্রহণ করলে দাদনকারীর হাত থেকে মুক্ত হওয়া ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যারা দৈনিক বা মাসিক হিসাবে কাজ করত, তাদের গড় পড়তা পারিশ্রমিক হলো, মাসে ২ টাকা ৮ আনা। একজন তাঁতির অধীনে শিক্ষাধীন ১০ বা ১২ বছর বয়সের বালক শিক্ষা নবীশীকার্যে দু'বছর কাটানোর পর মাসে ৪ আনা পারিশ্রমিক লাভ করত। সাধারণতঃ প্রতি বছরই এই হার বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে তার শিক্ষা গ্রহণের শেষ বছরে সে মাসিক ১২ আনা পারিশ্রমিক পেত। উনিশ শতকের ৩০ বা ৪০ দশকে সুতাকাটারুগণ বছরে ২ সিক্কার বেশি সুতা তৈরি করতে পারত না। এতে সিক্কা প্রতি ৮ টাকা হারে মাত্র ১৬ টাকা বা ৩২ শিলিং উপার্জন করত। উল্লেখ্য, ১৮৪০ সালে প্রতি সিক্কা ৮ টাকা বা ১৬ শিলিং ছিল (James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 311-12)। একজন সূচী শিল্পী দৈনিক গড়ে ২ আনা আয় করত। ধোপারা ধৌত করা বস্ত্রের দৈর্ঘ্য ও গুণাগুণ অনুসারে পারিশ্রমিক পেত। প্রতি ১০০ খণ্ড বস্ত্রে ৪ থেকে ১৪ টাকা পর্যন্ত আয় করত। এরা খাদ্যশস্যেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করত। শাঁখা তৈরির কাজে তিন ধরণের লোক নিয়োজিত ছিল। যারা শঙ্খকে ভেঙ্গে পৃথক ও পরিষ্কার করত তারা ৪২০টি শঙ্খের জন্য ১ টাকা হারে মজুরি পেত। এরা প্রতি মাসে ৩ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারত। শাঁখের করাতিরা প্রতি ১০০ শঙ্খের জন্য ২ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত আয় করত। যারা শাঁখা ঘষে মসৃণ ও চিকন করত এবং খোদাই করত তারা চুক্তি ভিত্তিক পারিশ্রমিক পেত।[২৯]

কোম্পানি আমল বিশেষত উপনিবেশ আমল শুরুর পর থেকে বাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে এবং নিম্নশ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বলা হয়, 'The British colonial rule that began in Bengal had transformed the socio-economic life of the people, resulting in the increase

---

২৮. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 314, 316
২৯. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, pp. 311-13

*Dhaka University Institutional Repository*

in the number of the lower class people.'[৩০] ১৮১৪ সালে ঢাকার এক ম্যাজিস্ট্রেট বাংলা সরকারের নিকট প্রেরিত চিঠিতে এ কথারই প্রতিফলন ঘটে। তিনি লিখেন, 'আইন অনুযায়ী সর্বাধিক তিন টাকা মাসিক বেতনে নিয়োজিত চৌকিদার দলটির অনেকেই স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে হবে যে তারা হয় আগে দুর্বৃত্ত ছিল না হয় সাময়িকভাবে কাজ আর অলসতা ও অসৎ পন্থা অবলম্বন করার মত এক মিশ্র ও বিপজ্জনক জীবন যাপন করত। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের নিম্ন শ্রেণির মধ্যে এ ধরনের জীবন যাত্রাই ছিল প্রচলিত।'[৩১]

১৮০০ সালে একজন দক্ষ মসলিনের তাঁতির মাসিক আয় ছিল ৪ টাকা এবং তাঁতির সহকারীর মাসিক আয় ২ টাকা।[৩২] ১৮০৩ সালে রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের গড়পড়তা (বার্ষিক মজুরি) নিম্নরূপ:[৩৩]

সারণি ২০

| কর্মচারীদের পদবী ও তালিকা | বার্ষিক বেতনের গড়পড়তা | | |
|---|---|---|---|
| ইতিমামদারগণ | ৩১ টাকা | ৩ আনা | ০ পয়সা |
| মণ্ডলগণ | ১৮ টাকা | ১৪ আনা | ০ পয়সা |
| নায়েবগণ | ৬৪ টাকা | ০ আনা | ০ পয়সা |
| পিয়ন | ২৪ টাকা | ০ আনা | ০ পয়সা |
| মোহরারগণ | ৩১ টাকা | ০ আনা | ০ পয়সা |

কিন্তু কত জন ইতিমামদার, মণ্ডল, নায়েব, পিয়ন ও মোহরারগণকে ঐ বেতন দেয়া হত তা জানা যায় না। ১৮০৩ সালে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক, কুলি, মাঝি, ভাণ্ডারী বা গৃহ-ভৃত্যদের বার্ষিক মজুরি ছিল নিম্নরূপ[৩৪]ঃ

---

৩০. Muntassir Mamoon & Mahabubar Rahman, *Material Conditions of the Subalterns Nineteenth Century East Bengal*, p. 8

৩১. বাংলা সরকারের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি, ২৮ জানুয়ারি ১৮১৪; Bengal Criminal Judicial Consultations, CXXXI, 32, 12 Feb. 1814, P. 8; উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮০

৩২. Abdul Karim, *Dacca The Muhgal Capital*, p. 104

৩৩. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 307

৩৪. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 306; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৮

*Dhaka University Institutional Repository*

সারণি ২১

| শ্রমজীবী | শ্রমিকের ধরণ | বার্ষিক মজুরি |
|---|---|---|
| কৃষিক্ষেত্রে কার্যরত শ্রমিক | প্রথম শ্রেণির | ১৮ |
| | দ্বিতীয় ঐ | ১৫ |
| | তৃতীয় ঐ | ১২ |
| মাঝিমাল্লা | প্রথম ঐ | ২৪ |
| | দ্বিতীয় ঐ | ২১ |
| | তৃতীয় ঐ | ১৮ |
| | চতুর্থ ঐ | ১৫ |
| কুলি | প্রথম ঐ | ১২ |
| | দ্বিতীয় ঐ | ১০ |
| | তৃতীয় ঐ | ৯ |
| | চতুর্থ ঐ | ৬ |
| সাধারণ মাঝি | প্রথম ঐ | ১৫ |
| | দ্বিতীয় ঐ | ১২ |
| | তৃতীয় ঐ | ১০ |
| | চতুর্থ ঐ | ৬ |
| গৃহ-ভৃত্য | প্রথম ঐ | ১২ |
| | দ্বিতীয় ঐ | ৯ |
| | তৃতীয় ঐ | ৬ |
| | চতুর্থ ঐ | ৩ |

উনিশ শতকের ত্রিশ/চল্লিশের দশকে শ্রমজীবীদের উপার্জন কত ছিল তা নিম্নরূপ[৩৫]:

| | |
|---|---|
| সাধারণ দিনমজুরের মাসিক আয় | ৩ টাকা ১২ আনা |
| ভাল দিনমজুরের মাসিক আয় | ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা |

[৩৫]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকায় বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫৬

*Dhaka University Institutional Repository*

| | |
|---|---|
| রাজমিস্ত্রীর মাসিক আয় | ৪ টাকা থেকে ১২ টাকা |
| সূত্রধর মাসিক আয় | ৭.৫০ টাকা থেকে ১৩ টাকা |
| কর্মকার মাসিক আয় | ১০ টাকা |
| স্বর্ণকার মাসিক আয় | ১২ টাকা |

অর্থাৎ একজন শ্রমিকের মাসিক আয় যেখানে সর্বোচ্চ ১৩ টাকা সেখানে ঐ সময় বিবাহ, শবদাহ ও মরদেহ কবরস্থ করার জন্য সর্বনিম্ন ব্যয় ছিল ১০ টাকা। সুতরাং নিম্নশ্রেণির কেউ যদি এক মাসে বিবাহ বা শবদাহ যে কোন একটি অনুষ্ঠান করত তাহলে তার কষ্টের সীমা ছিল না। ১৮৩৭ সালের ডিস্ট্রিকস রেকর্ডস থেকে জানা যায় একজন সাধারণ দিনমজুর প্রতি মাসে ৭ স্টার্লিং (sterling) ৬ পেন্স (pence), একজন রাজমিস্ত্রি ৮ স্টার্লিং এবং একজন কাঠমিস্ত্রি ১৫ স্টার্লিং আয় করত। ১৮৬২ সালে প্রতি মাসে সাধারণ শ্রমিকের বেতন ছিল ১০ স্টার্লিং, রাজমিস্ত্রির ১০ স্টার্লিং, এবং কাঠমিস্ত্রির ১৮ স্টার্লিং। ১৮৭১ সালে প্রতি মাসে দিনমজুর ১০ স্টা. থেকে ১২ স্টা., কর্মকার ১ পাউন্ড (pound), স্বর্ণকার ১ পা. ৪ স্টা., রাজমিস্ত্রি ১ পা. ৪ স্টা., এবং কাঠমিস্ত্রি ১ পা. ৬ স্টা. আয় করত।[৩৬]

১৮৩৭ সালে রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের গড়পড়তা (বার্ষিক মজুরি) নিম্নরূপ:[৩৭]

**সারণি ২২**

| কর্মচারীদের পদবী ও তালিকা | বার্ষিক বেতনের গড়পড়তা | | |
|---|---|---|---|
| ইতিমামদারগণ | ৪১ টাকা | ১০ আনা | ০ পয়সা |
| মণ্ডলগণ | ২৬ টাকা | ২ আনা | ০ পয়সা |
| নায়েবগণ | ৭৬ টাকা | ০ আনা | ০ পয়সা |
| পিয়ন | ৩৬ টাকা | ০ আনা | ০ পয়সা |
| মোহরারগণ | ৩৪ টাকা | ৮ আনা | ০ পয়সা |

[৩৬]. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, p. 94
[৩৭]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 307

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৩৭ সালে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক, কুলি, মাঝি, ভাণ্ডারী বা গৃহ-ভৃত্যদের বার্ষিক মজুরি ছিল নিম্নরূপ:[৩৮]

| শ্রমজীবী | শ্রমিকের ধরণ | বার্ষিক মজুরি |
|---|---|---|
| কৃষিক্ষেত্রে কার্যরত শ্রমিক | প্রথম শ্রেণির | ৪৮ টাকা |
| | দ্বিতীয় ঐ | ৩৬ টাকা |
| | তৃতীয় ঐ | ২৭ টাকা |
| মাঝিমাল্লা | প্রথম ঐ | ৪৪ টাকা |
| | দ্বিতীয় ঐ | ৩৬ টাকা |
| | তৃতীয় ঐ | ৩৩ টাকা |
| | চতুর্থ ঐ | ২৪ টাকা |
| কুলি | প্রথম ঐ | ২৭ টাকা |
| | দ্বিতীয় ঐ | ২১ টাকা |
| | তৃতীয় ঐ | ১৬ টাকা |
| | চতুর্থ ঐ | ১২ টাকা |
| সাধারণ মাঝি | প্রথম ঐ | ২৭ টাকা |
| | দ্বিতীয় ঐ | ২১ টাকা |
| | তৃতীয় ঐ | ১৮ টাকা |
| | চতুর্থ ঐ | ১২ টাকা |
| গৃহ-ভৃত্য | প্রথম ঐ | ২৪ টাকা |
| | দ্বিতীয় ঐ | ১৮ টাকা |
| | তৃতীয় ঐ | ১৫ টাকা |
| | চতুর্থ ঐ | ১২ টাকা |

১৮০৩ সালের শ্রমিকদের বেতনের থেকে ১৮৩৭ সালের শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮৪০ সালে একজন মণ্ডলের (একটি মৌজার তত্ত্বাবধায়ক, রায়তদের মধ্যে সংঘটিত বিরোধ নিস্পত্তি করত) বেতন

[৩৮]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 306; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭২৮

*Dhaka University Institutional Repository*

২.৫০ টাকা থেকে ৩ টাকা। একজন পাটোয়ারীর (দু তিনটি গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ ও হিসাব রাখা) বেতন ৩ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত ছিল।[৩৯]

১৮৬৭ সালে ঢাকা কমিশনার অফিসে একজন মেথরের (Mehter) মাসিক বেতন ছিল ১ রূপি; একজন সুইপারের ৩ রূপি; প্রথম শ্রেণির একজন পিওনের ৬ রূপি; দ্বিতীয় শ্রেণির একজন পিওনের ৫ রূপি; একজন মাঝির ৫ রূপি।[৪০] ১৮৬৭ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা জেলার শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের একটি সংক্ষপ্তি তালিকা প্রণয়ন করেন তাতে দেখা যায় একজন শ্রমিকের (গাড়োয়ান) দৈনিক সর্বোচ্চ আয় ১ রূপি এবং একজন কুলির সর্বনিম্ন আয় ৩ আনা। নিম্নে পরিসংখ্যানটি হুবহু তুলে ধরা হল:[৪১]

সারণি ২৩

| শ্রমিকের প্রকারভেদ | দৈনিক কাজের প্রকৃতি | আয় | | |
|---|---|---|---|---|
| | | রূপি | আনা | পয়সা |
| কুলি | সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৫ টা, ২ ঘণ্টা দুপুরের খাবার | ০ | ৩ | ০ |
| গাড়োয়ান | সকাল ৬ টা থেকে বিকাল পর্যন্ত | ০ | ১০ | ৬ |
| গাড়োয়ান | সকাল ৬ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত | ১ | ০ | ০ |
| মাঝি | ১০০ মণ পর্যন্ত | ১* | ৪ | ০ |
| মাঝি | ৫০০ মণ পর্যন্ত | ০* | ১২ | ০ |
| মাঝি | ১০০০ মণ পর্যন্ত | ০* | ৮ | ০ |
| বেয়ারার | প্রতি জন | ০ | ৮ | ০ |
| টিক্কা গাড়ি | প্রতি ঘণ্টা | ০ | ৮ | ০ |

* প্রতি ১০০ মণ

উনিশ শতকেও বাংলায় দাস প্রথা ও দাস ব্যবসার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৪০ সালে একজন পুরুষ দাসের সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ১৫০ টাকা এবং মেয়ে দাসীদের মূল্য ১০০ টাকা। উল্লেখ্য, ১৭৮৭ ও '৮৮ সালের দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসের মুখে মায়েরা প্রচণ্ড দুঃখকষ্ট ও হতাশাবস্থায় পতিত হয়। তারা সমস্ত রকম মাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়ে

[৩৯]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 161
[৪০]. A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 100, 102, 108 & 115
[৪১]. A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 64

*Dhaka University Institutional Repository*

একমুষ্ঠি চালের জন্য তাদের আপন সন্তান-সন্ততিদের বিক্রি করে দিত। ক্রেতারা তাদের কন্যা সন্তানদের সেবা-যত্ন করার জন্যে এদেরকে ক্রয় করত। এদের অনেককে ঘৃণ্যভাবে শহরের পতিতালয়েও বিক্রয় করে দেয়া হত।[৪২] ১৮৮৯ সালে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে একজন ভূমিহীন দিনমজুর বা ভৃত্যের মজুরির গড় ছিল ৪ আনা।[৪৩]

## খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যয়

১৮২৩ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত সাধারণ ও মোটা চালের বিক্রয় মূল্য নিম্নরূপ:[৪৪]

সারণি ২৪

| সাল | চালের পরিমাণ | মূল্য | |
|---|---|---|---|
| ১৮২৩ | ১০০ সের | ২ স্টা. | ২ পেন্স |
| ১৮৩৮ | ঐ | ১ স্টা. | ৯ পেন্স |
| ১৮৫০ | ঐ | ২ স্টা. | ৪.৫ পেন্স |
| ১৮৬০ | ঐ | ৪ স্টা. | ১০ পেন্স |
| ১৮৬২ | ঐ | ২ স্টা. | ৯ পেন্স |
| ১৮৬৬ | ঐ | ১৩ স্টা. | ৭ পেন্স |
| ১৮৭১ | ঐ | ৩ স্টা. | ৯.৫ পেন্স |

জেমস টেলর তাঁর গ্রন্থে ১০ বছরের (সম্ভবত ১৮২৮-৩৮) লবণ ও তেলের গড়মূল্য লিপিবদ্ধ করেন। তাতে দেখা যায়, এসময়ে ঢাকা জেলায় প্রতি মণ লবণের গড় মূল্য ছিল ৪ টাকা ১৫ আনা ৮ পয়সা এবং সরিষার গড় মূল্য ছিল ৭ টাকা ১৩ আনা ৫ পয়সা।[৪৫] ১৮৩৮ সালে একজন শ্রমিকের দৈনিক খোরাকির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন আড়াই পয়সা, কিন্তু একটি পরিবারে বা যেখানে দু' বা ততোধিক লোক একত্রে বসবাস করে, সেখানে দু'পয়সার কিছু কম খরচ পড়ে।[৪৬] টেলর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে সম্ভবত কোথাও গড়মিল আছে। কেননা, যেখানে একজন

---

[৪২]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 305, 320-1

[43]. Government of Bengal, 1889, *Agricultural Report of the Dacca District* (A.C Sen), Calcutta, p. 14; উদ্ধৃত মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ*, পৃ. ১১৬

[৪৪]. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, p. 94-5

[৪৫]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 291

[৪৬]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 294; A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 16

*Dhaka University Institutional Repository*

শ্রমিকের দৈনিক খাওয়া খরচ আড়াই পয়সা সেখানে কিভাবে একটি পরিবার দুই পয়সার কম খরচে দিনাপাত করে?

১৮৩৮ সালে শহরে অধিক অবস্থাপন্ন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য উচ্চ শ্রেণি ১০০০-২০০০ টাকা, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ৪০০-৮০০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণি ১০০-২০০ টাকা খরচ হত। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিতান্ত দরিদ্র শ্রেণিগুলির সর্বনিম্ন খরচ হত ১০ টাকা।[৪৭] সর্বনিম্ন খরচের বিবরণের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৩। অথচ জেমস টেলরের বর্ণনা অনুযায়ী ১৮৩৭ সালে একজন শ্রমিকের বার্ষিক সর্বোচ্চ মজুরি ছিল ৪৮ টাকা এবং সর্বনিম্ন ছিল ১২ টাকা। সুতরাং কোন একজন শ্রমিক মাসে যদি একটি সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করে তাহলে ঐ মাসে তার জীবন কিরূপ দুর্বিষহ হয়ে পড়ত তা সহজেই অনুমেয়।

ঢাকা শহরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের মরদেহ দাহ ও কবর দেয়া বিষয়ে বিশেষত শেষোক্ত কাজটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্যে ঢাকা পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। ১৮৩৮ সালে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যয় হত ২ টাকা। দরিদ্র হিন্দুর শ্রাদ্ধে ব্যয় হত ৭ টাকা এবং দরিদ্র মুসলমানের চতুর্থ কতেহা পাঠে ব্যয় হত ৫ টাকা।[৪৮] বিস্তারিত খরচের জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-৪। যারা নিতান্তই গরিব তারা অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েক সের চাল, কিছু তৈলবীজ ও কড়ি বিতরণ করত। গ্রামঞ্চলে ডোমদেরকে কদাচিৎ নিয়োগ করা হয় এবং গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে যে সকল ব্যক্তি চিতার খরচ যোগাতে অক্ষম তারা মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দিত।[৪৯] ১৮৬৪ সালে '*ঢাকা প্রকাশ*' এ লেখা হয়-

"... ঢাকায় যে সকল ইতর মুসলমান বাস করে, তাহাদিগের শব সমাহিত করিবার কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নাই। লোক গমনাগনের পথের পার্শ্বে যে সকল স্থান ছাড়া পড়িয়া থাকে অনেকেই সেই সকল স্থানে, অনেকে নিজ নিজ বাটিতে মৃত শরীর নিখাত করিয়া রাখে। ... কৃষকরা শস্যবীজ যেমন মৃত্তিকার নিম্নস্থ করিয়া রাখে, শব সমাহিতারাও সেইরূপ মৃত্তিকা দ্বারা শরীরটা আচ্ছাদিত করিয়া আইসে বলিলেই হয়।"[৫০]

(মূল লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃতি করা হয়েছে)

---

৪৭. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, pp. 259-60; A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 11; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫১-৫২

৪৮. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, pp. 261-2; A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 11-2; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫২

৪৯. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 262

৫০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ এপ্রিল ১৮৬৪, মুনতাসীর মামুন, ১৯৯১, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৫৬-৮; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৩, ৪৬-৭

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৮৯ সালের ১ জুন আগা সাদেক বাজারের প্রতাপ চন্দ্র দে এবং আরো অনেকে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, এখানে মাঝে মাঝে গর্ত করে লাশ ফেলে রাখা হয়। শৃগাল, কুকুর, শকুন উৎপাত করে, সুতরাং তা' বন্ধ করে দেয়া হোক। কিন্তু এতে কিছু মুসলমান বাসিন্দা এসে আপত্তি জানায়।[৫১] এ সময় অসম্পূর্ণভাবে দেয়া কবর ঢাকা শহরের বায়ু, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকের ষাট/সত্তর দশকে ঢাকা জেলায় প্রতি মাসে একজনের থাকা খাওয়ায় খরচ হত ২-৩ টাকা। ১৮৭১ সালে ঢাকার কালেক্টর অনুমান করেন ৫ জন সদস্যবিশিষ্ট ধনী পরিবারের মাসিক ২ পাউন্ড ৬ পেন্স (তৎকালীন ২০ টাকা ৪ আনা) ব্যয় হত।[৫২]

## প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং নিম্নবর্গের দুর্দশা

১৬৬২, ১৭৬৯-৭০, ১৭৮১, ১৭৮৪ ও ১৭৮৭ সাল ছিল ঢাকার জন্য দুর্গতির বছর। উক্ত বছরগুলিতে খরা, অত্যাধিক বৃষ্টি, বন্যা ও জমিদার কর্তৃক মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায় রায়তদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। সম্ভবত এই অর্থনৈতিক মন্দার জন্য উদ্ভব ঘটে লুটতরাজ ও ডাকাতির যা 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' বলে পরিচিত। ১৭৬৩ সালে ক্লাইভ বলেন একদল উচ্ছৃঙ্খল ফকির ঢাকা ফ্যাক্টরি আক্রমণ ও দখল করেন।[৫৩] জমিদারদের উৎপাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়। ফলে চালের দাম বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে যেখানে টাকায় ১৬০ সের চাল বিক্রয় হত, দুর্ভিক্ষের সময় সে চালের দাম হয় টাকায় মাত্র ১৭ সের।[৫৪] ১৭৮৮ সালের স্মরণাতীতকালের বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং অস্বাভাবিকভাবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন ৪ সের চালের দাম হয় এক রূপি।[৫৫] কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন ১৭৮৭-৮৮ সালে ঢাকা জেলায় ভীষণ জলপ্লাবন হয়। ১০ টাকা মণ দরেও চাল পাওয়া যেত না। সমগ্র জেলায় প্রায় ৬০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[৫৬] বর্ষার মৌসুমে দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে গরিব লোকেরা প্রধানতঃ শাপলা বা জলজ পদ্মের বোঁটা ও জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করত। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে; যারা বেঁচেছিল

---

৫১. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৩

৫২. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫৫

৫৩. Ahmad Hasan Dani, (1st published 1956), *Dhaka: A Record of Its Changing Fortunes*, (ed Abdul Momin Chowdhury), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, (3rd revised ed 2009), p. 89

৫৪. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৩; James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 300

৫৫. Ahmad Hasan Dani, (1st published 1956), *Dhaka: A Record of Its Changing Fortunes*, (ed Abdul Momin Chowdhury), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, (3rd revised ed 2009), p. 89; নানা সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে দেখুন যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬৫-৭১

৫৬. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬১; James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 304

*Dhaka University Institutional Repository*

তাদেরও বীজ ও বলদ অবশিষ্ট ছিল না; ফলে জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে তাদের সাধারণ জঙ্গলা উদ্ভিদরাজির চাষ করতে হয়।[৫৭] বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময় আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো কর্ম সংকট বা বেকার সমস্যার উদ্ভব।

১৮৬৬ সালের জুন মাসে গড় বৃষ্টিপাত ছিল ৫.১৩ ইঞ্চি। কিন্তু জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চার মাস গড়ে ৪৩.৬১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। অত্যাধিক বৃষ্টিপাত হওয়ার জন ঢাকার অধিকাংশ ক্ষেতের ফসল পানিতে ডুবে যায় এবং নষ্ট হয়। সেই সময় নারায়ণগঞ্জ, সোয়াপুর ও ফুলবাড়িয়াতে ফসলে একধরণের ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণের পঙ্গপাল দ্বারা আক্রমণিত হয়। ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৬ সালে প্রতি মাসে এক রূপিতে কত সের চাল বিক্রি হত তা নিম্নে প্রদর্শিত হল[৫৮]:

সারণি ২৫

| সময় | উৎকৃষ্ট চাল (সের) | আতব চাল (সের) | সাধারণ চাল (সের) | খেশারি ডাল (সের) |
|---|---|---|---|---|
| মে-জুলাই | ৬ | ৮ | ১৯ | ১৯ |
| আগস্ট | ৫.৫০ | ৮ | ৮ | ১৪.৫০ |
| সেপ্টেম্বর | ৬-৭ | ৮ | ৯ | ১৬ |
| অক্টোবর | ৫.৫০ | ৮ | ৯ | ১৪-১৫ |
| নভেম্বর | ৬ | ১১ | ৫ | ১৪ |
| ডিসেম্বর | ৬ | ১৩ | ১৭ | ২২ |

অথচ পূর্ববর্তী বছরগুলিতে প্রতি রূপিতে উৎকৃষ্ট চাল (Table rice), আতব চাল (Atap rice) ও সাধারণ চাল (common rice) বিক্রি হত যথাক্রমে ১৪ সের, ৩০ সের এবং ৪০ সের। ঢাকার কালেক্টর ক্লে সাহেব লিখেছেন তখন মানুষ অর্ধ বেলা ভাত খেত। অনেকে বার্লি, সাগু, সিদ্ধ কুমরা ও চালের খুত খেয়ে জীবন ধারণ করত। অনেক ভদ্র পরিবারও এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দিন অতিবাহিত করত।

ঢাকা জেলের পূর্বে 'পূরব দেরওয়াজ' মহল্লায় খাজা আবদুল গণি একটি লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৬৬ সালের এপ্রিলে এটি উদ্বোধন করা হয়। এটি ছিল গরিব-দুস্থ, প্রতিবন্ধিদের জন্য আহার ও আশ্রয়ের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৮ সালে এর বাসিন্দা ছিল ১৬ জন নারী, ২০ জন পুরুষ এবং ৬ জন শিশু। এদের বেশির ভাগ ছিল অন্ধ ও বধির। একজন দেশিয় ডাক্তার তাদের দেখাশুনা

---

৫৭. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 299

৫৮. A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 127-8; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫৩

*Dhaka University Institutional Repository*

করত। প্রত্যেক দুস্থকে কক্ষ, পোশাক ও খাদ্য প্রদান করা হত। ভিক্ষুকরা এখানে ভর্তি হওয়ার পর ভিক্ষাবৃত্তি ভুলে যেত।[৫৯]

১৮৭৯ সালের ১৩ জুলাই 'ঢাকা প্রকাশ'-এ *'দেশে অন্ন কষ্ট ঘটিয়েছে'* শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় দু'বছর শস্যহানীর জন্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। টাকায় মাত্র ১০ সের চাল পাওয়া যেত। সাধারণ মানুষ গরুবাছুর, বাসনপত্র ও ঘর বিক্রি করে খাবার সংগ্রহ করলেও সর্বহারা হয়ে পড়েছে। দেশের দু/চার জন বদান্য ব্যক্তি নিজস্ব ব্যবস্থায় কিছু গরিবদের খাদ্যের ব্যবস্থা করলেও তা ছিল জনসংখ্যা অনুপাতে নিতান্তই কম।[৬০]

১৮৮৬ সালে বাংলার কিছু এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তবে প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ছিল উড়িষ্যা। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলিতে কৃষিশ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি অত্যন্ত হ্রাস পায়। এই প্রথমবারের মতো দুর্ভিক্ষের কারণ খতিয়ে দেখা এবং সমাধানসূচক পরামর্শের জন্য বর্ধিত ক্ষমতাসহ *ফেমিন কমিশন* নামে একটি কমিশন গঠন করা হয়। ১৮৯৬-৯৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে আক্রান্ত হয় বাংলাসহ বিহার, বোম্বে, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব। বাংলায় এর প্রাথমিক কারণ ছিল অনাবৃষ্টি। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বরে স্যার জে. বি লায়ল-এর নেতৃত্বে একটি *ফেমিন কমিশন* গঠন করা হয়। কমিশনের পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে বিগত ২০ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়লেও কৃষি-শ্রমিক পেশাজীবীদের মজুরি সেই অনুপাতে বাড়ে নি।

বাংলার কৃষি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি নির্ভর, কৃষকরা বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিহিত ছিল না। তাই অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি এবং প্রকৃতির হেয়ালিপণার জন্য বাংলায় বার বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। আর এই দুর্ভিক্ষের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক কবিতায়। ১৮৯০ সালে ৫ জানুয়ারি 'ঢাকা প্রকাশ' এ একটি কবিতা মুদ্রিত হয়।

**দুর্ভিক্ষ**[৬১]

শ্রীচণ্ডীচরণ হালদার

প্রবেশিল দুরর্ভিক্ষ পূর্ব্ব বঙ্গ দ্বারে
হাটে মাঠে ধান্য চা'ল মিলে নাকো আর

---

৫৯. *History and Statistic of The Dacca Divission*, p. 60
৬০. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৮
৬১. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫১৯-২০

*Dhaka University Institutional Repository*

পূর্ণিত হইল দেশ শুধু হাহাকারে
মলিন হইল দেখি মুখ সবাকার

হেমন্তে দেখেছি কভু স্বর্ণ ভাতি ভরা
পরিয়া শিশির বিন্দু শোভিত প্রভাতে
মুকুতা পড়িয়ে সাজ ধরিয়েছে ধরা
সানন্দে গাইছে গীত কৃষক মঞ্চেতে

বন্দর বাজার হাট নব্য ধান্যে পূরি
রাশি রাশি স্বর্ণ যথা করি আয়োজন
ধরিয়াছে নব শোভা বসুধা সুন্দরী
ধনী দীন সবা মন করিছে হরণ

পাইয়া হেমন্ত এবে শুকাইলে মাঠ
চোকা চোকা বাণ সুখ শরসয্যা প্রায়
ডাকিতেছে দীন ভীষ্মে দেখ বাণ ঠাট
এহ শয্যা দুরর্ভিক্ষে বড় সদুপায়।

ঘাটে কি বন্দরে হেরি আদি অনভাব
বাজরা লইয়া আসে রাশি রাশিকৃতা
লইতে তন্ডুল ধান্য গৃহে যে অভাব
কৃষক করিলে ক্রয় কে হবে বিক্রেতা?

পাইয়া অধিক দর কৃষক সকল
ছাড়িছে ধান্যের কৃষি কোষ্ঠাগত প্রাণ
কাঁদিয়া জননী হেরি বদন কমল
কি দিয়ে বাঁচাব বাছা নাহি চা'ল ধান

*Dhaka University Institutional Repository*

শুভ দৃষ্টে এর প্রতি ভারত ঈশ্বরী
না হেরিলে পূর্ব্ববঙ্গ হবে ছারখার
ত্যাজিবে জীবন যত বালবৃদ্ধ নারী
হেরিতে পারিব রূপ মৃগ তৃষ্ণিকার

হইত যে প্রতি বর্ষে বিদেশে প্রেরিত
বহু লক্ষ মন ধান্য হইবে কি আর?
ভূমি উৎপাদিকা শক্তি হইবে রহিত
জনমিবে মাত্র কিছু নাহিত আর।

কতবর্ষ হলো গত ত্রিপুরা সুন্দরী
অবিরল অশ্রুবারি করি বিগলিত
শ্যামল সুঠাম রূপ এবে দিছে ছারি
ভারতে যে হাসি সে কাঁদে অবিরত।

(মূল লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে)

১৯০৬ সালের বন্যার পর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ৫ টাকা মণ চালের দর হয়ে যায় ১০ টাকা মণ।[৬২]

ঢাকা শহরে শঙ্খ কাজের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা শাঁখারি বাজারে বসবাস করে। ক্লে শাঁখারিদের বাসস্থান সম্পর্কে বলেন, এটি অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, ঘিঞ্জি, স্যাঁতস্যাঁতে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শাঁখারিরা বসবাস করে। ফলে যখন কলেরা ও স্মল পক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তখন অনেক শাঁখারি প্রাণ হারায়।[৬৩] শাঁখারিদের বসতি সম্পর্কে পেট্রিক গেডিডস তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, শাঁখারিরা ৩৬০ ফুট আয়তনের ভূখণ্ডে ২৫০০ জন শাঁখারি বাস

---

৬২. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩৫
৬৩. A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 81

*Dhaka University Institutional Repository*

করে।[৬৪] ১৮৮৩ সালে শাঁখারিদের সংখ্যা ছিল ২৭৩৫ জন।[৬৫] বিশ শতকের শুরুতে যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন ঢাকা শহরে শাঁখারিদের প্রায় ১০০ টি ঘর ছিল। এতে প্রায় ৫০০ জন শাঁখারি বাস করে।[৬৬]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত ভারত থেকে আগত ধাঙড়/মেথরদের মধ্যে মাদ্রাজি, কানপুরি ও নাগপুরিই প্রধান। ১৮৮৫-৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় সংকোচন করেন। এর প্রভাব মেথরদের উপরও পরে। পূর্বে বাৎসরিক প্রিভি ট্যাক্স ছিল ৩৪০০০ টাকা। কিন্তু এ কাজে বাৎসরিক খরচ হয় ৪৫০০০ টাকা। সুতরাং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়াতে কার্যের অসুবিধা না করে আরও ব্যয় সংকোচনের চেষ্টা করা হয়। পূর্বে প্রত্যেক ময়লার গাড়ি একবার ময়লা নিত, এখন প্রত্যেক গাড়ি তিনবার না হলেও অন্তত দু'বার ময়লা নিবে এ বন্দোবস্ত করা হয়। মেথরদের দ্বারা অধিকক্ষণ কাজ করার আবশ্যকতা হওয়ায় ১৮৯০ সালের জানুয়ারি মাঝে এই সম্বন্ধে একটি প্ল্যান করে মিটিংয়ে দেয়া হয়। ময়লা নেওয়ার গাড়ির আয়তন বৃদ্ধি করাতে পূর্বে যে গাড়ি দ্বারা ২০ টাকা পরিমাণ লেট্রিন পরিষ্কার হত এখন সেইখানে ৩০ টাকা হয়। কাজের সুবিধার জন্য গাড়ির বলদ ও মেথর একস্থানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ময়লার গাড়ির বলদ দ্বারা দিনে অন্য কোন কাজ না করিয়ে ঐ সব বলদ পৃথক করে রাখা হয়। এই বন্দোবস্তে এই বিভাগে ৭৫০০ টাকা ব্যয় লাঘব হয়। ১৮৮৮/৮৯ সালে ৮৪ জন মেথর ও মেথরানী আনা হয়।[৬৭] ১৮৮৯-৯০ এবং ১৮৯০-৯১ সালে পৌরসভার পরিচ্ছন্নকর্মী (ঝাড়ুদার) ছিল ৯৩ জন এবং গরুর গাড়ি ছিল যথাক্রমে ৪৬টি ও ৫০টি। এরা প্রতিদিন সকালে প্রধান সড়কগুলিতে এবং বিকালে ছোট ছোট রাস্তাগুলিতে ঝাড়ু দিত। পাবলিক লেট্রিন ছিল ১৩টি এবং প্রসাবখানা ছিল ৬টি। ডোমের সংখ্যা ৭।[৬৮] ডোমদের অপ্রতুলতার জন্য অনেক সময় তারা শবদাহ করার জন্য অধিক টাকা দাবি করত। এমনকি তারা মাঝে মাঝে ১০/১৫ টাকা থেকে ২০/২৫ টাকা পর্যন্ত দাবি করত। এবং অনেক সময় তাদের এই দাবি অনড় থাকত। তাই 'ঢাকা প্রকাশ' ঐসকল ডোমদের অহমিকা লাঘবের জন্য 'জনসাধারণ সভা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সংবাদও ছাপায়।[৬৯]

নিম্নবর্গের বসত বাড়ির প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তারা ছিল পৌরসভা কমিটির নিকট উপেক্ষিত প্রজা। জনশ্রুতি আছে যে, ঢাকা শহর প্রথমে "বায়ান্ন বাজার, তেপান্ন গলি" নামে পরিচিত ছিল। এসব গলিতে বসবাস করত নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন মুচি, কসাই ও পশুপালক প্রভৃতি। এসব গলিতে পানি নিঃসারণের

---

৬৪. Patrik Geddes, 1917, *Report on Town Planning Dacca*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, p. 7
৬৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ জুলাই ২০১১
৬৬. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকায় বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪৫
৬৭. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৯২
৬৮. *Wooden Bundle, A- Proceedings, Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Serial No. 21-22; List No. 7; Resolution on the working of Municipalities in Bengal during 1889-90, 1890-91; p. 47 & 64 (respectively)
৬৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ নভেম্বর, ১৮৭৩; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৬৯

*Dhaka University Institutional Repository*

উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ছিল না। প্রশস্ত পথের অভাব। এই সকল ব্যাধির বিনায়ক মিউনিসিপ্যাল কমিটি এক প্রকার চেতনা শূন্য। এমন কি তাদের রোগ, শোকে ও দুঃখে ঢাকার পক্ষদর্শী মিউনিসিপ্যাল কমিটির একবিন্দু নেত্রজল পতিত হত না। ঢাকার প্রায় অধিকাংশ গলিতেই জলের কল ছিল না। মনে হয় সেসব স্থানের অধিবাসীরা মিউনিসিপ্যাল কমিটির উপেক্ষিত প্রজা।[৭০]

যাতায়তের জন্য যেসব বাহন ছিল তাতেও নিম্নশ্রেণির জন্য কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না। প্রিন্সেস এলিস নামক যে স্টিমারটি চালু করা হয় তাতে তৃতীয় শ্রেণির আরোহীদের বিস্তর অসুবিধা ছিল। যেমন: পায়খানার বন্দোবস্ত ভাল ছিল না। এমন কি নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। খালাসীদের ব্যবহার্য পায়খানাই আরোহীদের মলমূত্র পরিত্যাগ করতে হত। যে স্থানে তৃতীয় শ্রেণির আরোহীগণ অবস্থান করত, সেই স্থানে পশু রাখা হত। তৃতীয় শ্রেণিস্থ স্ত্রীলোকদের জন্য আরো বেশি কষ্টদায়ক ছিল।[৭১]

ঢাকা শহরে পতিতা বা গণিকাবৃত্তির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮৪০ সালে জেমস টেলর শহরের অপরাধ সংঘটনের উৎস হিসাবে শহরের প্রচুর সংখ্যক পতিতালয়কে দায়ী করেন। তিনি আরও বলেন, এখানে খুন-জখম, চৌর্যবৃত্তি ও নরহত্যার দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে।[৭২] শহরের সৌন্দার্য বিকাশের জন্য পতিতা বা গণিকা, চামার, কসাইদিগকে ঢাকার পূর্ব এবং উত্তরাংশে বসবাস করার নির্দেশ দেয়ার জন্য 'ঢাকা প্রকাশ' কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়।[৭৩] শহরে ক্রমশ পতিতাবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ১৮৬৪ সালের ২৬ মে 'ঢাকা প্রকাশ' এ বলা হয়, বিগত দশ বছরে গণিকার সংখ্যা চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে সুরম্য অট্টালিকাতে এবং শহরের অন্যান্য অংশেও পতিতাদের আবাস ছিল।[৭৪] এদেরকে শহর থেকে বাইরে কোন স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু গণিকাবৃত্তি বৃদ্ধির আর্থ-সামাজিক কারণ, প্রেক্ষাপট, কেন নারীরা বিপথগামী হচ্ছে এবং কোন পরিস্থিতিতে হচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। বরং সরকারও গণিকা প্রবৃত্তির প্রবণতার কারণ না খুঁজে গণিকাদের দ্বারা যাতে যৌনসংক্রান্ত বা অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি না পায় সে জন্য চিকিৎসকদের দ্বারা গণিকাদের রোগ পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার সুস্থ গণিকাদের ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রদান করে, যা পক্ষান্তরে গণিকা বৃত্তি ও পতিতালয়ে যাওয়াকেই উৎসাহিত করে। দেহ ব্যবসাকে অনুৎসাহিত করার জন্য গণিকাদের ওপর

---

৭০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ ডিসেম্বর, ১৮৮০; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৭৬-৮
৭১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৯ জানুয়ারি, ১৮৮১; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৬০
৭২. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 282
৭৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ জুন, ১৮৬৩; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৪৩
৭৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ মে, ১৮৬৪; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫৮-৯

*Dhaka University Institutional Repository*

নির্যাতনের উপায় হিসাবে ১৮৬৫ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা প্রকাশ সরকারকে তিনটি পরামর্শ প্রদান করে।[৭৫] যেমন:

প্রথমত: গণিকাদের দেহ ব্যবসার উপর মাত্রাধিক্য কর আরোপ করা যাতে জীবন নির্বাহের জন্য নিম্নতম ব্যয় করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: গণিকাদের উত্তাধিকারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। অর্থাৎ, তাদের মৃত্যুর পর স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা।

তৃতীয়ত: শহর থেকে পতিতা ও পতিতালয় দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত করা। উক্ত পরামর্শগুলি কার্যকর করা হলে সরকারি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং পতিতাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত হবে।

১৮৮০ সালের ৫ ডিসেম্বর 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে জানা যায়, মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ম্যাজিস্ট্রেট, সিভিল সার্জন প্রভৃতির ঐক্যমত্যে স্থির করেছেন যে, ঢাকাতে ১৪ আইন প্রবর্তন আবশ্যক। অর্থাৎ ১৪ আইনের ২০ ধারা প্রবর্তন করে পতিতাদেরকে শহর হতে দূরীভূত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৬] ফলে পতিতাবৃত্তি হ্রাস পায়। বি সি অ্যালান ঢাকা শহরের গণিকাদের সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেক বাজারে গণিকাবৃত্তির প্রচলন ছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল ঢাকা শহরে। তবে পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ জেলার মত অত্যাধিক ছিল না। ১৯০১ সালে পনের থেকে চল্লিশ বছর বয়সী ৪৮৭০০০ জন পুরুষ ২১৬৪ জন নারীর সংস্পর্শে আসে। এ সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় বেশি ছিল না। ঢাকা শহরে গণিকাদের জন্য ব্রাহ্ম সমাজ একটি পুর্নবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে গণিকাদের ভাগ্য পরিবর্তনে কতটুকু সহায়ক ছিল তা সন্দিহান।[৭৭] উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজব্যবস্থার মত গণিকাবৃত্তি তখনও মানুষ ভাল চোখে দেখত না। তাই এদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না।

মুগল আমলে কয়েদিদের খাবার জোগানের জন্য জমিদারদের উপর কর আরোপ করা হত। কিন্তু ১৭৭৫ সালের শেষের দিকে বাংলার নায়েব নাজিমরূপে মুহাম্মদ রেজা খানের নিযুক্তির পর, কয়েদিদের আহার্য জোগানোর জন্য জমিদারদের উপর আরোপিত কর বাতিল করা হয়।[৭৮] তাই কয়েদিদের খাবার জোগানোর জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের প্রথা চালু হয়। এদেরকে পণ্য উৎপাদন, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও সংস্কার এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত

---

[৭৫]. *ঢাকা প্রকাশ*, ২০ জানুয়ারি, ১৮৬৫; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬২-৪

[৭৬]. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ ডিসেম্বর, ১৮৮০; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৭৭; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮০

[৭৭]. B.C. Allen, 1912, *Eastern Bengal District Gazetteers Dacca*, The Pioneer Press, Allahabad, p. 60

[৭৮]. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 217

*Dhaka University Institutional Repository*

করা হয়। ফলে জেলখানা হয়ে ওঠে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে। কয়েদিরা বিভিন্ন ধরনের পোশক, কয়েদিদের পরিধেয় পোশাক, ডাস্টার, পর্দা, টেবিল কভার, বেতের চেয়ার, মড়া, কাগজ, আসবাব-পত্র, ছোট ছোট লৌহজাত দ্রব্য, মাস্টার্ড অয়েল, সুরকি, দড়ি এবং থলে প্রভৃতি তৈরি করত। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির চাষাবাদ করানো হত। জেলখানার প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারে বিক্রি করা হত।[৭৯] তাই শ্রী কেদারনাথ মজুমদার বলেন, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল পূর্ববঙ্গের প্রধান 'জেলখানা'। এ জেলে ১১৮৩ জন কয়েদির স্থান আছে। সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিদের দ্বারা কয়েদির পরিধানের মোটা কাপড় ও বাজারে বিক্রিয়ার্থ অনেক জিনিস প্রস্তুত করানো হত।[৮০] জেলখানায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে সরকার ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে ৯৯৮ টাকা, আগস্ট মাসে ১৬০০ টাকা এবং সেপ্টম্বর মাসের প্রথম ২০ দিনে ১৮০০ টাকা সর্বমোট ৪৩৯৮ টাকা লাভ করে।[৮১] কিন্তু ঐসকল কয়েদিদের ভাগ্যে কতটুকু নির্যাতন ও অত্যাচার জুটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৬৬ সালের ২৬ আগস্ট 'ঢাকা প্রকাশ' এ মুদ্রিত একটি সংবাদে। এতে বলা হয়[৮২]-

> যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতে উপলব্ধি হয়, অদ্য কারাগার পূর্ব্বানুবর্ত্তি যমাগার হইতে বড় হীনকল্প নয়। পুরাণে লিখিত আছে ধর্ম্মরাজ যম বিশেষ বিশেষ পাপীর (ভাগ্য) নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং যম-কিঙ্করেরা লোহ-মুদগলাদি দ্বারা তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া থাকে। আমাদিগের কারাগারের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। বিচারপতিরা যে যে অপরাধীর যে যে শাস্তি বিধান করিয়া এই কারাবাসের আদেশ দেন, যম কিঙ্কর সদৃশ্য কারারক্ষকেরা সেই সেই ব্যক্তিদিগের তদতিরিক্ত ভয়ানকরূপে প্রহারাদি করিয়া থাকে। বিশেষের মধ্যে এই যম কিঙ্করেরা পাপীদিগের প্রতি যমরাজের আদেশ বহির্ভূত কোন কোন আচরণ করে। রক্ষকেরা স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধীদের প্রতি অসদাচার প্রকাশ করে এবং যমকিঙ্করদিগের দৌরাত্ম্যে কিছুতেই নিবারিত হইতে পারে না। কিন্তু কারারক্ষকদিগের অত্যাচার টাকা ব্যয় করিলেই নির্ধারিত হয়।
>
> শুনিতে পাই, কোন ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেই কয়েক প্রভু তাহাদিগের উপর এরূপ প্রহার আরম্ভ করেন যে, সাধ্যনুযায়ী টাকা দিতে স্বীকার না করিলে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। যে ব্যক্তি যত সম্ভ্রান্ত [অস্পষ্ট] তত দৌরাত্ম্য হইয়া থাকে। উক্ত প্রভুদিগকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্টি রাখিতে না পারিলে প্রায় সকলকেই প্রহার যাতনা সহ্য করিতে হয়। এবং যে সকল কার্য সম্পাদনে অধিকতর পরিশ্রম ও কষ্টভোগ, প্রতিনিয়ত সেই সকল কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অশন, বসন ও শয়নাদির অসহনীয় যন্ত্রণার ত কথাই নাই। এতন্নিবন্ধন কত ব্যক্তিকে অল্পহারে ক্ষুধিত, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ গাত্র ও শয়নাভাবে [অস্পষ্ট] থাকিতে হয়, বলিয়া শেষ করা যায় না। এই নিমিত্ত অনেকে এই কারাগার হইতে পূর্ব্বোক্ত যমাগারে বদলি হইতেও সমুৎসুক, তথাপি এখানে তিষ্ঠিয়া

---

৭৯. A. L. *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 75
৮০. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী, (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৬৫-৬
৮১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৬৩
৮২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ আগস্ট, ১৮৬৬; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৪৮-৯

*Dhaka University Institutional Repository*

> থাকিতে চায় না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত অত্যাচার বহির্নির্বাপণ চেষ্টা করিবেন কি আরো প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল আমাদিগের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ক্লে সাহেব এতৎসম্বন্ধে যে একটি অদ্ভুত বিচার করিয়াছেন, তদদ্বারা ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা।
>
> (মূল লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে)

জেলখানায় কয়েদিদের খাবার খরচ কিরূপ ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে হয় জন প্রতি কয়েদির খাবারের স্বল্পতা ছিল। ১৭৯০ সালে রাস্তায় কর্মরত একজন অপরাধ সংক্রান্ত বন্দীর জন্য দৈনিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল এক আনা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য। ১৮৩৮ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় দু'পয়সা।[৮৩] কয়েদিদের চিকিৎসার জন্য একজন সার্জন থাকত। ১৮৬৮ সালে গড়ে দৈনিক ১৪ জন কয়েদি অসুস্থ ছিল। স্থায়ীভাবে শতকরা ৩ জন অসুস্থ থাকত। ঐ বছর ১৬ জন কয়েদির মৃত্যু হয়। পরবর্তী বছরও প্রায় একই সংখ্যক (১৫ জন) কয়েদির মৃত্যু হয়।[৮৪] ১৮৭০ সালে সরকার জেলখানায় কয়েদিদের আহার কমানোর প্রস্তাব করে। 'ঢাকা প্রকাশ' সরকারি এই হীন প্রস্তাবের সমালোচনা করে এবং কয়েদিদের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, অস্বাস্থ্যে মনোবৃত্তি নষ্ট হয়। আর মনোবৃত্তি নষ্ট হলে মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়। তাছাড়া কয়েদিগণ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কারাভোগ করার পর মুক্তি পাবে। কিন্তু আহারের স্বল্পতার জন্য তাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবে এবং এর প্রভাব তার সারা জীবন ভোগ করতে হবে। যা কাম্য নয়।[৮৫] আবার জেলখানায় এমন সকল কয়েদিদের আটক রাখা হত যাদের বিরুদ্ধে কখনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। ঢাকা জেলে আঠারো শতকের সত্তর দশকে ১১০ জন কয়েদি ছিল। এদের মধ্যে ৯৫ জন ছিল সড়ক নির্মাণ ও লোহার কাজে সম্পৃক্ত, আদালতে যাদের কখনও দোষ প্রমাণিত হয়নি। এরূপ অবস্থায় তারা ৯ বছর জেলখানায় ছিল।[৮৬]

রমনা একসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ১৮২৫ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ডস কয়েদিদের সাহায্যে সেই জঙ্গলের একাংশ কেটে পরিষ্কার করেন। সেই পরিস্কৃত অংশে রেলিং দিয়ে তৈরি হয় রেসকোর্স।[৮৭] এ রেসকোর্স ময়দানে উচ্চবিত্তদের প্রমোদের জন্য প্রতিবছর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বহু অর্থ খরচ করে চলত ঘোড়দৌড়। ১৮৪০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট স্কীনার কয়েদিদের দিয়ে ঢাকার রাস্তা পরিষ্কার করার কাজটি করান। ১৮৪২ সালে লালবাগ দুর্গের সংস্কার প্রকল্পে সরকার কয়েদিদেরকে দেয়াল ও অট্টালিকাগুলি মেরামতের কাজে শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। রাস্তা সংস্কার ও উন্নয়নের কাজগুলি প্রায় সবই কয়েদিদের দ্বারা করানো হত। বিভিন্ন সময়ে কয়েদিদের দিয়ে ধোলাই খালের কিছু অংশ খনন করে গভীর করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিটি মুসলমানদের জন্য

---

৮৩. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 286-7
৮৪. W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, p. 134-5
৮৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ জুন, ১৮৭০; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৮
৮৬. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 217
৮৭. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৯০

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকায় ৫ টি (নারিন্দা, আগা সাদেক ময়দান, ফিনিক্স পার্ক, লালবাগ ও নবাবগঞ্জ) কবরস্থান করলে কয়েদিদের দিয়ে এ স্থানগুলি পরিষ্কার ও বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়।[৮৮] কয়েদিদের দ্বার ঢাকার বাইরের রাস্তাও নির্মাণ করা হত। যা বিশ শতকের শুরুতেও পরিলক্ষিত হয়। ছয়শত কারাবন্দীদের দ্বারা ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করানো হয়।[৮৯]

## বর্ণ বৈষম্য

১৮৬৪ সালের এপ্রিলে 'মিউনিসিপ্যাল কমিটি' ঢাকার কৃষ্ণকায় বাঙ্গালি জনসাধারণের জন্য একটি বৈষম্যমূলক হুকুম জারি করে। নির্দেশটির সারকথা ছিল কৃষ্ণকায় বাঙ্গালিরা সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে বুড়িগঙ্গার তীরে প্রবেশ করতে পারবে। দিনের বাকি সময় ইউরোপীয় সাহেব ও বেগমগণ বুড়িগঙ্গার তীরে বায়ু সেবন করবে। এ নিয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' একটি সংবাদ পরিবেশন করে এবং ঢাকা শহরে স্থানীয় সাধারণ কৃষ্ণকায় মানুষদের বসবাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে। সংবাদটিতে বলা হয়[৯০]-

. . . ৪/৫ দিবস অতীত হইল তিনি (ম্যাজিস্ট্রেট) এই আদেশ করিয়াছেন বেলা ৯ টার পূর্ব্বে. . . বালুকাময় ঘাটে কেহই স্নান করিতে পারিবে না। ৯ টার পর অবধি ৩ টার পূর্ব্ব পর্যন্ত যেটুকু সময় আছে, তন্মধ্যেই কাজ সারিতে হইবে। কিন্তু সদরঘাটে কোন সময়েই স্নান করা যাইবে না।. . . . বর্ষাত্যয়ে ঢাকার নদীর তীর অতি রমণীয় হইয়া উঠে, সাহেবরা সস্ত্রীক সকালে বিকালে তথায় বায়ু সেবন করিয়া বেড়ান। তাহারা দেখিতে পান, কৃষ্ণকায় বাঙালিরা নির্ভয়ে অনাবৃত শরীরে স্নান করে, গাত্র মর্দ্দন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হয় না। এই ব্যাপার তাঁহাদিগের বিশেষত মেমসাহেবদিগের নিতান্ত অসহ্য ও ঘৃণাকর। অতএব. . . যাহাতে ঘৃণিত বাঙালিরা এই ঘৃণিত ব্যবহার করিতে না পারে, তাহার উপায় স্বরূপই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই হুকুম জারি করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগকে অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। আজি বাঙালীদিগের ইচ্ছানুসারে নদীতে স্নান করা রহিত হইল, কালি সাহেবদিগের গমনাগমনের পথ দিয়ে চলা রহিত হইবে এবং দুইদিন পরে সাহেবরা যে নগরে বাস করেন অপরিশ্কৃত বাঙালিদিগের সেই নগরে বাস করাও রহিত হইবে। হা দুর্ভাগ্য বাঙালি সকল! তোমরা নৈসর্গিক সাধারণাধিকার জলবায়ু রৌদ্রাদি লাভ করিতেও বিড়ম্বিত হইতেছে। . . . . এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যেন আমরা কোন রাক্ষসের রাজ্যে বাস করিতেছি। তাঁহার অনুচরেরা আমাদিগকে পদে পদে উৎপীড়ন করিতেছে। যাহা হউক, প্রস্তাবের উপসংহারকালে স্থানীয় লোকদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, তাহারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করুন যেন তিনি এই আদেশ শীঘ্রই পরিবর্তন করিয়া ফেলেন. . . . . ।

(মূল লেখা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে )

---

৮৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭২, ১৭৬ ও ১৭৭

৮৯. *Report On the Census of Bengal*, 1901, Vol. 6, part 1, p. 56

৯০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ এপ্রিল, ১৮৬৪; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৪৭-৮

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকার কমিশনার বকল্যান্ড দেশিয় বিত্তবানদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বুড়িগঙ্গার তীরে 'বকল্যান্ড রোড' নামে একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এই রাস্তায় বিশুদ্ধ ও শীতল বায়ু সেবনার্থে ঢাকার সাধারণ মানুষ ও ইউরোপীয়রা প্রতিদিন সকাল বিকাল বিচরণ করত। কিন্তু ক্রমশ বিচরণকারী বাঙ্গালিদের সংখ্যাধিক্য দেখে ইউরোপীয়রা বর্ণ বৈষম্যের সৃষ্টি করে। কৃষ্ণকায় বাঙ্গালিদের সাথে একপথে বিচরণ করা লজ্জাজনক মনে করে এই পথে বাঙ্গালিদের ভ্রমণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিদেশি উচ্চবর্গের গাড়ি ঘোড়া নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাস্তা করা হয়। ফলে সাধারণের যাতায়তের জন্য কয়েক হাত প্রশস্তমাত্র একটি ছোট পথ সৃষ্টি করা হয়। এতে ঢাকাস্থ সর্বসাধারণ বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করে।[৯১] মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণও ঢাকার সর্বশ্রেণিস্থ লোকের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করেনি। কারণ যারা কমিশনার নিযুক্ত হতেন তারা উচ্চবেতনভুক্ত রাজ-কর্মচারী, প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, জমিদার, দুই বেলা গাড়ি-ঘোড়া চড়ে বেড়ান, উচ্চ ভাষায় রাজপুরুষকে প্রশংসা করেন। এসব ছিল কমিশনার মনোনয়নের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা পৌরসভা যখন শহর উন্নয়নের কথা ভেবেছে তখন প্রায় ক্ষেত্রেই প্রভাবশালী শ্রেণির কথাই ভেবেছে। অধঃস্তন শ্রেণির কথা নয়। কারণ, পৌর কমিশনারগণও দেশি এবং বিদেশি উচ্চবর্গের শ্রেণি স্বার্থের কথা ভেবেছে। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক বিদ্যুতের কথা। যে অঞ্চলে বৈদ্যুতিক বাতির প্রয়োজন ছিল বেশি (বিশ শতকের গোড়ার দিকে) সেসব অঞ্চলে তা না বসিয়ে বসানো হয়েছিলো প্রধানত ইংরেজ ভদ্রলোক অধ্যুষিত অঞ্চলে বা রেসকোর্সের রাস্তায়। পানি সরবরাহের ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গকে বঞ্চিত করা হয়। উয়ারীতে যেখানে বসবাস করতেন সরকারি কর্মচারী বা ভদ্রলোকেরা সেখানে স্থাপিত হাইড্রেন্টের সংখ্যা এবং ঘিঞ্জি এলাকায় স্থাপিত হাইড্রোন্টে সংখ্যা বিচার করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐ সময় সরকারি রিপোর্টেও তা স্বীকার করা হয়েছিল।[৯২]

ঢাকা শহরের নিম্নশ্রেণির মানুষজনের জীবন নিরাপদ ছিল না। এমন কি তাদের ধর্মীয় আচার-বিশ্বাসও নিরাপদ ছিল না। শহরের অধিবাসীরা কলেরা বা ওলাউঠার মত প্রাণ নাশক রোগের অভিজ্ঞতা বারবার প্রত্যক্ষ করেছে। মাঝে মাঝে তা মহামারি আকার ধারণ করত। যারা গোড়া হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তারা বিশ্বাস করত, যদি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও দেবার্চ্চনা করা যায় তাহলে এই পীড়া থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। তাই তারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বহুসংখ্যক লোক দলে দলে মশাল নিয়ে বাড়ির নিকটবর্তী প্রশস্ত রাজপথে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করতেন। কিন্তু একদিন মিছিলে ঢাকার কিছু ইংরেজ সাহেবদের বহনকারী একটি ঘোড়ার গাড়ি মিছিলকারীদের সর্তক না করে মিছিলটির মধ্যে দ্রুতবেগে চালিয়ে দেয়। আরোহীদের মধ্যে বিচার বিভাগের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। এমন মিছিলের জন্য তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পরবর্তী দিন থেকে পুলিশ সঙ্কীর্ত্তনকারীদের মিছিল বের করতে

---

৯১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ আগস্ট, ১৮৮২; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৭৮-৯

৯২. Nazia Hussain, 'The Municipality in British Dacca', Bangladesh Past Present, London, 1976; উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২১-২

*Dhaka University Institutional Repository*

বাধা দেয়। সম্ভবত ক্ষুব্ধ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই পুলিশদেরকে ঐরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯৩] সাহেবদের সৌখিন ঘোড়া দৌড়ের জন্য নিম্নশ্রেণির মানুষদের মূল্য দিতে হত। অথার্ৎ ঢাকা শহরে জনাকীর্ণ রাস্তায় সৌখিন অশ্বারোহীগণ সখ করে মানুষদের উপর দিয়ে সজোড়ে ঘোড়া দৌড়াইতো এবং পৃষ্ট হত সাধারণ মানুষ। সাধারণের এরূপ অশান্তি ও প্রাণান্ত হতে দেখেও পুলিশ এবং পুলিশের পরিচালক সরকার উদাসীন থাকত।[৯৪]

## স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধি

শহরে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল দেশিয় হাসপাতাল, পাগলা গারদ, জেল হাসপাতাল ও রোগ প্রতিষেধক বীজাগার বিভাগ প্রভৃতি। ১৮০১ সালে ঢাকার অধিবাসী ছিল ২,০০,০০০ জন অথচ ১৮০৩ সালে চাঁদার সাহায্যে একটি দেশিয় হাসপাতাল নির্মাণ করা হয় যাতে মাত্র ৪০ জন রোগীর স্থান-সংকুলান হত। যেসব রোগীরা এ হাসপাতালে ভর্তি হতে আসত, তারা দরিদ্র, নির্বান্ধব ও নিঃস্ব ব্যক্তি। সুতরাং বোঝতে অসুবিধা হয় না সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণি চিকিৎসার ক্ষেত্রে কতটা বঞ্চিত ও অবহেলিত ছিল। পূর্বের অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে উৎপাদন রীতির পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুযোর্গের জন্য ঢাকা শহরে উনিশ শতকের পর লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। তাই উনিশ শতকের পর শহরের অভ্যন্তরভাগে পরিত্যক্ত মরা জীবজন্তু ও বন-জঙ্গল এবং নানাবিধ ময়লা আবর্জনায় বহু অবরুদ্ধ খাল-নালা ও গর্ত পূর্ণ হয়ে যায়। এতে পার্শ্ববর্তী কুপগুলির পানি দূষিত হয়ে পড়ে। ফলে ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। দরিদ্র শ্রেণির অধিবাসীরা অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে রোগব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রতি বছর ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটে। এতে হতভাগ্য নিম্নশ্রেণির মানুষ চরম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।[৯৫] এছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবীরা কায়িক শ্রমের জন্য নানা অসুস্থতায় ভুগত। কারিগর শ্রেণির লোকেরা যারা কাপড় বোনে, সুতা কাটে এবং কাপড় ধৌত করে তাদের মধ্যে দৃষ্টিহীনতা, রাতকানা এবং এমন কি, মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত। শাঁখারিদের মধ্যে কোমরবেদনা জনিত রোগও পরিলক্ষিত হয়। দর্জি, সুচীকর্মশিল্পী ও লেখকদের মধ্যে অত্যাধিক কিংবা আংশিক ঘামের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হত।[৯৬]

ঢাকার সহকারী সিভিল সার্জন কাটক্লিফ ১৮৬৯ সালে ঢাকা শহর সম্পর্কে পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি রিপোর্টে লিখেন যে, ঢাকা শহরে ময়লা নিষ্কাশনের কোনো বন্দোবস্ত নেই এবং যুগ

---

৯৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৭৯-৮০
৯৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৪; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৯৮
৯৫. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 367
৯৬. James Tylor, *Topgraphy of Dacca*, p. 348

*Dhaka University Institutional Repository*

যুগ ধরে এই মলমূত্র আবর্জনা সঞ্চিত হচ্ছে শহরের লোকদের বাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তায়। শহরের কুয়োর পানি ভয়ানকভাবে দূষিত, এর মধ্যে যতসব ময়লা আবর্জনা; খালের ও নদীর পানি দূষিত, শহর বিভক্ত অসংখ্য সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি দ্বারা এবং সেখানেও ময়লা উপচে পড়েছে, ফলে বাতাস দূষিত। আর এছাড়া আছে নোংরা খাল, দুর্গন্ধময় ড্রেন এবং জঙ্গল।[৯৭]

ঢাকার কালেক্টর এবং মহীয়সী ব্যক্তি রবার্ট মিটফোর্ড কর্তৃক প্রদেয় ১৬৬০০০ রূপির সহায়তায় ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম ১৮৫৮ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠা করা হয় মিটফোর্ড নামক একটি হাসপাতাল। ঢাকা শহরে লেডি ডাফরিনের শুভ আগমন উপলক্ষ্যে তাঁর সম্মানার্থে নবাব আহসনুল্লাহ বাহাদুর একটি হাসপাতাল নির্মাণ করতে ৫০০০০ রূপি দান করেন। এই অর্থ দিয়ে ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডাফরিন লেডি হাসপাতল।[৯৮] মিটফোর্ড হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার পরে দেশিয় সকল হাসপাতাল এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ সালে এ হাসপাতালে মাত্র ৯২ জন রোগীর স্থান হত। ১৮৭১ সালে হাসপাতালটিতে চিকিৎসার জন্য ১০৭৬ জন রোগী ভর্তি হয়েছিল। তন্মোধ্যে ৮৬৫ জন আরোগ্য লাভ করে; ১৭৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বছর শেষে চিকিৎসার জন্য ৩৩ জন হাসপাতালটিতে অবস্থান করে। ১৮৮৭ সালে হাসপাতালটিতে একটি ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড চালু করে। ঢাকার নবাব আসানউল্লাহ ও ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় কর্তৃক দানের অর্থ দিয়ে ১৮৮২ সালে একটি ফিমেল ওয়ার্ড (Female Ward) স্থাপিত হয়।[৯৯]

১৮৮১ সালে ঢাকার কলেরার চিত্র একেঁছেন সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেন যেভাবে- কলেরা তাঁতিবাজার হইতে শুরু করিয়া ধীরে ধীরে বাবু বাজার মুখে রওয়ানা হইল। স্কুলে যাইয়া দেখিতাম ক্রমশ ছেলে কমিয়া যাইতেছে, তাহারা ভয়ে ঢাকা ছাড়িয়া যাইতেছে। পথে দোকান পাটে শুষ্ক ভীত লেত্র লোকগুলি দাঁড়াইয়া কেবল ঐ ব্যারামের কথাই বলিতেছে।[১০০] ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ঢাকা পৌরসভায় প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ২৫.২৩ এবং মৃত্যুহার ছিল ৩১.৪১। ওলাউঠা, বসন্ত, জ্বর, উদরাময়, আঘাত ও অন্যান্য কারণে প্রতি হাজারে মৃত্যু হয় যথাক্রমে ২.৬৭, ০.০২, ১৪.৫৩, ৪.৩০, ০.৩৬ ও ৯.৫৩ জনের।[১০১]

---

[৯৭]. From Assistant Surgeon H.C. Cutcliffe, F.R.C.S, Officiating Civil Surgeon of Dacca to the Chairman of the Municipal Commissioner of Dacca, No. 106, Dated Dacca 7.4.1869, *Proceedings of the Lieutenant Governer of Bengal*, Judicial Department, September, 1879; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২৩

[৯৮]. Ahmad Hasan Dani, (1st published 1956), *Dhaka: A Record of Its Changing Fortunes*, (ed Abdul Momin Chowdhury), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, (3rd revised ed 2009), p. 102

[৯৯]. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পা) *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৫

[১০০]. দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৯৬৯, *ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য*, কলকাতা, পৃ. ৭২; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১১৩

[১০১]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা) *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট 'এ' পৃ. ৬৯১

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকা শহরের পশ্চিমাংশে চকবাজারের নিকটে ১৮১৯ সালে মানসিক রোগীদের জন্য একটি পাগলা গারদ তৈরি করা হয়। ঢাকার প্রথম মুগল সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক নির্মিত দুর্গের নিকটেই এটি অবস্থিত। ১৮৬৬ সালে এই গারদে ৫টি সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা, চারজনের অবস্থানোপযোগী ৭টি কক্ষ এবং নির্জন বাসোপযোগী ৩২টি কক্ষ ছিল।[১০২] ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছার, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, বগুড়া, কুচবিহার এবং আসাম প্রদেশের রোগীকেও এখানে প্রেরিত হত। ১৮৫৭ সাল হতে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবৎসরে গড়ে ৯৫ জন করে রোগী ভর্তি হত। এর মধ্যে গঞ্জিকাসেবন জন্য বিকৃত মস্তিষ্কের সংখ্যাই অধিক। গারদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ২৬০০০ টাকা। এই সমুদয় ব্যয় সরকারই বহন করত। ঢাকার সিভিল সার্জন, কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও কয়েকজন দেশিয় সম্ভ্রান্তলোক গারদটির সম্মানিত পরিদর্শক (Honarory visitors)।[১০৩] সিভিল সার্জন গারদটির সুপারইনটেনডেন্ট (Superintend) হিসাবেও দায়িত্ব পালন করত।

১৮৬৮ সালের ১ জুলাই গারদটিতে ১৬৬ জন পুরুষ ও ৩৬ জন নারী মানসিক রোগী ছিল। এসকল রোগীরা বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও মিটফোর্ড হাসপাতালে সেবা প্রদান করত। যেমনঃ fetching water, pounding surki, carpentry, morah-making, baking, cane-cutting etc. গড়ে ৭৩ জন রোগী এসব উৎপাদনমুখী কাজ করত এবং ৩৫ জন রোগী আশ্রয়স্থানের দেয়ালের ভিতরে গৃহস্থলীর দায়িত্ব পালন করত। প্রায় ২৬ জন নারী রোগী cooking, grinding flour, sewing, pounding surki and cleaning the female wards এর কাজে নিযুক্ত ছিল। শতকরা ৫৯ জন বা দৈনিক সর্বমোট ১৩৫ জন রোগী কাজ করত। একজন ওভারসিয়ার, একজন দেশিয় ডাক্তার, চারজন জমাদার, একজন জমাদারিনী, বাইশজন বরকান্দাজ, তিনজন নারী ওয়ার্ডার, দুইজন নাপিত, দশজন ঝাড়ুদার, একজন হিন্দু কুক, একজন মালী, দুইজন ওয়াসারম্যান এবং একজন মিস্ত্রী নিয়ে পাগলা গারদটি চলত। একজন সিভিল সার্জন সমগ্র গারদটির সুপারইনটেনডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করত।[১০৪] পূর্বে জেল হাসপাতাল নওয়াবদের টাকশাল বা মিন্ট ছিল। পরবর্তীতে এটি পাহারা চৌকি বা গার্ড-হাউসে পরিণত হয়। ১৮৪৭ সালে এটিকে ঠগ, খুনি ও হিংস্র অপরাধীদের জন্য কয়েদিখানায় রূপান্তরিত করা হয়। ১৮৪৯ সালে এটিকে জেল হাসপাতাল করা হয়। তখন থেকে এটি অসুস্থ কয়েদিদের জন্য একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর ওয়ার্ড সংখ্যা ৫। যার মধ্যে একটিতে ঔষধ

---

[১০২]. A.L Clay, *History and Statistic of The Dacca Divission*, p. 59; W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, p. 148; যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী, (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৪

[১০৩]. A. L. Clay, *History and Statistic of The Dacca Divission*, p. 59; W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, p. 149; যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৪

[১০৪]. A.L. Clay, *History and Statistic of The Dacca Divission*, p. 59; W.W. Hunter, *Statistical Account of Dacca District*, vol. v, p. 148

*Dhaka University Institutional Repository*

রাখা হত। তিনটিতে রোগীর ধারণ ক্ষমতা ১৬ জন এবং বাকী কক্ষটিতে ৮ জন। হাসপাতালে একজন দেশিয় ডাক্তার ও একজন কমপাউন্ডার থাকত।[১০৫]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ঢাকা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ছল নিম্নশ্রেণি ও স্বল্প আয়ের মানুষ। তারা বিভিন্ন গলিতে বাস করত এবং তাদের ঘর-বাড়ি ছিল খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি। মুগল আমলের তুলনায় ঔপনিবেশিক আমলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আরও করুণ হয়। উনিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তাদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পর বারংবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পেলেও সকল পেশাজীবীদের আয় বৃদ্ধি পায়নি। উদাহরণস্বরূপ ১৮৮৯ সালে ঢাকা জেলার একজন ভূমিহীন দিনমজুর/ভৃত্যের মাসিক আয় ছিল মাত্র ৮ টাকা। অন্যদিকে স্বল্প আয়ের মানুষরা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহে অপরাগ ছিল। সুতরাং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাতপদ থাকাটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণকায় বাঙ্গালিরা বিদেশি উচ্চবর্গ কর্তৃক বর্ণ বৈষম্যের স্বীকার হয়। যেহেতু নিম্নশ্রেণি স্যাঁতস্যাতে, ঘিঞ্জি গলি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করত তাই প্রতিবছর নানান মহামারির সম্মুখীন হত। অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার জন্য তাদের মধ্যে মৃত্যুর হারও ছিল বেশি। শ্রেণি বৈষম্যের স্বীকার এসব সাধারণ মানুষ কতটুকু রাজনৈতিক সচেতন ছিল তা আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

---

[১০৫]. A.L. Clay, *History and Statistic of the Dacca Division*, p. 60 (The jail hospital was formerly the Tak-Sal or Mint of the Nawabs. Until 1836 the Kotwali was located there; it then became a guardhouse. In 1847 it was converted into a prison for thuggee criminals. In 1849 it was made the jail hospital, and has ever since been the only asylum for sick-prisoners. The number of wards is five. One is used as a dispensary. Three are capable of containing 16 patients each, and one is 8. The establishment consists of 1 native doctor and 1 compounder. The duffadar burkandazes are borne on the rolls of the jail.)

Dhaka University Institutional Repository

# চতুর্থ অধ্যায়

## রাজনৈতিক চৈতন্য

Individualism বা Individuality হলো বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত ধারণা। স্বাতন্ত্র্যবোধ যেভাবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রায়োগিক তদ্রূপ সমাজ, বর্ণ, গোষ্ঠী এবং জাতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। উচ্চবর্গের স্বাতন্ত্র্যবোধের পাশাপাশি নিম্নবর্গের চৈতন্য বা স্বাতন্ত্র্যবোধও ক্রিয়াশীল থাকে। যখন নিম্নবর্গের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় তখনই বিপত্তির সৃষ্টি হয়। অথার্ৎ তখন তাদেরকে বিদ্রোহী, বিপ্লবী, প্রতিবাদী, শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী প্রভৃতি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হয়। জীবন-জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু কর্মতৎপর এই শ্রেণিটির মধ্যে সুপ্ত এক প্রকার নিবিড় ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়, তাদের টিকে থাকার আকঙ্ক্ষায়, আত্মপ্রকাশের অভীপ্সায়। শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত নিম্নবর্গের সহজাত এই মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করে। সম্মিলিত হয় তারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে। নিম্নবর্গ যেহেতু আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ এবং রাজনৈতিক ভাবে অসচেতন তাই তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চৈতন্য নিয়মিতভাবে ঘটে না। আবার অনেক সময় দুর্বল সংগঠিত হওয়ার জন্য এবং নেতৃত্বের অভাবে তাদের আন্দোলন শাসক শ্রেণি বা উচ্চবর্গ কর্তৃক দমিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ- সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, পাবনা কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ও ফরায়েজী আন্দোলন ইত্যাদি। তবে এসব বিদ্রোহে তারা স্বস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। আবার মাঝে মাঝে পেটি-বুর্জোয়া কর্তৃক আহ্বানে তাদের জমায়েত হতে দেখা যায়। 'নিম্নবর্গ' তাদের নিজেদের কর্মের দলিল রেখে যায় না কিংবা তারা নিজেদের ইতিহাস লিখতে পাড়ে না। তাদের জীবন সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করেন ইতিহাসবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীরা। যাইহোক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রত্যক্ষ ইতিবাচক দিক হলো ভারতীয় জনগণের মধ্যে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় রাষ্ট্র কাঠামো ও রাজনৈতিক দল গঠনের প্রবণতা। তাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রথম প্রজন্ম ১৮৮৫ সালে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ দলটি গঠনের উদ্যোক্তা ও নেতৃবৃন্দ ছিল দেশি-বিদেশি উচ্চবর্গ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় তারা ব্রিটিশদের চোখে পুরো ভারতবর্ষকে দেখত। আমার গবেষণার সময়সীমা হলো ১৮৬৪ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো- ঢাকা পৌরসভায় নির্বাচন প্রবর্তন, কর বৃদ্ধি, ইলবার্ট বিল (১৮৮৩), সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯০) এবং বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) প্রভৃতি। এসব পদক্ষেপসমূহের সাথে ঢাকা শহরের নিম্নবর্গের সম্পৃক্ততা ছিল কিনা? অথবা তাদের চৈতন্যকে আদৌ স্পর্শ করেছিল কিনা? তাদের এ চৈতন্যের ধরণ

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রকৃতি নিরূপণ করা আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। এছাড়া ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংগঠিত হওয়ার বিষয়টিও সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে।

## নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ও নিম্নবর্গ

১৮৬৪ সালের ১ আগস্ট ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠা ও স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর পৌরসভার প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট থেকে সকল সদস্যদেরকে মনোনয়ন দিতেন। ডিভিশনাল কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিভিল সার্জন ছিলেন পদাধিকারবলে সদস্য। কমিশনারের সংখ্যা ছিল ১৪-২৩ পর্যন্ত। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষক জজ বিলার্ট ছিলেন ঢাকা পৌরসভার যথাক্রমে প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান। প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্যদের একটি তালিকা জানা যায় নির্ম্মল গুপ্তের গ্রন্থ থেকে। সদস্যরা ছিলেন কুক, ল্যাম্ব, ওয়াইজ (নীলকর), ব্রজমোহন রায়, মির্জা গোলাম পীর, সোয়াটসন, ব্রজরতন দাস, আলি মিয়া, মির্জা মোহাম্মদ খান, আরাতুন, মোহাম্মদ আকমল খান, কৃষ্ণ মোহন রায়, রেভারেন্ড শেফার্ড, গোলক নারায়ণ রায়, জেমস হলিং, উইলসন, সারকিস ও রাজমোহন রায়।[১] উক্ত তালিকা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পৌরসভার উচ্চপদস্থ সদস্যরা ছিল ইউরোপীয় এবং কমিশনার নিযুক্ত হত ইউরোপীয় ও দেশিয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির বিত্তবান লোক। পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার দু'বছর পর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এর প্রকৃতি ও যোগ্যতা সম্পর্কে একটি সাপ্তাহিক প্রত্রিকায় অত্যন্ত তীর্যকভাবে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।[২] প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, যাঁরা উচ্চবেতনভুক্ত রাজ কর্মচারী, জমিদার, মহাজন, প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, দুই বেলা গাড়িঘোড়াতে ঘুরে বেড়ান এবং চাটুকারিতায় পটু তাঁরা পৌরসভার কমিশনার পদে মনোনীত হতেন। সুতরাং মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলিতে নিম্নবর্গের স্বার্থ দেখার মতো কেউ ছিল না। পৌরসংস্থার অকার্যকারিতার নানান কারণ থাকলেও চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনাররা ছিলেন সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত। এরা কেউ সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হতেন না। সুতরাং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি ওঠে। ১৮৮০ সালে 'ঢাকা প্রকাশ' মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও সভা করার জন্য 'জনসাধারণ সভা'কে অনুরোধ জানিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে।[৩] তাই এ ব্যাপারে 'ঢাকা জনসাধারণ' এগিয়ে আসে। এই সভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিশিষ্ট মানুষজনসহ স্থানীয় জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা। দীর্ঘকাল এই সভা নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনও চালিয়েছিল। তাদেরই উদ্যোগে ১৮৭৪ সালের ২৪ জুন ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের কাছে

---

১. নির্ম্মল গুপ্ত, শ্রাবণ ১৩৬৬, *ঢাকার কথা*, আলিপুর, কলিকাতা, পৃ. ৬৩
২. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ২১
৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ৭ মে ১৮৮০; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৭৩-৪

*Dhaka University Institutional Repository*

৭০০ নাগরিকের স্বাক্ষরসহ নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আবেদন পত্র পাঠানো হয়। কিন্তু আবেদনটি গৃহীত হয়নি।[৪] স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় লোকজন এর করদাতা, সুতরাং তারাই মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে সমধিক অধিকার ও স্বত্ব রাখে। কিন্তু সরকার তার কতৃর্ত্ব প্রয়োগের জন্য বিদেশি ব্যক্তিবর্গকে কমিটির মূখ্যকর্তা নিযুক্ত করত। অনেক সময় প্রজাসাধারণের অসম্মতিতে সরকারের মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে কমিটির কমিশনার নির্বাচিত করা হত। আরও অবাক কাণ্ড এই যে, যারা করদাতা নয়, এমনকি যারা পৌরসভার সীমানার মধ্যে স্থায়ি অধিবাসী ছিল না বরং কাজের সুবাধে মিউনিসিপ্যালিটিতে বাস করছে। তাদেরকেও কমিশনার পদ প্রদান করা হত। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা ঢাকার মঙ্গল সাধিত হচ্ছে তা বলা যায় না। বরং মাত্রারিক্ত কর আরোপ ও অত্যাচারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় ঢাকা পৌরসভায় নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ও স্থানীয়দের দ্বারা পৌরসভা পরিচালিত করার দাবি প্রচণ্ডভাবে উত্থাপিত হয়। তাই লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ১৮ মে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন। বাংলার ছোটলাট স্যার রিভার্স টমসন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রস্তাবের স্বপক্ষে ২৪ জুলাই ঢাকায় একটি বিশাল জনসমাবেশ হয়। ১০-২০ হাজার লোকের অংশ গ্রহণে ঐতিহাসিক বিরাট জনসমাবেশটি জগন্নাথ স্কুলের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভার সভাপতিত্ব করেন 'ঢাকা জনসাধারণ সভা'র প্রেসিডেন্ট ব্রজেন্দ্রকুমার রায়।[৫] সমাবেশটিতে ঢাকা পৌরসভার সকল সম্প্রদায়, পেশা ও শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করে। তারা সকলে একযোগে ও এক হৃদয়ে লর্ড রিপনকে ধন্যবাদ প্রদান করে। ১৮৮৪ সালের ৬ এপ্রিল 'ঢাকা প্রকাশ' জানায় যে, ১৮৮৪ সালে ৩ আইনের পাশের পর জনসাধারণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন সম্বন্ধে কলকাতা গেজেটে যে নিয়মাবলী প্রকাশ করে তা ১৮৮৪ সালের ২৬ অক্টোবর 'ঢাকা প্রকাশ' সংক্ষেপে তুলে ধরে। পত্রিকাটির বর্ণনায় বলা হয়, '. . . . . সকল পূর্ণবয়স্ক পুরুষ নির্বাচনের পূর্বে অন্তত এক বছরকাল কোন মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে বাস করেছেন এবং যাঁরা নির্বাচনের পূর্ববছর মোটের উপর অন্যূন ২.৫০ টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রদান করেছেন, তাঁরা কমিশনার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে যদি কেউ উক্ত ট্যাক্স প্রদান করেন, সেই পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা লাইসেন্স প্রাপ্ত, কিংবা ওকলাতী কি মোক্তারী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত অথবা অন্যূন ৫০ টাকা বেতনভুক্ত ব্যক্তি উক্ত ২.৫০ ট্যাক্স না দিলেও ভোট দিতে অধিকারী হবেন।'[৬] অথার্ৎ কোনো ধরণের ট্যাক্স প্রদানে অক্ষম ব্যক্তি এবং রেজিস্টার্ড বহির্ভূত ব্যক্তিরা ভোট প্রদান করতে এবং প্রার্থী হতে পারত না। নারীদের ভোটাধিকার সম্পর্কে কোন কথা বলা হয় নি। অথচ এরা সকলেই নিম্নবর্গের আওতাধীন। এই আইনে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের অনুমোদন দেয়া হয়। অথার্ৎ ঢাকা

---

৪. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৭৮

৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০ জুলাই ১৮৮২; উদ্ধিত, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮১-৪; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮০-১

৬. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮৭; মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র ১৮৪৭-১৯০৫*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

মিউনিসিপ্যালিটির ২১ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জনকে নির্বাচিত হতে হবে ৭ টি ওয়ার্ড থেকে। বাকি ৭ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।[৭] সুতরাং জনসাধারণের ভোটাধিকার ছিল সীমিত।[৮] ১৮৮৪ সালের ২৪ নভেম্বর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত নির্বাচনে স্থানীয় উচ্চবর্গ যারা রেট-পেয়ার এবং রেজিস্টার্ডভুক্ত নয় তাদের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ নিয়ে অনেক বিতর্কও হয়। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার একটি চিঠিতে বলেন, "The same remark applies to the election in Ward No. III; the elected candidate has never paid rates in his own name, though he claims to hold property for which tax has been paid by some one else; in consequence of this, his name was not registered as a voter, and why he was included in the list of candidates is not apparent।"[৯] তিনি আরও বলেন, "In Ward No. I, the objection is that two of the three elected candidates are not rate-payers, and one of them is not even registered as such।"[১০] ১৪ জন কমিশনার পদের বিপরীতে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১১৩ জন এবং তালিকাভুক্ত ভোটার সংখ্যা ছিল ৭২০২ জন। ১, ২, ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডে মোট ভোটদাতা (যথাক্রমে ৮৯৪, ৫৯৫, ৮৫৭ ও ২৪০ জন) ছিল ২৫৮৬ জন। ৪, ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ভোট গ্রহণ না করে পক্ষে-বিপক্ষে হাত উঁচিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষকে কমিশনার নির্বাচিত করা হয়। নিম্নের পরিসংখ্যানটি দেখলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে:[১১]

**সারণি ২৬**

| Ward | No. of vacancies | No. of candidates | No. of voters on list | No. of costing votes | List of successful candidates |
|---|---|---|---|---|---|
| i | 3 | 19 | 1470 | 894 | Baboo Rup Lal Das, Baboo Purna Chundra Banerjee and Khajeh Amirullah |
| ii | 2 | 21 | 687 | 595 | Baboo Radhika Mohan Bysack and Baboo Rama Kanta Nundi |
| iii | 2 | 15 | 1280 | 857 | Baboo Chundra Mohan |

৭. Letter, *From the Officiating Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, Dated on 15th December, 1884, p. 1; Proceeding B, wooden Bundle No. 14

৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ অক্টোবর ১৮৮৪; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮৫-৭; কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮৫

৯. Letter, *From the Officiating Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, Dated on 15th December, 1884, p. 1; Proceeding B, wooden Bundle No. 14

১০. Letter, *From the Officiating Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, Dated on 15th December, 1884, p. 2; Proceedings B, wooden Bundle No. 14

১১. Letter, *From the Officiating Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, Dated on 15th December, 1884, p. 4; Proceedings B, wooden Bundle No. 14

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bysack and Moulvie Reza Karim |
| iv | 2 | 15 | 1281 | Declared by the majority by show of hands | Khajeh Mahomed Eusof and Haji Abdul Rasid |
| v | 2 | 17 | 492 | 240 | Syed Golam Mastafa and Baboo Anund Chundra Rai |
| vi | 1 | 12 | 511 | 195 by show of hands | Sheik Hyder Bux |
| vii | 2 | 14 | 1481 | 354 by show of hands | Baboo Brojendra Kumar Rai and Baboo Koilash Chundra Das |

উক্ত কমিশনারগণ ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত হয়েছেন। ১৮৮৫ সালের ১৭ মার্চ সরকারি একটি প্রজ্ঞাপনে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়।[১২] ১৮৮৫ সালের ২০ এপ্রিল নবনির্বাচিত কমিশনারদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] এরা দেশিয় ও স্থানীয় উচ্চবর্গ এবং তারা আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নিম্নবর্গকে প্রতিনিধিত্ব করেন না। কেননা রেজিস্টার্ডকৃত ৭২০২ জন নাগরিক ভোটাধিকার অর্জন করেছে যেখানে ১৮৮১ সালে ঢাকা পৌরসভার মোট জনসংখ্যা ছিল ৭৯০৭৬ জন। অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শহরের প্রায় ৯.১১% লোকের প্রতিনিধিত্ব করে বাকি প্রায় ৯০.৮৯% লোক নির্বাচনের বাইরে ছিল। আবার ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আইনের ১৪ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে ৭ জন কমিশনার মনোনয়ন করেন যাদের পেশার প্রতি লক্ষ্য করলেও পরিসংখ্যানটি যথার্থ প্রমাণিত হবে।[১৪]

**সারণি ২৭**

| **Name** | **Profession** |
|---|---|
| Dr. A. Crombie | Civil Surgeon |
| Mr. H. Dawson | District Superintendent of Police |
| Dr. P. K. Roy | Professor, Dacca College |
| Baboo Akhoy Kumar Sen | Personal Assistant to Commissioner |

[১২]. *Government of Bengal, Municipal Department, File No. 13*, Proceedings A, wooden bundle No. 14, Dated on 17th March 1885

[১৩]. Azimusshan Haider (ed), *A City and its Civic Body*, p. 132

[১৪]. Letter, *From the Officiating Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, Dated on 15th December, 1884, p. 1; Proceedings B, wooden Bundle No. 14

*Dhaka University Institutional Repository*

| | |
|---|---|
| Baboo Sreenath Roy | Zemindar |
| Baboo Mohini Mohan Das | Zemindar |
| Mr. W. Connan | Executive Engineer |

১৮৯১ ও ১৮৯৪ সালের নির্বাচনের পর সরকার যেসকল ব্যক্তিকে কমিশনার হিসাবে মনোনীত করেন তাদেরও পেশা নিম্নে উল্লেখ করা হল:[১৫]

সারণি ২৮

| Year | Name | Profession |
|---|---|---|
| 1891 | Dr. Nicholson | Civil Surgeon |
| Do | Baboo Prosunno Kumar | Executive Engineer |
| Do | Mr. H. L. Wetherall | Zemindary Manager of the Nawabs |
| Do | Khaja Mahomed Azghur | Vice-Chairman of the District Board |
| Do | Rai Obhoy Churn Das Bahadur | Ret. Deputy Collector |
| Do | Baboo Iswar Chunder Sil | Ret. Deputy Collector |
| Do | Baboo Chandra Mohun | Buisness man and influential person |

| Year | Name | Profession |
|---|---|---|
| 1894 | Dr. E. G. Russell | Civil Surgeon |
| Do | W.B. Christie | Inspector of Works |
| Do | H. L. Wetherall | Nawab's Local Agent |
| Do | Khajeh Mohamad Azgar | The then Chairman of the Municipality, Dacca |
| Do | Rai Iswar Chandra Sil Bahadur | The then Vice-Chairman of the Municipality, Dacca |
| Do | Baboo Purna Chandra Banerjee | Zemindar and an Honorary Magistrate |
| Do | Khajeh Abdul Alim | Member of Nawab's family and an Honorary |

[১৫]. *Government of Bengal, Municipal Department, File No. M 5-A/3*, Proceedings A, April 1891, Wooden Bundle No. 22; *Government of Bengal, Municipal Department, File No. M 5-A/3*, Proceedings A, March 1894, Wooden Bundle No. 25

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Basak | | | | Magistrate |

নির্বাচিত ও মনোনীত কমিশনারদের তালিকা দেখে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ঢাকা পৌরসভা পরিচালনা পর্ষদে নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব ছিল না।

## সভা-সমিতি

মুগল আমলে পেশাগত বিভিন্ন শ্রেণির লোকরা কোনো সঙ্ঘ বা সমিতিতে সংগঠিত ছিল কি-না, তা বলা দুষ্কর। তবে বিভিন্ন এলাকার নাম, যেমন- শাঁখারি বাজার, তাঁতি বাজার, সূত্রাপুর ইত্যাদি থেকে বোঝা যায় যে, একই পেশার অনুসারীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করত। কিন্তু অন্য কারিগর এবং কারখানার মালিকরা সংগঠিত ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজের বর্ণ বৈষম্যের কারণেও কারিগররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই এলাকায় বসবাস করত। তবে একে অর্থনীতির দৃষ্টিকোন থেকে তাদের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রমাণ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না।[১৬] ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে ধাঙড়রা শত শত বছর ধরে নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। তারা নিজেরাও শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতি ও কল্যাণের ব্যাপারে ততটা সচেতন নয়। তবু কিছু দরদী ও সচেতন ব্যক্তির প্রয়াসে এদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫১ সালে ও ১৮৫২ সালে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় স্থাপিত হয় 'ঢাকা ক্লাব' এবং 'বেথুন সোসাইটির শাখা'। বাংলার দুরবস্থা সংশোধন, অভাব মোচন এবং সর্ব্বপ্রকার হিত সাধনের উদ্দেশ্যে ১৮৭১ সালে গঠিত হয় 'ঢাকা জনসাধারণ সভা'। এর উদ্যোক্তরা ছিলেন উকিল। জনসাধারণ সভা কালক্রমে রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে দৃষ্টি বেশি দিয়েছিল। পৌর নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জনসাধারণ সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৭] ১৮৯২ সালে স্থাপিত হয় মাদ্রাজ আদি দ্রাবিড় জনসভা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় তুলা ও পাট নির্ভর মুষ্টিমেয় যে কয়টি শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল তাতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করত নারী-পুরুষ এবং অল্প বয়স্ক বালক-বালিকা। এসকল শ্রমিকরা প্রতিদিন অবিশ্রান্তভাবে ১৫/১৬ ঘণ্টা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করত। নিঃসহায় দুর্বল বালক বালিকারাও প্রতিদিন ১০/১২ ঘণ্টা কাজ করত। শ্রমজীবীদের সাপ্তাহিক কোন ছুটি ছিল না। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম অবলম্বনকারীদেরকে বছরে ১৩/১৪ দিন ছুটি ছিল। এই অমানুষিক শ্রমের বিরুদ্ধে কয়েক দফা আন্দোলন সংঘটিত হয় (এ আন্দোলন সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না)। অবশেষে শ্রমিকদের কষ্ট লাঘবের জন্য ১৮৭৫ সালে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি একটি সুপারিশ প্রদান করে। যা শ্রমিকদের কষ্ট লাঘবে আইন প্রণয়নে সহায়ক হয়। আইনটির প্রধান প্রধান বিধান হলো সপ্তাহে ৬ দিন কার্যদিবস

[১৬]. Abdul Karim, *Dacca The Mughal Capital*, p. 93
[১৭]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ২৬২, ২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ও ১ দিন ছুটি, প্রতিদিন সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারখানাগুলি খোলা থাকবে, নারীরা সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা ও অল্প বয়সী বালক-বালিকারা ৯ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবে না, দুপুরের খাবারের জন্য ১ ঘণ্টা বিরতি থাকবে, ৮ বছরের নিচে কোন বালক-বালিকা দ্বারা কাজ করানো যাবে না এবং শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে প্রভৃতি।[১৮]

## ব্রাহ্ম আন্দোলন ও নিম্নবর্গ

বাংলায় সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার শুরু করেছিল ব্রিটিশ শাসনকর্তারা বা হেইলিবেরি কলেজ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ভারতে আগত ব্রিটিশ আমলারা। কিন্তু সংস্কারগুলির উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সমসাময়িক ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডকে সামনে রেখে। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের উদারনৈতিক ও সংস্কারবাদী চিন্তাধারা ভারতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদেরও প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁরা সংস্কারের মাধ্যমে ইউরোপের আদলে ভারতকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। এরিক স্টোকস (Eric Stokes) তাঁর 'দি ইংলিশ ইউটিলিটিরিয়নস অ্যান্ড ইন্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সংস্কারের পিছনে সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন উপযোগবাদীরা। উপযোগবাদীদের গুরু ছিলেন বেন্থাম। জেমস মিল ও তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন এই উপযোগবাদের প্রধান সমর্থক। তাঁরা দু'জনেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় কর্মকর্তা ছিলেন, ফলে দীর্ঘদিন ধরে উপযোগবাদীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, ভারতের শাসননীতি প্রভাবান্বিত করা। বেন্টিঙ্ক, ডালহৌসী প্রমুখদের সঙ্গে উপযোগবাদীদের যোগাযোগ ছিল এবং ভারতে কর্মকাণ্ডে তাঁরা উপযোগবাদের নীতিই প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। উপযোগবাদ ছাড়াও, সমসাময়িক ইংল্যান্ডের ইভ্যানজেলিকালিজমও (evangelicalism) ইংরেজ কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করেছিল। দু'টির নীতি ছিল ভিন্ন কিন্তু সংস্কারের বিষয়ে দু'দলই ঐক্যমত্য ছিল। ইভ্যানজেলিকালিজম গুরুত্ব আরোপ করেছিল শিক্ষা ও নৈতিক উন্নয়নে। উপযোগবাদীরা জোর দিয়েছিলেন আইন ও সম্পত্তির উপর। অন্যদিকে, রামমোহন ছিলেন বেন্থামপন্থী। তাই রামমোহন সামাজিক ক্ষেত্রে উপযোগবাদী সংস্কারপন্থী ছিলেন।

উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রধান যা ঐতিহ্যগত হিন্দুধর্মের মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্যের খ্রিস্ট ধর্মের নীতিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। হিন্দু ধর্ম সংস্কারক রাজা রাম মোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) কর্তৃক আত্মীয়সভা (১৮১৫) ও ব্রাহ্মসভা (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রাথমিক দিক। তিনি সকল ধর্মের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বাদ দিয়ে সর্বজনীন একটি মতবাদ প্রচার শুরু করেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ব্যাপকতা ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার জেলাগুলিও বাদ যায়নি। যার মূল কথা ছিল

---

[১৮]. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ মে, ১৮৭৯; উদ্ধৃতি মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র ১৮৪৭-১৯০৫*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৬-৪৭

*Dhaka University Institutional Repository*

পৌত্তলিকতা বিরোধি ও একাশ্বরবাদ প্রচার। রাম মোহন রায়ের মৃত্যুর পর অনেকটা মৃতপ্রায় ব্রাহ্ম আন্দোলনকে দেবেন্দ্রনাথ নতুন জীবন প্রদান করেন। ১৮৪৬ সালে কলকাতার বাইরে ঢাকায় সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হয়। ঢাকার সমাজ স্থাপনের পর অবশ্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম বিস্তারে কলকাতার সমাজ নানাভাবে সহায়তা করে।[১৯] ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদেন। তাঁর প্রগতিশীল নেতৃত্বে আন্দোলনটি আরও ব্যাপকতা লাভ করে। তিনি ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মধর্মের আচার্যপদে অভিষিক্ত হলে বর্ণপ্রথা পালন ও সামাজিক সংস্কারসমূহকে কেন্দ্র করে তাঁদের দুজনের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়। যেখানে দেবেন্দ্রনাথের পদ্ধতি ছিল কিছুটা রক্ষণশীল, সেখানে কেশবচন্দ্র জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি বিলোপ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সমাজ সংস্কার সাধানের উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন। বিশেষত স্ত্রী শিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে। ফলে ব্রাহ্ম আন্দোলন দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৮৭০ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন বড় বড় শহরে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হয়। পৌত্তলিকতা দূরীকরণ বিষয়ে প্রচার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শিক্ষা, নারী জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্ম সমাজ ঢাকা শহরে গণিকাদের জন্য একটি পুর্নবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম নেতাদের আকর্ষণে তাদের পাশে সমবেত মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার আদি পুরুষ ছিল ব্রজসুন্দর মিত্র। ১৮৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শাঁখারি বাজারে ব্রজসুন্দরের বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, গোবিন্দ্রচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস এবং নরোত্তম মল্লিক। ১৮৪৭ সালের মার্চ থেকে প্রকাশ্যভাবে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের কাজ শুরু হয়।

১৮৬৩ সালে বরিশাল থেকে ব্রাহ্ম কর্মী দুর্গামোহন দাস ও কালীমোহন দাস ঢাকায় আসেন। তাঁদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভ্রাতৃসমাজ' যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ দূর করা। ঢাকার বেশ কিছু শিক্ষিত তরুণ (যেমন প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, শিবচন্দ্র নাগ) এ সভার সভ্য হয়ে জাতিভেদ ত্যাগ করেছিলেন ফলে তখন ঢাকায় তুমুল হৈচৈ শুরু হয়।[২০] জালাল উদ্দিন মিয়া ছিলেন এক দরিদ্র মুসলমান ছাত্র, ব্রাহ্ম ছাত্রদের সঙ্গে মেসে থেকে ব্রাহ্ম স্কুলে পড়তেন। বোধহয় এ কারণেই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। একবার, সঙ্গত সভার সদস্য প্রসন্নকুমার সেন বিয়ে করে ফিরে এসে মেসের বন্ধুদের জন্যে একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বঙ্গচন্দ্র রায়, ভুবন মোহন সেন, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত প্রমুখ জালালের বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে একত্রে আহার

---

[১৯]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১৬২-৩

[২০]. আদিনাথ সেন, ১৯৪৮, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১৩৮; উদ্ধৃতি মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষণশীল 'হিন্দু সমাজের আন্দোলন বহ্নি চতুর্দিকে প্রবলভাবে ব্যাপ্ত' হয়েছিল।[২১]

কলকাতা থেকে আগত বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা শুনে ঢাকায় প্রকাশ্যে অনেকে হিন্দুধর্মের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন এবং তা নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে সূত্রপাত হয়েছিল বিরোধের। কারণ, তখনও অনেকে চান নি আনুষ্ঠানিক দীক্ষার দ্বারা ব্রাহ্মরা হিন্দু সমাজ থেকে একেবারে পৃথক হয়ে যাক। ফলে ব্রাহ্ম সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল দ্বন্দ্বের। ১৮৬৫ ও ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ সফর তা আরো তীব্র করে তুলে। এরই মধ্যে প্রায় পনের হাজার টাকা ব্যয়ে ব্রাহ্মরা জগন্নাথ কলেজের পাশে তৎকালীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ব্রাহ্ম মন্দির নির্মাণ করে। ১৮৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর মন্দিরটির উদ্বোধন করা হয়। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম ভাঙ্গনের পূর্ব পর্যন্ত 'ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ' বা 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজ' ব্যাপক আকারে তার কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। বিভিন্ন সংস্কার সাধনে তাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে সিভিল বিবাহ আইন পাস হয়। আইনটি এক বিবাহকে বাধ্যতামূলক করে। কনে ও বরের বয়সের নিম্নসীমা যথাক্রমে ১২ ও ১৮ বছরে নির্ধারিত করে দেয়। ১৮৭৮ সালে কুচবিহারে অল্প বয়স্কা বালিকার বিয়ে নিয়ে কলকাতায় বিরোধ শুরু হলে তার রেশ ঢাকাতেও এসেছিল। ফলে ঢাকার সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[২২] ১৮৭৮ সালে ১৫ মে কলকাতা টাউন হলে এক সভা করে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অবদান গণতন্ত্রায়ণ। যা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করে এবং একটি সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিতে এর আকাঙ্ক্ষা জনসমক্ষে ঘোষণা করে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তার কর্মকাণ্ড নিছক ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে রাখেনি। তাই ১৮৭৮ সালের ২১ মার্চ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে' বলা হয়, 'আমরা দেখাতে চেষ্ট করব যে, ব্রাহ্ম ধর্ম শুধু অধ্যাত্মিকভাবেই মানুষকে উন্নত করবে না বরং সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক এবং রাজনৈতিকভাবেও উন্নত করবে। . . . ফলাফলের পরোয়া না করে আমরা নির্ভয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনে ব্রতী হব'।[২৩] তাঁত শিল্পের ধ্বংসের পর ব্রাহ্ম আন্দোলনের এক নেতা ঢাকার বেকার তাঁত শ্রমিকদের জন্য একটি জয়েন্ট কোম্পানি গঠনের কথা জানা যায়। মসলিনের রপ্তানি হ্রাস ও ব্রিটিশ বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে ১৮১৭ সালে কোম্পানি সরকার ঢাকার বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর বিলুপ্ত করে। দেশিয় বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসাকে বিনষ্ট করে, বিলেতি বস্ত্র আমদানির বৃদ্ধিতে ঢাকার নাগরিকদের মনে ক্ষোভ ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। ১৮৭৬ সালের মার্চে 'ঢাকা প্রকাশ' এ বলা হয়

---

[২১]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১৬৭; বঙ্গবিহারী কর, *পূর্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, (প্রকাশ কাল নেই) পৃ. ৫৩-৪; উদ্ধৃতি মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১১

[২২]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১৬৬, ১৬৭ ও ১৬৮

[২৩]. Jogananda Das, 'The Brahmo Samaj', A.C. Gupta (ed), *Studies in the Bengal Renaissance*, Calcutta, p. 487; উদ্ধৃতি মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬

*Dhaka University Institutional Repository*

ঢাকার নাগরিকদের আহ্বান করে ব্রাহ্ম নেতা দীননাথ সেন পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নেয়।[২৪]

১৮৯০ সালের দিকে ভারত জুড়ে দু'টি বিতর্ক রক্ষণশীলরা যে যথেষ্ট শক্তিশালী তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিতর্ক দু'টির একটি ছিল সহবাস সম্মতি আইন। এ আইনের মূলকথা ছিল, বারো বছরের নীচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত কোন বালিকার সঙ্গে তার অনুমতি অথবা বিনা অনুমতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ১৮৬০ সালে সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ধার্য করা হয়েছিলো দশ বছর। এখন দু'বছর বৃদ্ধি করে তা উন্নীত করা হলো বারোতে। এক অর্থে এ বিলটি ছিল ১৮৭২ সালের 'ব্রাহ্ম নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট' এর বর্ধিত রূপ। কারণ, এই আইন হিন্দু সমাজে বিয়ের বর-কনের বয়স বৃদ্ধি করেছিল। ১৮৭২ সালের আইনটি ছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মদের জন্যে। এ বিল পাশের এক সপ্তাহের মধ্যে সারা বাংলা জুড়ে ক্ষোভ, অসন্তোষ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। তবে এবিলটির পক্ষেও একটি জনমত গড়ে উঠেছিল। ১৮৯১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিলের বিরোধীরা আটটি সভা করেছিল। এমনি এক সভায় জমিদার মৌলবী মকবুল আলী বলেছিলেন, এই বিল শুধু হিন্দুরাই নয়, মুসলমানদের ধর্ম মতেও আঘাত হানে। এতোসব প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ বিলটি বিধিবদ্ধ হয়।[২৫]

ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল। বিনয় ঘোষ লিখেন, ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল- 'প্রচার কার্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সোৎসাহ অংশগ্রহণ।'[২৬] ব্রাহ্ম সমাজের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা এসেছিলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথম তিনটি বর্ণ থেকে। এসব কারণে অনেকে আবার এ আন্দোলনকে 'এলিটিস্টি মুভমেন্ট' হিসাবে উল্লেখ করেন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেন, প্রথমদিকের ব্রাহ্মরা সবাই ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং এ আন্দোলনটি ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের আন্দোলন। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, ১৮৬০ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে যাঁরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সরকারি কর্মচারী যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছিলেন নিম্নস্তরের সরকারি কর্মচারী। এই নিম্নস্তরের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক এবং ছাত্ররাই ছিলেন পূর্ববঙ্গে ১৮৬০ অব্দি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। কিন্তু পরবর্তীতে এদের মধ্যে অনেকের পদোন্নতি ঘটে। ১৮৮২-৮৩ সালের পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মদের এক তালিকায় দেখা যায়, পূর্ববঙ্গে মোট ব্রাহ্ম সংখ্যা ছিল ৮১ জন, বহিরাগত ১১ জন, মোট ৯৩ জন। এর মধ্যে প্রধান রাজকর্মচারী, উকিল ও জমিদার ছিলেন যথাক্রমে,

---

[২৪]. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকায় বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৩৬-৭, ৭৯৯-৮০১, ৮০৮

[২৫]. সহবাস সম্মতি আইন সম্পর্কিত বির্তকটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১৯০-২০১

[২৬]. বিনয় ঘোষ, (সম্পাদিত ও সংকলিত), ১৯৬৩, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ৩১

*Dhaka University Institutional Repository*

১০, ১৬ ও ১৬ জন। শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানী ও অন্যান্যদের সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ১৬, ৩, ১২ এবং ২০ জন।[২৭] তবে তাঁদের এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য পূর্ববঙ্গে অনেক সভা সমিতি গড়ে তোলা হয় যা নিম্নবর্গের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সামাজিক সংস্কার ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে মাইল ফলক হিসাবে কাজ করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও ঢাকার অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষি এবং স্বল্প পরিসরে শিল্প নির্ভর। সুতরাং এখানে ব্রাহ্ম আন্দোলন যে সমাজের একটি অংশে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা স্বাভাবিক। পুরো ব্রাহ্ম আন্দোলনের সময়টায় এখানকার ব্রাহ্মরাই নির্যাতিত হয়েছিল বেশি।[২৮] অনেক সময় গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মদের খৃষ্টান বলতেন। উদাহরণস্বরূপ ১৮৬৯ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের নব নির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন কালে এক কাঙ্গালীভোজের আয়োজন করে। দানে উপকৃত হয়ে দরিদ্রগণ অজ্ঞতাবশতঃ চীৎকার করে বলে ওঠে খৃষ্টানদের জয় হউক। ব্রাহ্ম আন্দোলন ছিল বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথচ এ প্রথা ছিল বর্ণ হিন্দুদের সামাজিক শোষণ ও অধিকারের হাতিয়ার। সম্ভবত এ কারণেই ব্রাহ্ম আন্দোলনকে রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেখেছিলেন তাদের সামাজিক অধিকার, প্রতিপত্তি খর্ব করার আন্দোলন হিসাবে। নীচুবর্ণের হিন্দুদের সাথে ব্রাহ্মদের তিক্ত সম্পর্কের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বরং তার উল্টোটা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ রামপ্রসাদ সেনকে গ্রামের ব্রাহ্মণরা একঘরে করেছিল। কিন্তু গ্রামের মুসলমান ও নীচু বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল 'মধুর'। আবার ব্রাহ্মদের সমাজ সংস্কারমূলক বা সেবামূলক কাজের ফলাফল ভোগ করেছিল উভয় সম্প্রদায়। ব্রাহ্ম আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের তেমন কোন উৎসাহ ছিল না, কৌতূহল হয়ত খানিকটা ছিল। আন্দোলনের মূলকথা কখনও তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। ব্রাহ্ম আন্দোলনের আদর্শ তাদের কাছে নির্বস্তুক ঠেকেছে। তাই সাধারণ মানুষ এতে আকৃষ্ট হননি। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মদের জেনেছিলেন খানিকটা অদ্ভূত মানুষ হিসাবে, যে না হিন্দু না খৃষ্টান। তারা দেখেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মরা তাদের মতই দরিদ্র, নিজেদের নিয়ে মেতে থাকেন। কোন গ্রামে হিন্দু পরিবারে কেউ ব্রাহ্ম হলে মনে করা হত ধর্মনাশ হল। অন্যদিকে উচ্চবর্গের হিন্দুরা যারা ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল কথা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা চেয়েছিলেন ব্রাহ্মদের প্রতিরাধ করতে। ধর্মনাশের কথা তাঁরাই তুলেছিলেন নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে।[২৯]

---

[২৭]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১৭৪ ও ১৭৫

[২৮]. পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মরা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন তাঁর *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)* গ্রন্থের পৃ. ১৭৫-৭৯

[২৯]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, পৃ. ১৭৬ ও ১৮১-২

Dhaka University Institutional Repository

## কর বৃদ্ধি ও অসন্তোষ

কোম্পানি শাসনক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮১০ সাল পর্যন্ত কোন গণ-অসন্তোষ ঘটেনি। তবে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ (কৃষক বিদ্রোহসমূহ) সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮১০ সালে সরকারের বিরুদ্ধে একটি গণ-অসন্তোষ প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়। এ সময় সরকার কর্তৃক গৃহ-কর আরোপের বিরোধিতা করে স্থানীয় প্রায় ৯০০০ জন নাগরিক বা গৃহকর্তার স্বাক্ষর একত্রিত করে কালেক্টরের নিকট তাদের অভিযোগ সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এরা কেবলমাত্র এই নিন্দনীয় কর রহিত করার জন্যই দরখাস্ত করেননি, বরং দলিলপত্রাদি লেখার কাজের উপর আরোপিত কর বাতিল এবং নিম্নপদস্থ পদসমূহে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্যও আবেদন জানান। কাচারি অবরোধকারী সঙ্ঘবদ্ধ জনতার হাত থেকে কালেক্টর উক্ত আবেদনপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে, সমাবেত জনতার মধ্যে বিক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এসময় রাস্তায় একদল সিপাহীর উপস্থিতি ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে।[৩০] ১৮১৩ সালেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৮১৩ সালে চৌকিদারি ট্যাক্স প্রবর্তনের ফলে ভার প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট জন বার্ডো ইলিয়ট (John Bardoe Elliot)- এর কাচারির সামনে যখন একদল জনতা নতুন আইনের বিরুদ্ধে উগ্রভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে তখন তাদেরকে শান্ত করতে তিনি সেনাবাহিনী তলব করেন।[৩১] মুগল আমলে ঢাকা শহরের অধিকাংশ জমি ছিল লাখেরাজ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ঢাকা শহরের উক্ত জমির উপর নির্মিত গৃহের জন্য ট্যাক্স ধার্য করার বিষয়ে বিতর্ক হয়। ১৮৩৭ সালে ঢাকা শহরের বাসিন্দারা গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ডকে একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। পত্রটিতে বলা হয়, এ শহরের বাসিন্দারা অত্যন্ত গরিব। শহরের এক ষষ্ঠাংশ জঙ্গল, এক চতুর্থাংশ সরকারি রেজিস্ট্রার্ডকৃত (যা থেকে সরকার রাজস্ব পায়), বাকি এক ষষ্ঠাংশে বাস করছে লোকজন। বহুবছর পূর্ব তারা যখন জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন তখন তারা বসবাসের অধিকার (জমির) পেয়েছেন। বাড়ি বানিয়েছেন। এখন যদি এসবের ওপর কর ধার্য করা হয় তাহলে জীবনের জন্যে তারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। ফলে সরকারের লাভ হবে না কিছুই। তাছাড়া, বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই (অর্থাৎ বাণিজ্যে লাভ হয় না) এবং এই কর ধার্য করলে তারা প্রায় ভিক্ষুক হয়ে যাবেন। তারা আরো জানিয়েছেন, এ অঞ্চলে দু'বিঘা থেকে বেশি জমি কারো নেই।[৩২] উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকেও ঢাকাবাসী করদাতাদের মধ্যে আরেকটি অসন্তোষ দেখা যায়। এ সম্পর্কে ১৮৫৪ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিটির সেক্রেটারি আলেকজান্ডার ফোর্বাস (Alexander Forbes) মন্তব্য করেন-'পঞ্চায়েতগুলির অপকর্মাদি, দফাদারদের নীতি বিসর্জন, শোষণ ও উদাসীনতার জন্য অনেক কর বকেয়া পড়ে থাকা এবং পরবর্তীতে অমানবিক কঠোরতা প্রদর্শন করে সে বকেয়া

---

৩০. James Tylor, *Topography of Dacca*, p. 256
৩১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৯
৩২. Secretary Government to Commissioner, No. 1389, 5 December, 1837; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ১৪

*Dhaka University Institutional Repository*

আদায় করা, যখন করদাতাদের অনেকেই এটি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন, এগুলিই হচ্ছে অসন্তোষের প্রধান কারণ. . . . .'।[৩৩]

১৮৫০ সালের ২৬ নং আইন প্রবর্তনের জন্য শহরের বৃহত্তর জনসাধারণের সম্মতি জানার লক্ষ্যে ১৮৫২ সালের ২১ মে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে এক সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়। সম্ভবত ঢাকার ইতিহাসে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত এ জনসভাটিতে যোগদানের জন্য নির্ধারিত দিনে বিপুল সংখ্যক লোকের আগমন ঘটে। সভার আহ্বায়ক ফোর্বস এবং ডা: গ্রীন জনতাকে লক্ষ্য করে প্রদত্ত বক্তৃতায় জোর দিয়ে এ আইন প্রবর্তনে তাদের মূল উদ্দেশ্য দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন। অতঃপর ডা: গ্রীন এক কেরানিকে বক্তৃতা দেয়ার জন্য মঞ্চে আহ্বান করেন। তার বক্তৃতায় সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি ১৮৫৭ সালে ডা: গ্রীন তাঁর পাণ্ডুলিপি আকারে লেখা সর্বপ্রথম '*ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির ইতিহাস*' এ উল্লেখ করেন। এতে তিনি লিখেন যে ফোর্বস ও তার বক্তৃতার পর সভাপতি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট শহরের কোন এক অফিসের এক কেরানিকে সভায় ভাষণ দেয়ার অনুমতি দেন। এই লোকটি খুব আবেগ প্রবণ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন বলে ডা: গ্রীন মন্তব্য করেন। লোকটি মিউনিসিপ্যাল কমিটির এই নতুন আইন প্রয়োগের উদ্যোগের প্রচণ্ড নিন্দা করেন এবং ঢাকায় এর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য পেশ করেন। বক্তৃতায় পরপরই সভায় ভীষণ হট্টগোল শুরু হয় এবং চারদিকে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তিই ঢাকায় এ আইন প্রবর্তনের বিরোধিতা করে হঠাৎ করেই সভাস্থল পরিত্যাগ করে। পরে আইন প্রবর্তনের সমর্থনকারীরা অত্যন্ত ক্রোধের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের এ অবিবেচক হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁর এ অনুমতি দান শুধু অসময়োপযোগীই ছিল না বরং বিচক্ষণতার অভাবও প্রমাণ করে। ডা: গ্রীন স্বীকার করেন যে সার্বিকভাবে মিটিং-এ উপস্থিত স্থানীয় লোকের প্রায় সবারই এ আইন প্রয়োগের প্রতি চরম আপত্তি ছিল। জুলাই মাসে ঢাকার অধিবাসীদেরকে এ আইনের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করার জন্য কাচারিতে গিয়ে তাদের নামসই করতে বলা হলে দেখা গেল যে সবাই বিপক্ষেই স্বাক্ষর করেছে।[৩৪]

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকারের ইংল্যান্ড ও ভারত উভয় দেশে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই সরকার এ ঋণ লাঘবের জন্য নতুন কর আরোপ করে। আবার স্থানীয় সরকার গঠন করে তা পরিচালনার জন্য স্থানীয়ভাবে কর আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই উমা দাশগুপ্ত বলেন, ১৮৫৭ ও ১৮৬০ সালের মধ্যে ভারত ও ইংল্যান্ডে ৩৮,৪১০,৭৫৫ পাউন্ড ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাউন্সিলের প্রথম অর্থ সদস্য উইলসন

---

৩৩. *Bengal Criminal Judicial consultations*, CXLIV, 60, 16, Nov. 1854, p. 209; উদ্ধৃতি, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮১

৩৪. Dr. Green, '*History of the Municipal Committee*', BJC, CXLV, 74, 24 September 1857, p. 164; উদ্ধৃতি শরীফ উদ্দিন, *ঢাকা*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮৩-৪

*Dhaka University Institutional Repository*

১৮৬০ সালের ২৪ মার্চ ইনকামট্যাক্স বিল পাস করেন। কর আরোপের হার ছিল ৫০০ রূপি বা তার উর্ধ্বে ৪% এবং ২০০ থেকে ৫০০ রূপি আয়ের ওপর ২%। ১৮৬৫ সালে উক্ত কর সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হয়।[৩৫] ১৮৬৫-১৮৮৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন কর আরোপ এবং বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৬৮ সালে স্যার উইলিয়াম গ্রে 'শিক্ষাকর' নামে একটি নতুন করের প্রস্তাব করেন যার আলোচনা শুরু হয়েছিল ১৮৫৯ সালের পর থেকে। এ কর আরোপ করার প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় শিক্ষা বিস্তার করা। কিন্তু এ কর-এর অর্থ ব্যয় নিয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, নতুন শিক্ষা কর ব্যয় সম্বন্ধে একটি সংশয় রয়েছে। রাস্তাঘাট প্রস্তুত করা এবং সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়াই এই করের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা কতদূর হবে জানি না।[৩৬] সরকারি করের মধ্যে 'আয়কর' বা 'ইনকামট্যাক্স'ই সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। ১৮৬৯ সালে পুনরায় বসানো হয় আয়কর। ১৮৬৯ সালের ৯ আইনে ৫০০ ও তার উর্ধ্বে আয়ের ওপর ১% কর ধার্য করা হয়। এ আইন জারি হওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যে এ হার ৫০% বৃদ্ধি করা হয়। অথার্ৎ ধার্যকৃত মোট করের পরিমাণ দাড়াঁয় ১.৫০%।[৩৭] ইউরোপেও তখন এ কর সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিলনা। সে পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের কথা সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় জমিদার, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং গণমাধ্যম সবাই ছিল এর বিরুদ্ধে। ১৮৭০ সালে সরকার বাড়ির ট্যাক্স শতকরা ৭.৫০ টাকার স্থলে ১০ টাকা বর্ধিত করে। ১৮৭৮ সালে শ্রৌচাগার কর চালু হয়। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দ্বারা অফিস সংক্রান্ত কর্মচারীদের নিয়মত বেতন ও কয়েকজন ইউরোপীয়দের সুবিধার নিমিত্তে ব্যয় হত। ইউরোপীয়রাই এ কমিটির (মিউনিসিপ্যাল কমিটি) সর্বেসর্বা, তারা যখন যা করেন, মিউনিসিপ্যাল ফান্ড হতে তখন তাই-ই করে থাকেন। ইউরোপীয়দের মতপোষণ করে এরূপ অকর্মণ্য লোকদেরকে মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পথে নিযুক্ত করা হত।[৩৮] আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি বারংবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য ফসলের ক্ষতি, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু উপর্যপুরি নানা প্রকারের কর বৃদ্ধি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে। ১৮৭৯ সালে আরোপ করা হয় 'লাইসেন্স কর'। যে সকল ব্যবসায়ীদের ওপর উক্ত কর আরোপ করা হয় তারা আবার সেই কর'এর তিন চার গুণ অর্থ পণ্যদ্রব্যাদির মূল্যের ওপর নির্ধারণ করত। এতে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয় তার সম্মুখীন হত সাধারণ মানুষ। এ যেন মরার ওপর খরার ঘা। আবার কর পরিশোধে বিলম্ব হলে ট্যাক্সের ত্রিগুণ জরিমানা করা হত। কোন ব্যক্তি সহজে পরিশোধ না করিলে তার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা নিলাম করে আদায় করা হত। আবার অনেক সময় সম্পত্তির হিসাবে না করে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হত। ১৮৭৯ সালের ২০ মার্চ সরকারি একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগামী ১ এপ্রিল থেকে পৌরসভার সীমানার ভিতর অবস্থিত বেসরকারি প্রিভি ও পাবলিক ল্যাট্রিনসগুলি পরিষ্কার করার জন্য

---

৩৫. Uma Dasgupta, 1977, *Rise of an Indian Public (Impact of Official Policy 1870-1880)*, RDDHI, Calcutta, p. 63

৩৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ জুলাই, ১৮৭০; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৩ ও ২৭৫

৩৭. Uma Dasgupta, *Rise of an Indian Public (Impact of Official Policy 1870-1880)*, p. 64; ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের কর আরোপ ও ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৩-৯৩

৩৮. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পা), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৭৬

*Dhaka University Institutional Repository*

বিদ্যমান গৃহকর-এর এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি হবে। অথার্ৎ শতকরা ২ টাকা বর্ধিত গৃহকর কার্যকর হবে।[৩৯] ১৮৮৬ সালে মিউনিসিপ্যালিটি বাড়ি ও আয়ের ওপর পুনঃ ট্যাক্স নিরূপণ করলে ঢাকার অধিবাসীরা অত্যন্ত ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে প্রতিবাদ জানানোর জন্য স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হয়। আর এ সম্বন্ধে ঢাকা নিবাসী মুসলমানদের তৎপরতা ছিল অবাক করার মত। এ সময় তাদের ক্ষোভ প্রশমন ও এর প্রতিকার এবং গোলযোগ এড়ানোর জন্য নবাব বাহাদুর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানানোর পরামর্শ প্রদান করেন।[৪০] সরকার কর্তৃক আরোপিত 'লবণ কর' এর বিরুদ্ধে ১৮৮৮ সালে 'ঢাকা প্রকাশ' সকলকে তীব্র আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ জানায়। এভাবে সরকার আয়কর, পথকর, লাইসেন্স ট্যাক্স, লবণ কর প্রভৃতি আরোপ বা বৃদ্ধি করত। নানা কৌশলে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে এসব কর আদায় করা হত। যা মানুষজন ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। এক পর্যায়ে সাধারণ মানুষজন সরকারি লোক দেখলেই মনে করত 'নূতন প্রকারের কোন কর বসাইতে আসিয়াছে'।

## বঙ্গভঙ্গ ও নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের কারণ, ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুতরাং আমার আলোচনায় বঙ্গভঙ্গের ঐসব দিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং বঙ্গভঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত নিম্নবর্গের কর্মকাণ্ড ও তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। ১৯০৩ সালের ১৮ মার্চের একটি নোটে এ্যান্ড্রু ফ্রেজার বাংলা থেকে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আলাদা করার প্রস্তাব করেন। কার্জন উক্ত প্রস্তাবকে অনুমোদন করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলের সেই বিখ্যাত চিঠিটি যেখানে আসামের সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহকে নিয়ে আলাদা একটি প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১২ ডিসেম্বর সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিলো রিজলের খসড়া প্রস্তাব এবং ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় কাউন্সিল তা অনুমোদন করে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের অক্টোবরে তা কার্যকর কার হয়। তিন কোটি দশলক্ষ জনসংখ্যা এবং ১,৮৬,৫৪০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ।[৪১] ঢাকাকে নব গঠিত প্রদেশের রাজধানী করা হয়।

১৯০৩ সালে রিজলের চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়া পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে বাংলায় জোরালো আন্দোলন হয়েছিল। প্রথম দিকে, আন্দোলনের ধারা ছিল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে

---

[39]. *Government of Bengal, Financial Department, Municipal*, Dated on 20th March, 1879, File No. 2, wooden Bundle No. 4; Letter, *From the Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, Municipal*, Dated on 11th March, File No. 250L, wooden Bundle No. 4

[৪০]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের ঢাকা*, পৃ. ৮৭-৮

[৪১]. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন (সম্পা), ১৯৮১, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা

*Dhaka University Institutional Repository*

কিন্তু পরে পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে গড়ে উঠেছিল জনমত অর্থাৎ বাংলার জনমত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গের কিছু মুসলমান এর বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত ছিল বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে। যেহেতু ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর তাই ঢাকাতেই এ আন্দোলনের ব্যাপকতা ছিল বেশি। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে সারা বাংলায় প্রায় তিন হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এক হিসেব অনুযায়ী এসব সভায় উপস্থিত থাকতেন ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী এ সভার সংখ্যা ছিল ৫০০।[৪২] তবে এসব সভা ও আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল উকিল, মহাজন, জমিদার, তালুকদার, শিক্ষক, চিকিৎসক, সরকারি কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যেহেতু আলোচনার মূখ্য বিষয়বস্তু নিম্নবর্গ। সুতরাং বঙ্গভঙ্গের যুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে কিংবা বঙ্গভঙ্গ তাদের কতটুকু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থ বিবর্জিত অথবা সে সম্পর্কে তারা কতটুকু অবগত এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই হলো আমার কাজ।

সরকারি পক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের জন্য, ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করে। তাঁর সফরের পর পূর্ববঙ্গের জনমত স্পষ্টতঃ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে শহরাঞ্চলীয় মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা তেমন ভাবে করেননি, কিন্তু কার্জনের পূর্ববঙ্গ সফরের পর মুসলমান নেতৃবর্গের সুর বদলে যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অধস্তন মানুষ বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে চেয়েছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের অবস্থা সংহত করার জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর পূর্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমান সমিতিগুলি একত্রিত হয়ে ঢাকার নর্থব্রুক হলে সভা করে গঠন করেছিল 'মোহামেডান প্রভিনসিয়াল ইউনিয়ন'। পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ। পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্গের হিন্দুরা সম্ভবত মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণগত দিক থেকে নমশূদ্ররা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রামে হিন্দুরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ৩২.৬২%, নমশূদ্র ছিলেন এর মধ্যে ১৬.৭৫%। যশোর খুলনার মোট হিন্দু জনসংখ্যার ১৩.৭৮% ছিলেন নমশূদ্র।[৪৩] শুধু তাই নয় পূর্ববঙ্গে হিন্দু চাষীদের শতকরা ৯০% ছিলেন নমশূদ্র[৪৪]। নমশূদ্র নেতৃবর্গ ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগযোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করবেন এবং প্রতিরোধ করবেন এর বিরুদ্ধবাদীদের। বাখেরগঞ্জে নমশূদ্রের এক সভায় তারা ঘোষণা করেন ব্রাহ্মণদের ঘৃণা ও অপছন্দ এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদের কারণে বিরাট এই নমশূদ্র সম্প্রদায় পশ্চাৎপদ। অথচ মুসলমান সম্প্রদায় ও নমশূদ্র পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ; সুতরাং এই সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তাদের সঙ্গে কাজ করার বরং তারা

---

৪২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৭৫, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৪

৪৩. Sekhar Bondyopadhyay, 1981, *Caste and Politices in Eastern Bengal, The Namasudras and the Anti-Partition Agitation, 1905-1911*, Centre for Sagtheast Asian Studies, Calcutta University, p. 6; উদ্ধৃতি মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৭

৪৪. বাংলা ও আসামে দুই মিলিয়ন নমশূদ্র ছিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

হাত মিলিয়ে কাজ করবেন তাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে।[৪৫] ফরিদপুরেও তারা ঘোষণা করেন বঙ্গভঙ্গ '*সেটলড ফ্যাক্ট*' (settled fact) এবং তা রদ করা যাবে না।[৪৬] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল মূলত শহরে বিশেষ করে ঢাকা শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের ভদ্র লোকদের মধ্যে। ঢাকা ও ময়মনসিংহে এ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। তবে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে মনে হয় না। সাধারণ মানুষ এতে আলোড়িত হলে বঙ্গভঙ্গ সম্ভব হত না। সাধারণ মানুষ আলোড়িত হয়নি কেননা বঙ্গভঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল না। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণে 'জনসাধারণ সভা'র আয়োজনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এক বিশাল সমাবেশ হয়। এ সমাবেশে কমপক্ষে দশ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। কলকাতা থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আবদুল হালিম গজনবীসহ কয়েকজন প্রখ্যাত নেতা উক্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া স্থানীয় উকিল, জমিদার, মহাজন, অধ্যাপক, অধ্যায়নার্থী ও চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করেন। এ সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের সামাজিক অবস্থান ও প্রকৃতি ছিল বর্তমান সময়ের পেটি-বুর্জোয়া এবং দেশিয় উচ্চবর্গীয় শ্রেণির।[৪৭] দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১,০৮,৫৫১ জন। সুতরাং এদের মধ্যে মাত্র ১০-১২ হাজার লোক বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির মতামতকে প্রতিনিধিত্ব করে না। এ কথা বলার অর্থ এই যে, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থনকারীর তুলনায় নিরপেক্ষ বা অসমর্থন জনগোষ্ঠী ছিল বেশি। সুতরাং নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে এক অংশ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করলেও জনসংখ্যার বিশাল অংশ ছিল নিশ্চুপ। অথার্ৎ তাদের এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ ছিল না। তাই তাদের সম্পৃক্ততাও ছিল না। তবে বঙ্গভঙ্গ শহরে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্কে অনেকাংশে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিল।[৪৮] বঙ্গভঙ্গের বিরোধিরা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন শুরু করলে মুসলমানরা এ আন্দোলনকে ধর্মীয় রূপ দেয় এবং মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান ব্যতীত সবাই এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

## সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সমস্যাটি আসলে সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক কাঠামোগত বিষয়। সমাজ বিজ্ঞানে শহরকে একটি 'সম্প্রদায়' (কমিউনিটি) বলা হয়। সম্প্রদায়ের থাকে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক

---

[৪৫]. Sufia Ahmed, 1974, *The Muslim Community in Bengal (1884-1912)*, Asiatic Press, Dacca, p. 257

[৪৬]. Sufia Ahmed, *The Muslim Community in Bengal (1884-1912)*, p. 257

[৪৭]. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫; উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৬-৭৮

[৪৮]. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৫০ ও ১৫১

*Dhaka University Institutional Repository*

সীমারেখা, একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা এবং একটি অভিন্ন জীবন ধারা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যেমন বাস্তব সামাজিক ভিত্তি ও ঐতিহ্য রয়েছে তদ্রুপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামারও বিভিন্ন কারণ ক্রিয়াশীল। কারণগুলি কোন সময় অর্থনৈতিক, কোন সময় ধর্মীয়-সামাজিক হতে পারে। তবে যখনই কোন সম্প্রদায়ের ভেতর কায়েমি স্বার্থবাদী মহল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখনই সেটা মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার রূপ নিতে পারে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঢাকাসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে মূলত রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। ইতিহাসবিদদের মতে ইসলাম খাঁ কর্তৃক ঢাকা দখলের পূর্বে এখানে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল। বৌদ্ধ শিবের মন্দির, গুপ্ত আমলের কিছু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও প্রাক্-মুগল যুগের দু'টি মসজিদ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত তিনটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে। ১৬০৪ সালে বারভূঁইয়ার অন্যতম কেদার রায় ও তাঁর রাজধানী শ্রীপুরের পতন ঘটলে অসংখ্য তাঁতি ও কারিগর শ্রেণির লোকজন ঢাকায় আসতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইসলাম খাঁ যখন ঢাকা আসেন তখন এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম জনগোষ্ঠী সেখানে অবস্থান করছিল। তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার বা এক লাখ লোক নিয়ে ঢাকা আসেন, যারা সেখানে বসতি স্থাপন করে।

ঢাকা শহর শুরুতে ছিল হিন্দু সম্প্রদায় প্রধান এবং তার সমাজ জীবনে তাদের কর্মকাণ্ডের প্রভাব প্রতিফলিত হত। কিন্তু মুগল সেনা চৌকি স্থাপনের পর ঢাকা প্রকৃতপক্ষে একটি মুগল উপনিবেশে পরিণত হয়। ইতিহাসবিদ তাইফুরের মতে ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ঢাকার কুট্টিরা পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিক হিসাবে ঢাকায় এসে বসবাস করা শুরু করে। এরা ছিল ওহাবী পন্থী ও কিছু আদিবাসীর বংশধর। কুট্টি ছাড়া ঢাকার অপর মুসলিম সনাতন সামাজিক গোষ্ঠী খোশবাসী নিজেদের শহরের আদি বাসিন্দা বলে মনে করে। এরা জৌনপুরের মৌলানা কেরামত আলীর অনুসারী। ঢাকা শহরের দু'টি প্রাচীন মুসলিম সামাজিক গোষ্ঠীর মতো হিন্দুদেরও দু'টি সনাতন সামাজিক গোষ্ঠী রয়েছে। এরা হচ্ছে বসাক ও শাঁখারি। বসাকরা তাঁতি আর শাঁখারিরা কারিগর। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় বসাকদের ভেতর কেউ কেউ পাইকার ও দালাল হয়ে প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হয়। বসাকরা মালদহ থেকে ঢাকায় আসে। শাঁখারিরা একটি প্রাচীনতম ও সমপ্রকৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। এরা বল্লাল সেনের আমলে ঢাকা শহর প্রতিষ্ঠার তিন'শ বছর আগে বিক্রমপুর এলাকা থেকে এসে ঢাকায় বসবাস করতে থাকে। ঢাকা শহরের মুসলিম সমাজ শিয়া ও সুন্নী এই দুই উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। জাতি, বর্ণগতভাবে শহরের হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র-এই চারভাগে বিভক্ত ছিল। শূদ্রদের আবার দুই ভাগ- উচ্চ ও নিম্ন।

*Dhaka University Institutional Repository*

ধর্মীয় উৎসবাদি ঢাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে- একথা বলা মিথ্যা হবে না। এমন দু'টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে মুসলমানদের মহর্‌রম ও হিন্দুদের জন্মাষ্টমী। উভয় অনুষ্ঠানই এক সময় ঢাকাবাসী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উপভোগ করত। দু'টি অনুষ্ঠানেরই প্রধান আকর্ষণ ছিল বিরাট শোভাযাত্রা। মহর্‌রমের তাজিয়ায় হিন্দু-মুসলমান সকলের অংশীদারীত্ব ছিল। বিশেষ করে, হিন্দু মেয়েরা বিশ্বাস করত যে, তারা যদি তাজিয়ার সাথে হাঁটে তাহলে তারা সন্তান লাভ করবে। ঢাকার মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মহর্‌রম উৎসব যে রকম সাড়ম্বরে পালিত হত, মিছিল হত এবং উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে সম্প্রীতি সৃষ্টি হত সে রকমভাবে হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানও হত। যতটুকু জানা যায়, শায়েস্তা খানের আমলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে জন্মাষ্টমী পালন করা শুরু হয়। আগ্রা ও দিল্লির মুগল রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো জন্মাষ্টমীর মিছিলকে সাজানো হত। মুগল সুবাদারের সৈন্যবাহিনী তাদের পরিপূর্ণ সাঁজোয়াসহ এতে অংশগ্রহণ করত। গোড়ার দিকে নবাবপুরের তাঁতি সম্প্রদায় ও ইসলামপুরের কারিগররা একদিনে দু'টি জন্মাষ্টমীর মিছিল বের করত। প্রথমটি হচ্ছে বসাকদের, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শাঁখারিদের। মুসলমানরা আনন্দ উল্লাসে এতে অংশগ্রহণ করত। তাইফুর তাই জন্মাষ্টমীর এ শোভাযাত্রাকে এক ধরনের বার্ষিক Walking exhibition of Dhaka arts and crafts বলে অভিহিত করেন। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় ঢাকা শহরের আরেকটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ছিল যাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক স্বচ্ছন্দভাবে একত্রে অংশ গ্রহণ করত। এটি হচ্ছে হোলি তথা বসন্তোৎসব। এছাড়া, চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দের মেলা বসত, যা ঐতিহ্যবাহী হিন্দু-মুসলমানদের মিলন ও সম্প্রীতির স্মারক। এভাবে শত শত বছর এক সাথে বাস করে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ একে অন্যের ধ্যান-ধারণা ও প্রথা-পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইসলাম ও হিন্দুধর্ম একে অপরকে প্রভাবিত করে। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মন থেকে ধর্মান্ধতা দূর হয়। মুসলমানরা যেমন হিন্দু মন্দিরে পূজা দিত, তেমনি হিন্দুরা মুসলমানদের মসজিদে সিন্নী দিত। এ প্রক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলমানদের অভিন্ন দেবতা 'সত্য পীরের' উদ্ভব ঘটে।[৪৯]

উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকা সারা ভারতের ভেতর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এ সম্পর্কে ১৮৯৩ সালের ২৯ জুলাই *সারস্বত পত্র* নামক একটি সাময়িকী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ঢাকাকে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে যা লিখে তা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। "এটা সত্যি যে, ঢাকার সামজের অনেক ত্রুটি ও দুর্নাম আছে। কিন্তু এখন যখন দেশে গরু কোরবানী নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন চলছে সে সময় ঢাকা এসব থেকে মুক্ত। ঢাকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিখুঁত ভালো সম্পর্কই বিদ্যমান। উভয়ে

---

৪৯. রংগলাল সেন, 'ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা', ইফতিখার-উল-আউয়াল (সম্পা), ২০০৩, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, পৃ. ৭৬-৮৬

*Dhaka University Institutional Repository*

ধর্মীয় উৎসবাদিতে যোগ দেয় এবং কেউ কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিতে চায় না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উচিত ঢাকাকে অনুসরণ করা।"[৫০]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ঢাকায় প্রথম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিজেদের দু'টি উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে। ১৮৬৯ সালে ঢাকায় শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্নীদের প্ররোচনায় শিয়াদের চাকর-বাকর, বাবুর্চী এমনকি মেথররাও তাদের কাজকর্ম করতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে নওয়াব আবদুল গণির হস্তক্ষেপে বিষয়টি মীমাংসা করা হয়।[৫১] জন্মাষ্টমীর মিছিল কারা আগে বের করবে এ নিয়ে ১৮৬০ সালে বসাক ও শাঁখারিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। জন্মাষ্টমীর মিছিল নিয়ে এদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল। ১৮৬০-৬৭ পর্যন্ত এদের মধ্যে এ নিয়ে প্রত্যেকবার কমবেশি সংঘাত হয়েছে। ১৮৬৮ সালে বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার সিসিল বিডন স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে দুইদিনে দু'টি মিছিল বের করার ব্যবস্থা করলে এ সংঘাত বন্ধ হয়।[৫২]

১৮৮৪ সালে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষিত হলে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে একটি উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মিউনিসিপ্যাল সভায় হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যাধিক হয় এ আশঙ্কায় মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করে প্রতিকারার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কারণ গভর্নমেন্টের এক-তৃতীয়াংশ কমিশনার মনোনয়নের অধিকার থাকছে। তাই গভর্নমেন্ট মুসলমানদেরকেও কমিশনার পদে মনোনীত করতে পারবেন। সম্ভবত এ সময় হিন্দু-মুসলমানগণ মিউনিসপ্যাল সভায় প্রতিনিধিত্ব নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্বে অবতীর্ন হয়। তাই 'ঢাকা প্রকাশ' এ দ্বন্দ্ব নিরাসনে পরামর্শ প্রদান করে। সমসাময়িক ম্যাজিস্ট্রেট নবাব সাহেবকে অনুরোধ করেন যাতে ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ব্যাপক আকার ধারণ না করে।[৫৩] ১৮৮৪ সালের নির্বাচন শেষে দেখা যায় ১৪ জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ৮ জন হিন্দু ও ৬ জন মুসলমান।[৫৪]

যাইহোক বিশ শতকের শুরুতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। বিশেষত যখন থেকে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর এবং অবশেষে প্রত্যাহার সবকিছুর পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গূঢ় অভিসন্ধি। প্রশাসনিক

---

৫০. মুনতাসীর মামুন, ১৯৮৭, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১২২

৫১. রফিকুল ইসলাম, ১৯৮২, *ঢাকার কথা: ১৬১০-১৯১০*, ঢাকা, পৃ. ১৪০

৫২. S. M. Taifoor, 1956, *Glimpses of Old Dacca*, Dacca, p. 165

৫৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬; উদ্ধৃতি, কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮৮৮-৯

৫৪. Letter, *From the Officiating Commissionar of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, dated 15th December, 1884, p. 3; Proceeding B, wooden Bundle No. 14

*Dhaka University Institutional Repository*

কারণে এই প্রস্তাব পাশের কথা ইংরেজ সরকার ঘোষণা করলেও, একতাবদ্ধ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করাই ছিল তাদের গোপন অভিপ্রায়। একমাত্র এ আন্দোলনটি শেষ পর্যায়ে মুসলমান ও হিন্দু যে আলাদা দু'টি সম্প্রদায় তা উপলব্ধি করাতে এবং সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পেরেছিল। বিভক্ত করে তুলেছিল পূর্ববঙ্গের জনগণকে দু'টি বিবাদমান শিবিরে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিপক্ষে ঢাকা শহরে গঠিত হয়েছিল জনসাধারণ সভা (Peoples' Association)। যার নেতৃত্বে ছিলেন আইনজীবী ও জমিদার আনন্দ্র চন্দ্র রায়। সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনে কোন আগ্রহ ছিল না। তাদেরকে নেতৃবৃন্দ যেমন কাছে টেনে নিতে পারেনি, তেমনি তারা দেখেছিল এই আন্দোলন তাদের কোনরকম স্বার্থসিদ্ধি করবে না।

১৯০৪ সালের ১৩ নভেম্বর নওয়াবপুর পুলের নিকট অবস্থিত মসজিদের সামনে ঢাকায় প্রথম একটি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় শাঁখারি বাজারে রক্ষাকালীর ভাষাণ উপলক্ষে সংকীর্তনাদিসহ দেবীমূর্তি বের করা হয়। পূজারীরা উক্ত মসজিদের পাশ দিয়ে এশার নামাজ চলাকালে বাদ্যসহকারে যাবার সময় মুসল্লীরা লাঠিসোটা দিয়ে বাঁধা দেয়। সংঘর্ষে হিন্দু পক্ষের ৭/৮ জন লোক আহত হয়। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাংকিন এবং নওয়াব সলিমুল্লাহ সাহেব ঐ ঘটনার মধ্যস্থতা করেন।[৫৫] ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের ফলে এতদাঞ্চলের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া শুরু করে। নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ মুসলমান সরকারের বঙ্গবিভাগকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন নেতাদের প্ররোচনায় এতদাঞ্চলের অধিকাংশ হিন্দুরা এর বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অনেক স্থানেই সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় পর্যবসিত হয়।[৫৬]

বঙ্গবিভাগ বিরোধী আন্দোলনকারীদের নানা উস্কানী সত্ত্বেও নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর অনুসারীদেরকে ধৈর্য্য সহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পরামর্শ দেন। ১৯০৭ সালের ৪ এবং ৫ মার্চ নওয়াব সলিমুল্লাহ মুসলমান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে কুমিল্লায় সভা করতে যান। সেখানে কংগ্রেস সমর্থক হিন্দুরা তাঁর সভা পণ্ড করার জন্য ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি করে। এমন কি ৮ মার্চ তিনি সদলবলে ঢাকায় ফেরার পথে কতিপয় দুবৃর্ত্ত তাঁকে বহনকৃত রেলগাড়িটি লাইনচ্যুত করার হীন চেষ্টাও করেছিল। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা ১২ মার্চ শাহবাগে একটি বিরাট প্রতিবাদ সভা করেন। সভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ও খাজা মোহাম্মদ আজম মুসলমানদেরকে কোন প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থেকে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেন।[৫৭] ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টোর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং উনিশ

---

[৫৫]. মোঃ আলমগীর, (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত), ১৯৯৯, *বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা, পৃ. ৪৮

[৫৬]. ঐ, পৃ. ৪৮

[৫৭]. ঐ, পৃ. ৪৯

*Dhaka University Institutional Repository*

শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহের জন্য একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এদের (হিন্দু ও মুসলিম) রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ এবং এর ফলে এসকল মানুষই ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় বেশি।

ইউরোপীয়দের প্রবর্তিত বর্ণবাদও বাংলার সকল পেশা, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের চৈতন্যকে আলোড়িত করে। ১৮৫৫ সালে ভারতীদের জন্য সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতামূলক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় যিনি ১৮৬৩ সালে আইসিএস পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হন। এরপর থেকে একজন/দুইজন করে ভারতীয়রা আইসিএস পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয় এবং ব্রিটিশ-ভারত প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ক্রমশ প্রশাসনে ভারতীয়দের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাই গর্ভনর জেনারেলের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ইলবার্ট ১৮৮৩ সালে একটি আইন পাস করে যা 'ইলবার্ট বিল' নামে পরিচিত। বিলটির বিষয়বস্তু হলো ভারতীয় বিচারকরা ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ নাগরিকদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বিচার করতে পারবে। যা পূর্বে ভারতীয় বিচারকদের এখতিয়ার ছিল না। কিন্তু ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশরা এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ভারতীয়রা এর পক্ষ অবলম্বন করে। অবশেষে ইউরোপীয়দের চাপের মুখে ব্রিটিশ সরকার বিলটি বাতিল করে। ইলবার্ট বিলের সময় থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি এবং তারা এটাও দেখেছিল যে, সরকার কি ভাবে নতি স্বীকার করেছিল মুষ্টিমেয় ইংরেজ অধিবাসীর কাছে। ইউরোপীয়দের এরূপ বর্ণবৈষম্যের দু'বছর পর ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ভারতীয় এলিটদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চৈতন্য জাগ্রত হয়।[৫৮] তাছাড়া ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সামরিক শক্তির দিক দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদেরকে অনিরাপদ প্রমাণিত করে এবং পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক নিয়মিত আদমশুমারির ফলাফল তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি জাগ্রত করে যে, ভারতীয়দের তুলনায় তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। তাই পরবর্তীতে লর্ড কার্জনের সময় বিশেষত ১৮৯৯ ও ১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের মধ্যে বর্ণভিত্তিক মানসিকতা চূড়ান্ত রূপ নেয়।[৫৯]

এ অধ্যায়ে আমি ঢাকা পৌরসভায় নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন, কর বৃদ্ধি, দু'টি সামাজিক আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং ব্রিটিশ সরকার স্বায়ত্তশাসন মজবুত করার জন্য নির্বাচন প্রথা চালু করে এবং বার বার নতুন নতুন কর আরোপ বা বর্ধিত করে। যা অসন্তোষের সৃষ্টি করে। নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে পৌরসভা নির্বাচনে

---

[৫৮]. Kenneth Ballhatchet, 1980, *Race, Sex and Class Under the Raj*, p. 6, 7, 83 & 113
[৫৯]. Kenneth Ballhatchet, 1980, *Race, Sex and Class Under the Raj*, p. 6

*Dhaka University Institutional Repository*

অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার অর্জনের জন্য যেসব শর্ত নির্ধারণ করে তা নিম্নবর্গ পূরণ করতে অপারগ ছিল। উপরন্তু বার বার কর বৃদ্ধির জন্য তাদের প্রত্যাহিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে। ব্রাহ্ম ও সহবাস সম্মতি আন্দোলনের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে জড়িত ছিল ধর্মীয় প্রশ্নাবলী। স্পষ্ট করে বলা যায়, এগুলি ছিল হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। ব্রাহ্ম আন্দোলন ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের সমাজ জীবনের বদ্ধ জলাশয়ে যে খানিকটা আলোড়ন তুলেছিল তা মূলত শহরের উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে তাদের আন্দোলনের ফলে যে বাদ, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ হয়েছিল তা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আন্দোলনের সময়। তবে এ আন্দোলনও শহরে বসবাসরত শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কেই আলোড়িত করেছিল। এর বাইরে এ আন্দোলন তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি। অন্যদিকে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে জড়িত ছিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার শুরু হয় তার বিষবৃক্ষ ছিল- ১৯৪৭ সালে ধর্ম ভিত্তিক দু'টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্ম। আমার আলোচ্য আন্দোলনগুলি ছিল প্রধানত শহর কেন্দ্রিক এবং এর নেতৃত্বে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আন্দোলনগুলি বিশেষত উক্ত শ্রেনিটিকেই আলোড়িত করেছিল। ঢাকা বা পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ বা নিম্নবর্গের সাথে উল্লেখযোগ্য কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। ফলে তাদের চৈতন্যকেও স্পর্শকে করেনি কারণ আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির কোন প্রশ্ন জড়িত ছিল না।

*Dhaka University Institutional Repository*

# উপসংহার

উৎপত্তিগতভাবে 'ঢাকা'র নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত থাকলেও ১৬১০ সালে সুবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের পর একটি বাজু বা সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নগর বা শহর হিসাবে ঢাকা আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে ওঠে। মুগল সৈন্যবাহিনী অবস্থানের পর ঢাকা একটি মুগল ঔপনিবেশিক শহরে পরিণত হয় এবং প্রাক-মুগল শহর 'সোনারগাঁও' এর জৌলুস হারিয়ে যায়। ১৬০৪ সালে বার ভূঁইয়ার অন্যতম জমিদার কেদার রায় ও তাঁর রাজধানী শ্রীপুরের পতনের পর অসংখ্য তাঁতি ও কারিগর ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। অন্যদিকে আবদুল করিম বলেন, ১৬১০ সালে ইসলাম খাঁ তাঁর কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিভিন্ন পেশা ও সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০,০০০ জন জনবল নিয়ে ঢাকায় বসতি শুরু করে। সুতরাং সোনারগাঁও এর পরিবর্তে ঢাকা ক্রমশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মুগল প্রশাসনিক কাজকর্মও ঢাকা থেকে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে বিদেশি কিংবা ইউরোপীয় বণিকরা ব্যবসার জন্য মুগল সরকারের স্থানীয় প্রশাসন ঢাকার প্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হত। ফলে ঢাকা মুগল সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়। নদীপথেও সড়কপথে সহজ যোগাযোগের জন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির লোকজন তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য ঢাকায় পাড়ি জমায়। একবিংশ শতাব্দীতে এসেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুগল আমল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের জনসংখ্যার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রথম কয়েকটি দশক ছাড়া সবসময়ই এর জনসংখ্যা ক্রমশ বর্ধিষ্ণু ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও একথা অনুমেয় যে, ঢাকা শহরের জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিবাসী সব আমলেই (মুগল আমল, কোম্পানি আমল ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল) দরিদ্র ও গরিব ছিল। এরা হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। এসব জনগোষ্ঠীর সাথে আরও কিছু সম্প্রদায় ও শ্রেণিকে সম্পৃক্ত করে বিশ শতকের শেষের দিকে রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ধারণাটি প্রদান করেন। বর্তমান সময়ে মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদরা নিম্নবর্গকে জ্ঞানের একটি শাখায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর সমাজের প্রভু এবং অধীনের সম্পর্কটা যাদের জীবনে খুবই প্রকট অথচ যারা আমাদের ইতিহাস চর্চায় এখনো প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী নিম্নবর্ণ, গ্রাম বা শহরের গরিব জনতা ও নারী জাতি নিম্নবর্গ সংজ্ঞার আওতাধীন। এরা আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ এবং রাজনৈতিকভাবে অসচেতন। হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথায় যারা নিম্ন পর্যায়ের কাজ করে তাদরকে দলিত সম্প্রদায়ও বলা হয়। ঢাকা শহরে এই দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অংশ বাঙ্গালি ও বাংলায় কথা বলে। অন্য একটি অংশকে ব্রিটিশরা ১৮৩৫ সাল থেকে

*Dhaka University Institutional Repository*

তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এনে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তারা কাজের সন্ধানে বাংলায় আসে। অভিসন্দর্ভে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সম্প্রদায়ের নাম এবং তাদের বৈচিত্র্যময় পেশার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া গণিকা, কয়েদি এবং অভিবাসীদেরকেও নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাক-মুগল আমল থেকে ঢাকা শহরে নিম্নবর্গের সমাবেশের দৃশ্যত প্রমাণ হলো ক্রমশ এর পারিসরিক বৃদ্ধি। তাই আবদুল করিম ঢাকা শহরের প্রসারের জন্য বাঙ্গালি পেশাজীবী, মিস্ত্রি ও কারিগর শ্রেণির সমাবেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বর্ণনা করেন। ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী বিশেষত ব্রিটিশরা যখন ঢাকায় বসতি স্থাপন ও বাণিজ্য শুরু করে তখন থেকে ঐসকল পেশাজীবী শ্রেণির আগমন এবং পাশাপাশি ঢাকার ভাগ্য বিপর্যয়ও আরম্ভ হয়। বার বার প্রাকৃতিক হেয়ালিপণা, ব্রিটিশদের বাণিজ্য নীতি এবং উৎপদান পদ্ধতির পরিবর্তন এ বিপর্যয়ের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে দেখা যায়, মুগল আমলে ঢাকার আয়তন ও জনসংখ্যা ব্রিটিশ আমলে এসে ব্যাপক হ্রাস পায় যা প্রায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা জঙ্গল, নর্দমা, ডোবা ও দুর্গন্ধময় শহর হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বিলেতি পণ্যের আমদানির ফলে তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়। তাঁত শিল্পের সাথে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিম্ন আয়ের মানুষ জড়িত ছিল। বাংলা তথা ঢাকায় তাঁত ছিল প্রধান শিল্প। সুতরাং তাঁত শিল্পের ধ্বংসের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত বিপুল সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। উনিশ শতকে ব্রিটিশরা রপ্তানিকারক ও লাভজনক পণ্য হিসাবে নীল চাষের প্রচলন করে। প্রথমদিকে চাষীরা নীলচাষের ক্ষতিকারক দিক উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই ইতিমধ্যে লুপ্ত তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত বেকার শ্রমিকরা কৃষি কাজের সাথে বিশেষত বিদেশি পণ্য নীল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বেশির ভাগ নীল উৎপাদিত হত ঢাকার বাইরে প্রধানত যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে। এ সময় ঢাকার একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী ঢাকার বাইরে চলে যায়। যার প্রমাণ পাওয়া যায় জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে। উল্লেখ্য এই বিশাল জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পশ্চাতে প্রাকৃতিক মহামারির দৃষ্টান্ত নেই। ১৮০১ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ২০০,০০০ জন এবং ১৮৩০ সালে যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬৬,৯৮৯ জনে। ফলে ঢাকার আয়তন কমে যায়, বেশির ভাগ অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং বন-জঙ্গলে ঢেকে যায়। শহরের জনসংখ্যার পতন হয়। কিন্তু জেমস টেলর, আহমেদ হাসান দানী, আবদুল করিম ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদরা এ সময়টাকে ঢাকা শহরের 'পতন' হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আমার মনে হয়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকা শহরের পতন হয়েছে না বলে, নব দিগন্তের উন্মেচোনের জন্য ঢাকা শহরে নানা 'এ্যাক্সপ্রিমেন্ট' চালানোর সময় হিসাবে বর্ণনা করা যুক্তি সঙ্গত।

*Dhaka University Institutional Repository*

কেননা, তাঁত শিল্পের ধ্বংস এবং বাঙ্গালিদেরকে কৃষি মুখী করার জন্য (বিলেতি পণ্যের বাজার আরো সুদৃঢ় করাও লক্ষ্য ছিল) নীল চাষের প্রচলনের ফলে ঢাকা থেকে মানুষ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে যায়। অর্থনৈতিক স্থাবরিতার জন্য শ্রমিক শ্রেণি বিশেষত অভিবাসীদের (movement of working class) শহরে আগমন হ্রাস পায়। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রভাব শুধুমাত্র ঢাকাবাসীর ওপরই পরেনি বরং ঢাকার পরিবেশ ও আয়তনকেও সমভাবে প্রভাবিত করে। যাকে অনেকে ঢাকা শহরের পতন বলে অভিহিত করে। ঢাকা ছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর। ব্রিটিশ প্রতিনিধি, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বণিক, নীলকর ও দেশিয় জমিদারগণ ঢাকায় বসবাস করত। ঢাকা শহর থেকে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য মফস্বল শহরগুলিকে পরিচালনা করা হত। ১৮২৯ সালে ঢাকায় বিভাগীয় সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। সুতরাং দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর ও জঙ্গলপূর্ণ শহরকে ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ ও দেশিয় উচ্চবর্গের জন্য বসবাসযোগ্য করার স্বার্থে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল থেকে নিম্নবর্গকে নিয়ে আসে। এসব কাজের জন্য কর প্রদান করে আর্থিক যোগানদাতা ছিল ঢাকায় বসবাসরত স্থানীয় অধিবাসী। ১৮১০ সালে গৃহকর আরোপ করা হয়। ১৮১৩ সালে চৌকিদারি কর আরোপিত হয় যা ১৮১৬ সালে সম্প্রসারিত হয়। ১৮১০ সালে ঢাকায় অবস্থানরত কিছু ইংরেজ কর্মচারী কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে ঢাকা শহর পরিষ্কার ও বাসযোগ্য করার জন্য একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন যা কালক্রমে ঢাকা পৌরসভা কমিটিতে পরিণত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশরা ঢাকায় দেওয়ানী আদালত (১৭৮০), নেটিভ হাসপাতাল (১৮০৩), লুনাটিক এসাইলাম (১৮১৯), বিভাগীয় সদর দপ্তর (১৮২৯), প্রকৌশলী বিভাগ (১৮৩০), ঢাকা কলেজ (১৮৪১), আবগারি বিভাগ (১৮৪৪), ঢাকা ব্যাংক (১৮৪৬) ও পূর্বাঞ্চলীয় জরিপ বিভাগের সদর দপ্তর (১৮৫০ এর দশকে) প্রভৃতি স্থাপন করে। এছাড়া ঢাকা-কে পৌরসভায় উন্নীত করার জন্য পর্যায়ক্রমে কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৮৩৫ সালে ঢাকা শহরে শিক্ষা বিস্তারের জন্য গঠন করা হয় Local Education Committee। ব্রিটিশ সরকার পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে এবং ইংরেজি ভাষাকে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান ও ঢাকায় কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় স্থাপনের পর পূর্ববঙ্গের অন্যান্য মফস্বল শহর থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তের সন্তানরা উন্নত শিক্ষার জন্য ঢাকায় গমন করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়র্ধে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা ও পাট শিল্পের প্রসারের জন্য গ্রামের লোকজন পুনরায় ঢাকামুখী হয়। movement of working class এর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এসব সাধারণ মানুষ জনের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা মুগল আমলের তুলনায় ব্রিটিশ আমলে দৈন্য ছিল। মুগল আমলে ঢাকার অধিবাসীরা লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করত। তারা কৃষি, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প ও শাঁখারি শিল্প প্রভৃতি নির্ভর জীবন নির্বাহ করত। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পাশাপাশি উৎপাদন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে। বিলেতি পণ্যের জোয়ারে কুটির শিল্প ও তাঁত শিল্পের যবনিকাপাত ঘটে।

*Dhaka University Institutional Repository*

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারির কারণে মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা ছিল তাদের আবাসস্থল। এরূপ দুর্বিষহময় জীবনে ঔপনিবেশিক সরকার শোষণের হাতিয়ার হিসাবে 'কর' নামক একটি অদৃশ্য ভূতকে চাপিয়ে দেয় যা ছিল তাদের জীবনে এক অভিনব বোঝা। ব্রিটিশ সরকার নানা প্রকার কর আরোপ করে, যেমন- গৃহকর, চৌকিদারি কর, লবণ কর, শৌচাগার কর, পথ কর এবং বাণিজ্য কর প্রভৃতি।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিবেদনগুলিতে বলা হয় সাধারণ মানুষ ভালো ভাবে বেঁচে আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় ও খাদ্য দ্রব্যের মূল্যস্ফীতি বিশ্লেষণ করলে সরকারের বিবৃতি সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না। জেমস টেলর দেখিয়েছেন, ১৮০৩ সালে শ্রমিকদের বেতনের থেকে ১৮৩৭ সালে শ্রমিকদের মজুরি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮০৩ সালে একজন দক্ষ প্রথম শ্রেণির ও চতুর্থ শ্রেণির কুলির মাসিক মজুরি ছিল যথাক্রমে ১ টাকা ও ০.৫০ টাকা। ১৮৩৭ সালে তাঁর মজুরি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২.২৫ টাকা ও ১ টাকা। কিন্তু ১৮১০-১৮৩৬ সালের বিভিন্ন পণ্যের গড় মূল্য যেমন- আমন চাল প্রতি মণ ১ টাকা ১৫.৫০ পাই, মুগ ডাল মণ প্রতি ১ টাকা ১১ আনা ৪ পাই ও গম মণ প্রতি ১ টাকা ৮ আনা ১৩ পাই। ১৮৩৮ সালে ঢাকা শহরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের বিবাহ এর জন্য ১০ টাকা এবং মরদেহ দাহ ও কবর দেয়ার জন্য ৭ টাকা ব্যয় হত। ১৮৬৭ সালে একজন মেথর ও সুইপারের মাসিক বেতন ছিল ১ রূপি ও ৩ রূপি। কিন্তু ১৮৬৬ সালে সাধারণ চালের প্রতি সের মূল্য ছিল গড়ে প্রায় ৮.৩৭ রূপি (দেখুন অভিসন্দর্ভের পৃ ১১৯ বা তৃতীয় অধ্যায়)। ১৮৭৪-৭৮ সালে ঢাকা জেলায় গম, বার্লি, সাধারণ চাল ও লবণের প্রতি মণের গড় মূল্য ছিল যথাক্রমে- ৬০.২৫ রূপি, ৩২.৯৬ রূপি, ১৮.৯২ রূপি ও ৮.৩৯ রূপি। উল্লেখিত সময়ে দক্ষ শ্রমিকদের ও অদক্ষ শ্রমিকদের গড়ে মাসিক বেতন ছিল যথাক্রমে ৮-১৬ রূপি ও ৫-৬.৫০ রূপি। একটি আদর্শ পরিবারের সদস্য ধরা হয় কমপক্ষে ৫ জন। সুতরাং যে পরিবারে একজন উপর্জনক্ষম ব্যক্তি তার উক্ত মাসিক বেতন দিয়ে উচ্চ মূল্যে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে কিভাবে জীবন নির্বাহ করতেন তা অনুমান করা খুবই কষ্ট সাধ্য। এরূপ দুর্বিষহ জীবন যাপন করলেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা যায় না। প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন বা রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের জন্য একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া উনিশ শতকের পুরোটা সময় তাদের মধ্যে কোন বিপ্লবী বা বিদ্রোহী মনোভাব দেখা যায় না।

১৮১০ সালে গৃহকর ও ১৮১৩ সালে চৌকিদারি কর আরোপের পর এক ধরণের গণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। 'জনসাধারণ সভা'র প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে ঢাকা পৌরসভায় নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলেও সাধারণ মানুষের (যারা কর প্রদান করতে পারত না) ভোটাধিকার ছিল না এবং তারা কাউন্সিলর প্রার্থী হতে পারত না। অন্যদিকে উনিশ শতকের পুরোটা সময় ধরে বাংলায় যে সামাজিক আন্দোলন, সামাজিক সংস্কার-প্রতিসংস্কার, বাংলার পুর্ণজাগরণ বা বঙ্গীয় রেনেঁসা সংঘটিত হয় তা ঢাকার সাধারণ মানুষকে আন্দোলিত করতে পারেনি। যে আদর্শ নিয়ে ব্রাহ্ম

*Dhaka University Institutional Repository*

আন্দোলন সংগঠিত হয় তাতে ধর্মীয় আবেগ ছিল বেশি। উনিশ শতকে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের (উগ্রপন্থী, মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীল) মধ্যে মডারেট বা মধ্যপন্থীরা ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। তারা ঢাকায় ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তাদের উদারনৈতিক আদর্শ বর্ণ প্রথাকে আঘাত করে ও ধর্মীয় কুসংস্কার বিলোপ সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষদের পক্ষে গিয়েছে।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিকভাবে বিশ শতক ছিল অশান্ত। ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং রাজনীতির শুরু হয় তার পরিণতি ছিল নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে সাধারণ মানুষদের সম্পৃক্ততা ছিল না, কারণ এ আন্দোলন তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল না। নেতৃত্বেও ছিল দেশিয় উচ্চবর্গ শ্রেণি, স্বদেশী আন্দোলন এবং বিলেতি দ্রব্য বর্জনের আহ্বানও তাদের চৈতন্যকে আন্দোলিত করতে পারেনি। আর ১৯৭১ সালে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনীতির পরাজয় ঘটে কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি।

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট-১

**ব্যবস্থাপনা ব্যয়:**

| কর্মকর্তার নাম ও কর্মচারীদের পদবী | পরিমান (টাকা) প্রতি মাসে |
|---|---|
| জন স্ট্যাকহাউজ | ৪০ |
| হামফ্রেস কোল | ২০ |
| এডওয়ার্ড রেন্ডস | ২০ |
| টমাস কুক | ২০ |
| স্যামুয়েল গ্রীনহীল | ২০ |
| উইলিয়াম ডেভিস | ২০ |
| নাথানিয়েল হল | ২০ |
| চীপের জন্য একটি ঘোড়া | ৯ |
| ২ জন চাবদার | ৬ |
| ধোপা | ৪ |
| নাপিত | ২-৮ |
| গুরয়ালিস (Gurryallys?) | ৬ |
| ফরাস | ৪ |
| পতাকা বহনকারী | ২-৮ |
| ২ জন মালি | ৪ |
| ১ জন মিরদা (মৃধা) | ৩ |
| খিদমতগারগণ | ১২ |
| কাহারগণ (পালকি বাহক) | ১২ |
| ঝাড়ুদার | ৫ |
| মশালচী (যিনি বাতি জ্বালায় ও বহনকরী) | ২ |
| বাবুর্চি ও খাদ্য তত্ত্বাবধানকারী | ১০ |
| উকিল বা প্রতিনিধি | ৫০ |

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট-২

| ভৃত্যদের পদবী এবং যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত | মাসিক বেতন (টাকা) |
|---|---|
| খানসামা | ৫ |
| চোপদার | ৫ |
| বাবুর্চি | ৫ |
| কোচওয়ান | ৫ |
| প্রধান চাকরানি | ৫ |
| জমাদার | ৪ |
| বাবুর্চির সাহায্যকারী | ৩ |
| ধাত্রী | ৩ |
| প্রধান বেহারা | ৩ |
| সাহায্যকারিনী দাসী | ৩ |
| পিয়ন | ২-৮ |
| বেহারা | ২-৮ |
| ধোপা (বিবাহত ব্যক্তির) | ৩ |
| ধোপা (অবিবাহিত ব্যক্তির) | ১.৫০ |
| ঘোড়ার সহিস | ২ |
| মশালচী | ২ |
| নাপিত | ১.৫০ |
| কারপরদার | ২ |
| মালি | ২ |
| ঘোড়া ঘসেরা | ১.৫০ |

*Dhaka University Institutional Repository*

# পরিশিষ্ট-৩

## দরিদ্র হিন্দুর বিবাহ ব্যয়

| খরচের খাত | টাকা | আনা |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মণ | ১ | ০ |
| বর ও কনের জন্য কাপড়-চোপড় | ২ | ০ |
| শঙ্খ নির্মিত বাল | ১ | ০ |
| চিরুণী ও সিদুঁর | ০ | ৪ |
| অলঙ্কারাদি | ১ | ০ |
| বাদ্যকরগণ | ০ | ৪ |
| কনের মাথার চূড়া বা চাঁদি | ১ | ০ |
| ধোপা | ০ | ৪ |
| নাপিত | ০ | ৪ |
| ভোজ | ২ | ০ |
| বিবিধ | ১ | ০ |
| সর্বমোট | ১০ | ০ |

## দরিদ্র মুসলমানের বিবাহ ব্যয়

| খরচের খাত | টাকা | আনা |
|---|---|---|
| কাজী | ০ | ৮ |
| পোশাক পরিচ্ছদ (বর কনের) | ৩ | ০ |
| চিরুণী ও অন্যান্য | ০ | ৪ |
| লাক্ষার চুড়ি বা বালা (অলঙ্কার) | ০ | ৮ |
| মাথার চূড়া বা চাঁদি | ০ | ৮ |
| নাপিত | ০ | ৪ |
| ভোজ | ২ | ০ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| গান-বাজনা ও অন্যান্য খরচ পত্রাদি | ৩ | ০ |
| **সর্বমোট** | ১০ | ০ |

# পরিশিষ্ট-৪

**দরিদ্র হিন্দু ও মুসলমানদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়**

| হিন্দু | | | মুসলমান | | |
|---|---|---|---|---|---|
| খরচের খাত | টাকা | আনা | খরচের খাত | টাকা | আনা |
| শেষকৃত্য সংক্রান্ত বস্ত্রাদি | ০ | ৮ | কবর খননকারী | ০ | ১২ |
| চিতাগ্নি দেয়ার ডোম | ০ | ৮ | শবাধার, কাপড়, মাদুর, বাঁশ ইত্যাদি | ১ | ০ |
| অগ্নি কাষ্ঠ | ০ | ১২ | মোল্লা | ০ | ৪ |
| সন্দাল, ঘি ও বাঁশ ইত্যাদি | ০ | ৪ | | | |
| **মোট** | ২ | ০ | **মোট** | ২ | ০ |

**হিন্দুদের শ্রাদ্ধপর্ব**

| **খরচের খাত** | **টাকা** | **আনা** |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মণ | ১ | ০ |
| বস্ত্রদান | ১ | ০ |
| চাল ও ডাল | ২ | ০ |
| ব্রাহ্মণগণের জন্য ভোজানুষ্ঠান | ১ | ০ |

*Dhaka University Institutional Repository*

| | | |
|---|---|---|
| পিতলের পাত্রাদি | ১ | ০ |
| নাপিত | ০ | ৪ |
| ধোপা | ০ | ৪ |
| বিবিধ | ০ | ৮ |
| মোট | ৭ | ০ |

মুসলমানদের চতুর্থ ফতেহা পাঠ

| খরচের খাত | টাকা | আনা |
|---|---|---|
| মোল্লা | ১ | ০ |
| খাদ্য ইত্যাদি | ০ | ৪ |
| তাম্র থালা ও অন্যান্য | ১ | ০ |
| গরিবদের মধ্যে কড়ি বিতরণ | ০ | ৪ |
| প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাতেহা উপলক্ষে খরচ | ২ | ৮ |
| মোট | ৫ | ০ |

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জি

## সরকারি অপ্রকাশিত রিপোর্ট ও চিঠি-পত্র

1. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, wooden Bundle 21, Serial No. 21; List No. 7; Resolution on the working of Municipalities in Bengal during 1889-90

2. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, wooden Bundle 22, Serial No. 22; List No. 7; Resolution on the working of Municipalities in Bengal during 1890-91

3. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Wooden Bundle 28, Serial No. 28; List No. 7; Municipal Resolution for 1895-96

4. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Wooden Bundle 30, Serial No. 30; List No. 7; Municipal Resolution for 1897-98

5. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Wooden Bundle 29, Serial No. 29; List No. 7; Municipal Resolution for 1896-97

6. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Wooden Bundle 31, Serial No. 31; List No. 7; Municipal Resolution for 1898-99

7. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Wooden Bundle 32, Serial No. 32; List No. 7; Municipal Resolution for 1899-1900

8. *Proceedings A*, *Government of Bengal*, Deptt., Municipal, Wooden Bundle 36, Serial No. 36; List No. 7; Municipal Resolution for 1904-05

9. Printed Proceedings, Letter, *From the Officiating Commissioner of the Dacca Division to the Secretary to the Government of Bengal,* letter no. 452, , Vol. 106, List no 5.2, Dated on 8th August 1878

Dhaka University Institutional Repository

10. Letter, *From the Commissioner of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Financial Department, Municipal*, File No. 250L, Wooden Bundle No. 4, March, 1879

11. *Proceedings of the Lt. Governor of Bengal, Financial Department, Municipal*, File No. 2, Wooden Bundle No. 4, Dated on 20th March, 1879

12. Proceedings B, Letter, *From the Officiating Commissioner of the Dacca Division to The Secretary to the Government of Bengal, Municipal Department*, wooden Bundle No. 14, Dated on 15th December, 1884

13. *Proceedings A, Government of Bengal, Municipal Department*, File No. 13, Wooden bundle No. 14, Dated on 17th March 1885

14. *Proceedings A, Government of Bengal, Municipal Department*, Branch-Municipal, Serial No. 21, Wooden Bundle 21, List-7, August 1890-February 1891

15. *Proceedings A, Government of Bengal, Municipal Department,* File No. M 5-A/3, Wooden Bundle No. 22, April 1891

16. *Proceedings A, Government of Bengal, Municipal Department, File No. M 5-A/3*, Wooden Bundle No. 25, March 1894

17. *Proceedings A, Government of Bengal, Municipal Department*, Branch-Municipal, Serial No. 36, Wooden Bundle 36, List-7, August 1905-August 1906

## প্রকাশিত দলিলদস্তাবেজ

1. Allen, B C *et all, Gazetteer of Bengal and North East India,* Mittal Publications, (rep. 1979, 1984) Delhi

2. Allen, B C, 1912, *Eastern Bengal District Gazetteers Dacca*, The Pioneer Press, Allahabad

3. Ascoli, F.D., 1917, *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report 1812*, Clarendon Press, Oxford

Dhaka University Institutional Repository

4. Clay, A.L., 1868, *Principal Heads of the History and Statistic of the Dacca Division*, Calcutta Central Press Company Limited, Calcutta

5. Firminger, Ven Walter Kelly (ed.), 1917, *The Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons on the Affairs of the East India Company*, R. Cambray and Co., Calcutta, (reprinted 1969)

6. Gait E.A. (ed.), *Census of India,* 1901, Vol. VIB, Part III, Provincial Tables, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1902

7. Geddes, Patrik, 1917, *Report on Town Planning Dacca*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta

8. *General Report on the Census of 1891, Provincial Tables*, Manas Publications, 1893, Delhi

9. Hamilton, Walter, 1828, *The East India Gazetteer*, Vol. II, Second edition, B.R. Publishing Corporation, Delhi (reprint 1984)

10. Hunter, W.W., 1877, *A Statistical Account of Dacca*, vol. V, Trubner & Co., London (reprinted in 1973)

11. *Report On the Census of Bengal*, 1901, Vol. 6, Part 1

12. Thornton, Edward, 1858, *A Gazetteer of the Territories under the Government of the East-India Company and of the Native States on the Continent of India*, Neeraj Publishing House, Delhi (3rd rep. 1984)

## ভ্রমণ বিবরণ

1. Manucci, Niccolao, 1907, *Mogul India 1653-1708 or Storia do Mogor, (*tr & ed William Irvine), Vol. II, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, (rep 1989)

2. Manrique, Sebastian, 1927, *Travels of Fray Sebastian Manrique 1629-1643:* A Translation of *The Itinerario De Las Missiones Orientales*, Vol. I, (trans by Eckford Luard), KRAUS REPRINT LIMITED, Nendeln/Liechtenstein, (rep 1967)

Dhaka University Institutional Repository

3. Tavernier J.B, 1889, *Travels in India*, (Trans. by Dr. Valentine Ball, ed. By William Crooke) Vol. I, 2nd edition, Atlantic Publishers, (reprinted 1989) New Delhi

## ইংরেজি গ্রন্থ

1. Ahmed, Rakibuddin, 1966, *The Progress of the Jute Industry and Trade (1855-1966)*, Pakistan Central Jute Committee, Dacca

2. Ahmed, Sufia, 1974, *The Muslim Community in Bengal (1884-1912)*, Asiatic Press, Dacca

3. Ballhatchet, Kenneth, 1979, *Race Sex and Class under the Raj: Imperial Attitudes and Policies and their Critics, 1793-1905*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi

4. Birt, Bradley F.B, 1906, *The Romance of an Eastern Capital*, Smith Elder & Co., London

5. Carr, Edward Hallett, 1961, *What is History?,* Vintage Books, New York

6. Dani, Ahmad Hasan, 1956, *Dacca- A Record of its Changing Fortunes*, The Saogat Press, Dacca

7. D'Oyly, Sir Charles, *Antiquities of Dacca*, John Landseer, Foly Street, London

8. Dasgupta, Uma, 1977, *Rise of an Indian Public (Impact of Official Policy 1870-1880)*, RDDHI, Calcutta

9. Dutt, R. Palme, 1970 (Second Indian edition), *India To-day*, Manisha Granthalaya (P.) Ltd., Calcutta, (1st published in England in 1940)

10. Fazl, Abul, 1891, Ain-*i-Akbari,* (trans. H.S. Jarrett), Vol. 2, Calcutta

11. Hasan, Syid Aulad, 1904, *Notes of the Antiquities of Dacca,* Printed by M.M Bysak, at the Bangla-Jantra, Dacca

12. Karim, Abdul, 1964, *DACCA the Mughal Capital*, Asiatic Press, Asiatic Society of Pakistan, Dacca

Dhaka University Institutional Repository

13. Majumder, Hridayanath, 1926, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta

14. Nathan, Mirza, 1936, *Baharistan-I-Ghaybi*, (trans. Dr. M. Islam Borah), vol. 1, Government of Assam, Assam

15. Rankin, J.T., 1920, *The Study of Antiquities in Dacca*, Srenath Press, Dacca

16. Rislely, H.H., 1891, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol. II, (rep 1998), P. Mukherjee, Calcutta

17. Sarkar, Sumit, 1997, *Writing Social History*, Oxford University press, New Delhi

18. Siddique, Kamal & et al, 1990, *Social Formation in Dhaka City*, University Press Limited, Dhaka

19. Stewart, Charles, 1847, *History of Bengal*, Black Pary & Co., London

20. Taifoor, Syed Muhammad, 1956, *Glimpses of Old Dhaka, Dhaka*

21. Taylor, James, 1840, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Military Orphan Press, Calcutta

22. Wilson, H.H., 1966, *A Glossary of Judicial and revenue Terms, and of Useful words occurring in official Documents*, Munshiram Manoharlal, Delhi (First published 1855)

## ইংরেজি সম্পাদিত গ্রন্থ

1. Chatterjee, Partha (ed), 2009, *The Small Voice of History: Ranajit Guha*, Editor's Introduction, Permanent Black, New Delhi

2. Crooke, William (ed.), 2000, *Hobson-Jobson (A Glossary of Colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, Etymological, Historical, Geographical and Discursive*), Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, P. 566 (1st Published in 1903)

Dhaka University Institutional Repository

3. Dani, Ahmad Hasan, (3rd Revised edition, 2009), *DHAKA: A Record of Its Changing Fortunes*, (edited by Abdul Momin Chowdhury), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka

4. Haider, Azimusshan (ed.), 1966, *A City and its Civic Body, Dacca*, East Pakistan govt. press, Tejgaon, Dacca

5. Mamoon, Muntassir & Rahman, Mahbubar (ed.), 2009, *Material Conditions of the Subalterns*, International Centre for Bengal Studies, Dhaka

## ইংরেজি প্রবন্ধ

1. Bhattasali, N.K., 'An Inquiry into the Origin of the City of Dacca', the Journal of the *Royal Asiatic Society of Bengal*, Letters, Vol. V, 1939, No. 3, Issued 29th Oct. 1940

2. Dacca Dairies-I, *Selections From Dacca Review*, Vol. 7, 1917-18

3. Dacca Dairies-II, *Selections From Dacca Review*, Vol. 8, 1918

4. Dacca Dairies-III, *Selections From Dacca Review*, Vol. 8, 1918

5. Guha, Ranjit, 'On Some Aspects of the Historiography of Colonial India', in *Subaltern Studies*, Ranjit Guha (ed.), Vol. 1, 1982, Oxford University Press, Delhi

6. Hasan, Sayid Aulad, 'The Religious and Social Divisions among the Musalmans of Dacca', *Selections From Dacca Review*, Vol. I, 1911-12

7. Hasan, Sayid Aulad, 'Old Dacca', *Selections From Dacca Review*, Vol. I, 1911-12

8. Rankin, J.T, 'The Study of Antiquities in Dacca', *Selections From Dacca Review*, Vol. 9, 1919-20

9. Spivak, Gayatri Chakravorty, 'Subaltern Studies: Deconstructing Histography' in *Subaltern Studies*, Ranajit Guha (ed.), Vol. IV, 1985, Oxford University Press, Delhi

Dhaka University Institutional Repository

10. Walters, Henry, 'Census of the City of Dacca', *Asiatic Researches*, 1832, vol. 17, Cosmo Publications, New Delhi (rep. 1980)

## অভিধান গ্রন্থ ও জ্ঞানকোষ

1. *Concise Oxford English Dictionary*

2. *Chamber's Twentieth Century Dictionary International Encyclopedia of Social Science*, vol. 1, The Macmillan and the Free Press, 1968

3. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (7th edition), Oxford University Press, 2005

4. *Webster's New International Dictionary*, 1950, Second edition, G.&C. Meraiam Co.

## অন লাইন উৎস

Pacione, Michael, 2001, *The City: Critical Concepts in the Social Science*, New York

*en.wikipedia.org/wiki/city*

## বাংলা গ্রন্থ

১. আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, ২০০৬, *ঢাকাঃ ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, তৃতীয় সংস্করণ, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী, ঢাকা

২. ইসলাম, রফিকুল, ১৯৮২, *ঢাকার কথা: ১৬১০-১৯১০*, ঢাকা

৩. করিম, আবদুল, ১৯৯৪, *মোগল রাজধানী ঢাকা* (অনূ. মোহাম্মদ মুহিবউল্যাহ সিদ্দিক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৪. কামাল, আহমেদ, ২০০১, *কালের কল্লোল (১৯৪৭-২০০০)*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা

৫. গুপ্ত, নির্ম্মল, শ্রাবণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, *ঢাকার কথা*, কলকাতা

*Dhaka University Institutional Repository*

৬. টেলর, জেমস, ১৯৭৮, *কোম্পানি আমলে ঢাকা* (অনূ. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান) বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৭. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, ১৯৭৫, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা

৮. মামুন, মুনতাসীর, ১৯৮৬, *উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫)*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

৯. মামুন, মুনতাসীর, ২০০১, *উনিশ শতকের ঢাকা (অবয়বগত বিকাশের একটি বিবরণ)*, অনন্যা, ঢাকা

১০. মামুন, মুনতাসীর, ১৯৯১, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১১. মামুন, মুনতাসীর, ১৯৮৭, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৫)*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১২. মামুন, মুনতাসীর, ২০০০, *ইতিহাসের খেরোখাতা*, তৃতীয় খণ্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা

১৩. মামুন, মুনতাসীর, ২০০৪, *ইতিহাসের খেরোখাতা*, পঞ্চম খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

১৪. মামুন, মুনতাসীর, ২০০৭, *ঢাকা সমগ্র* ১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

১৫. মামুন, মুনতাসীর, ২০০৫, *ঢাকা সমগ্র* ৩, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

১৬. মামুন, মুনতাসীর, ২০০৬, *ঢাকা সমগ্র ৪*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা

১৭. মালেক, আবদুল, ২০০৭, (সংকলক ও সম্পাদক), *ঢাকাঃ রচনাপঞ্জী সংকলন*, ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা

১৮. রায়, অতুল কৃষ্ণ, ১৯৮২, *কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (ভাষান্তর শুদ্ধোদন সেন), ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া, কলকাতা

## সম্পাদিত গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ এবং জাতীয় জ্ঞানকোষ

১. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.), ১৯৯৩, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, তৃতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

২. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, পঞ্চম খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

৩. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, চতুর্থ খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

৪. ইফতিখার-উল-আউয়াল (সম্পা), ২০০৩, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

৫. ওয়াইজ, জেমস, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (অনু. ফওজুল করিম)*, মুনতাসীর মামুন (সম্পা), ১৯৯৮, প্রথম খণ্ড, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা

*Dhaka University Institutional Repository*

৬. ওয়াইজ, জেমস, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (অনু. ফওজুল করিম)*, মুনতাসীর মামুন (সম্পা), ১৯৯৮, দ্বিতীয় খণ্ড, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা

৭. ওয়াইজ, জেমস, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ (অনু. ফওজুল করিম)*, মুনতাসীর মামুন (সম্পা), ১৯৯৮, তৃতীয় খণ্ড, ডানা পাবলিশার্স, ঢাকা

৮. ঘোষ, বিনয় (সম্পাদিত ও সংকলিত), ১৯৬৩, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা

৯. ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.), ১৯৯৮, *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১০. মজুমদার, কেদারনাথ, *ঢাকার বিবরণ*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), ২০০৩, *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

১১. রহমান, হাকীম হাবীবুর, ২০০৫, *ঢাকা: পঞ্চাশ বছর আগে* (মূল উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদক. ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম), প্যাপিরাস সংস্করণ, ঢাকা

১২. রায়, যতীন্দ্রমোহন, *ঢাকার ইতিহাস*, কমল চৌধুরী (সম্পাদিত), ২০০৩, *ঢাকার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা

## বাংলা প্রবন্ধ

১. আহমেদ, আবদাল, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৯, 'ইতিহাসের ঢাকা', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৮ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা

২. গুহ, রণজিৎ, ১৯৯৮, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', গৌতমভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৩. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, ১৯৯৮, 'ভূমিকা ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতমভদ্র (সম্পাদিত), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৪. সেন, রংগলাল, 'ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা', ইফতিখার-উল-আউয়াল (সম্পা), ২০০৩, *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

## বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রত্রিকা

১. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৯

২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ জুলাই ২০১১

*Dhaka University Institutional Repository*

## অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ

১. আলমগীর, মোঃ, (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত), ১৯৯৯, *বাংলার মুসলিমদের সমাজ জীবনে ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা

২. ইসলাম, রেজাউল, (এমফিল অভিসন্দর্ভ অপ্রকাশিত), ২০০৫, *বাংলায় পাটচাষ (১৮৫৫-১৯৪৭)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা